মাঝি

পরেশ ভট্টাচার্য

অনন্য প্রকাশন ৬৬, কলেজ স্ট্রীট (দ্বিতল)
কলিকাতা—৭৩

প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৬১

প্রকাশক হীরক রায়, অনন্য প্রকাশন, ৬৬, কলেজ স্ট্রীট (দ্বিতল)
কলিকাতা ৭৩, প্রচ্ছদ ধীরেন শাসমল, মুদ্রণে মহামায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৬৬ বি, মানিকতলা স্ট্রীট, কলি-৬।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূর্য ডুবলো রাঙাবেলিয়ার পারে।

ধনপতি দাঁড় টানা বন্ধ করলে মুহূর্তের জন্যে। উঠে দাঁড়ালো। ফিরে তাকালো পশ্চিম আকাশের দিকে। যেখানে এখনো জড়িয়ে রয়েছে দিনান্তের রক্তিম স্পর্শ।

দিনান্তের এই রঙের সঙ্গে ধনপতির মনের কী যেন এক সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। নয়তো প্রতিদিন সূর্যাস্তের মুহূর্তে ওর মনটা আনচান করে উঠবে কেন?

আর অমন আকুল নয়নে কী-বা খুঁজে বেড়ায় পশ্চিম দিগন্তের কোণে! শুধু তাই নয়, দিনান্তের রঙটুকু মুছে যাবার মুহূর্তে ওর মুখের স্পষ্ট রেখাগুলো কেমন যেন কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

—অ ধনপতি, ডিঙির অপর প্রান্ত থেকে ডাক শুনতে পেল, কী হলো তোর?

মুহূর্তে চমক ভাঙলো ধনপতির। দুটি সবল হাতে আবার সে দাঁড় টানা আরম্ভ করলে। তবু সেই দাঁড় টানার ফাঁকে এক-একবার ফিরে দেখতে লাগলো পশ্চিম আকাশের দিকে। আকাশের যে কোণে একটু আগেই শীতের সূর্য অস্ত গেছে। কিন্তু আকাশের সে কোণটুকু এখান থেকে দেখা যায় না। একে ভাঁটার টানে জল নেমে গেছে নিচে। তারপর, নদী-পারের ভেড়িবাঁধ আর গেঁয়ো কেওড়ার গাছগুলো দূরের আকাশকে আড়াল করে রেখেছে।

দাঁড় টানছে ধনপতি। ওধারে হাল ধরে বসে আছে নটবর ঘরামি। মাঝে ছই-এর নিচে মহাজনের লোক। এত সময় বসেছিল লোকটি, তারপর বোধহয় নৌকোর দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমোক, লোকটি সকাল থেকে ঠায় বসেছিল ছই-এর নিচে। ওর কোমরে বাঁধা টাকার গেঁজে। মহাজনের হয়ে ফসলের দাদন দিতে চলেছে সাহেবের লাটে।

—অ ধনপতি, নটবর ঘরামি হালের মুঠো ধরে জিজ্ঞেস করে, দয়াপুরের কাছারি বাড়ি যাতি পারবি তো এই ভাঁটিতে?

—যাওয়া বললেই যাওয়া, ধনপতি বিরক্তি প্রকাশ করে বলে, আমারে কি মনে করো বলো দিকি? একটা মানুষ, তার দুটো হাত বটে তো।

—রাগ করিস কেনে? নটবর মোলায়েম স্বরে ধনপতির প্রশস্তি করে, তোর দুটো হাত যা পারে, আমার দশটা হাত থাকলিও তা পারতো না।

আবার দুজনে চুপচাপ। সন্ধ্যার রঙটুকু ক্রমে ক্রমে মুছে গেল নদীর বুক থেকে। ফিকে অন্ধকারের মধ্যে ধনপতির ডিঙি চলেছে গোসাবার গাঙের ওপর দিয়ে।

যতদূর দৃষ্টি যায় নদীর এপার-ওপার, এদিক-ওদিক—একটি ডিঙি কি পানসির ছায়াও দেখা যায় না। এপার-ওপার কোথাও একটি আলোর রেখাও নেই।

ধনপতি একমনে দাঁড় টেনে চলেছে। শেষ অগ্রহায়ণের শীতের মধ্যেও ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। গায়ের গেঞ্জিটা স্যাঁত স্যাঁত করছে ঘামে। তবুও দাঁড় টানার বিরাম নেই। যন্ত্রের মতো ধনপতির সবল হাত দুটো দাঁড় টেনে চলেছে।

ধনপতির মাথাটা সোজাসুজি ভাবে হেলে পড়েছে পিছন দিকে। চোখ দুটো আকাশের বুকে নক্ষত্রের জটলায় ঘুরপাক খাচ্ছে। কত নক্ষত্র আকাশে? হাজার, লক্ষ, না আরো বেশি? হয়তো আরো অনেক বেশি। হয়তো সংখ্যা দিয়ে ধরে রাখা যায় না।

ধনপতির দৃষ্টি অজস্র নক্ষত্রের স্পর্শ নিয়ে ফিরছে। আর বারে বারে ওর দৃষ্টি পলকের জন্য স্থির হয়ে পড়ছে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলোয়।

—ধনপতি রে, অ ধনপতি, আবার নটবরের কণ্ঠস্বর।

—কী?

—কলাগাছির গাঙের মুখে তো এ্যালাম, আর দুটো বাঁক ঘুরলেই তো দয়াপুর, নটবর মিষ্টি সুরে বলে, তুই একটু ইচ্ছে করলে—

—দুত্তোর ছাই, নিকুচি করেছে ইচ্ছের, ধনপতি বেশ গলা চড়িয়ে বলে ওঠে, তুমি কি ভাবো বলো তো ঘরামি খুড়ো? এসো, দাঁড়ে এসে বোসো, বুঝতি পারবা দাঁড় টানায় কি সুখ।

—তুই এক কথায় চটিস কেন বলতো? নটবর শেষটা একটু সুর টেনেই বলে, দাঁড় একদিন আমিও টানতাম রে ধনপতি—সে দাঁড় টানার দিন ফুরিয়েছে আজ ক'বছর। ধনপতি রে, তুই তো কালকের ছেলে, সে সব কথা তুই কি করে জানবি।

কথার শেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলো নটবর। সে নিঃশ্বাসের শব্দ দাঁড় টানার শব্দ ছাপিয়ে ধনপতির কানে না পৌঁছলেও, তার কথার সুরে ধনপতি বুঝতে পারলো ঘরামির মনে দুঃখের সুর বেজেছে।

ধনপতির মনটাও ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো। এই মুহূর্তে কিছু না বললেও কিছুক্ষণ পরে সে নিজেই ডাকলো, ঘরামি—অ ঘরামি খুড়ো।

—বল কি বলছিস ? নটবর সাড়া দিলে।

ধনপতি দাঁড় দুটো জলের বুক থেকে তুলে রেখে বলে, তুমি রাগ কোরো না আমার 'পর। যখন যে কথাটা মনে হয়, সেটা সহজ করে বলি।

—তা আমি জানি রে ধনপতি, নটবর খুশির সুরেই বলে, যেখানে ভালোবাসা সেখানেই রাগ অনুরাগ।

ধনপতি হো হো করে হেসে ওঠে। আবার সে মনের আনন্দে সবল মুঠোয় দাঁড়ের মুঠো চেপে ধরে। আপন মনে বলে, ভালোবাসা যেখানে, সেখানেই রাগ অনুরাগ।

গোসাবার গাঙ পেরিয়ে ডিঙি চলেছে কলাগাছির গাঙের বুকের ওপর দিয়ে। নদীর এ-পারে আবাদ, ও-পারে শূন্য চর। শূন্য চরে এখনো পুরোনো দিনের বাদাবনের চিহ্ন। কেওড়া, গেঁয়ো, গর্জন, পিটুলি গরান, হেতাল হিজলের চারাগুলো এখনো গজায়, কিন্তু অরণ্য গড়ার স্বপ্ন দেখার আগেই তাদের সংক্ষিপ্ত জীবন হারিয়ে যায় ইস্পাতের দা-কুড়ালের ঘায়ে। ছোট ছোট গাছগুলো ওপারের আবাদের লোকেরা নিয়ে যায় ডিঙি বোঝাই করে। জ্বালানীর জন্যে।

ধনপতি চেয়ে থাকে শূন্য চরের দিকে। রাতের অন্ধকারে চরের কিনারার ছোট ছোট চারাগাছগুলোকে কেমন যেন ছায়া-রেখার মত দেখায়।

ওই চরে যদি সামান্য কিছু জমি পত্তনি নিতে পারতো ধনপতি! সত্যি—সে সুখী হত। কিন্তু সেটুকু সুখের বরাদ্দ ওর কপালে নেই। তা না হোক, একদিন হয়তো আক্ষেপ ছিল ধনপতির, আজ নেই। আজও ভাবে, এই সব নোনা গাঙের জল যদি শুকিয়ে না যায়, তা হলে ভাবনা কি। এই ডিঙি নিয়েই সে জীবন ভোর করে দেবে।

কতদিন তো হল, দীর্ঘ তেইশ বছর, জলে জলে তার দিনগুলো কেটে গেছে। তেরো বছর বয়সে, সে প্রথম নিজের হাতে দাঁড়ের মুঠি ধরে নোনা গাঙে ডিঙি ভাসিয়েছিল। তারপর তেইশ বছর কেটে গেছে, ছত্রিশ বছরের দেহটা যতই পুরোনো হোক না, মনটা তার তেমনি তাজা রয়ে গেছে নোনা গাঙের জল হাওয়ার গুণে। মনটা যেন পুরোনো হবার নয়।

ধনপতি দাঁড় টানতে টানতে পুরোনো দিনের কথাই ভাবছে। যে কথাগুলো নিয়ে ইতিহাস লেখা যায় না সত্যিকথা, কিন্তু জীবনকে খুঁজে পাওয়া যায়। সে জীবনটা অন্যের নয়, ধনপতির নিজের।

ন্যাজাট-বয়ারমারির জীবন ভুঁইয়ার ছেলে ধনপতি। উত্তর চব্বিশ পরগণার

গ্রাম অঞ্চলের সাধারণ গৃহস্থের ছেলে। সামান্য জমি-জিরেত, হাল-লাঙ্গল, দুটো বিল-মাছার মাঠপুকুর—সংসারের নির্ভর। ছোট সংসার, সাধারণ ভাবে সুখ বৈ দুঃখ ছিল না সেখানে। কিন্তু অলক্ষ্য বিধাতা বাদ সাধলেন, অলক্ষ্মীর কোপ পড়লো সংসারে। পর পর দু'বছর গেল হাজা-শুকা। সামান্য সঞ্চয় দিয়ে সংসারের পুরোনো হালটা ধরে রাখতে পারলো না জীবন ভূঁইয়া। জমি-জিরেত বাঁধা পড়লো মহাজনের হাতে। সাদা ডেমিতে সই দিয়ে টাকা কর্জ করলো হাট-গাছার এক জোতদারের কাছে। ভেবেছিল, সুদে-আসলে একদিন সব দেনা শোধ করে সংসারটাকে আবার নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড় করাবে জীবন। কিন্তু তার সে ইচ্ছে কর্পূরের আয়ু পেল না। বিলেন জমি তো গেলই, সেই সঙ্গে ভিটেসংলগ্ন ডাঙা জমিটুকুও হাত-ছাড়া হয়ে গেল। শুধু রইলো কাঠা দশেক জমি আর দুটো দোচালা।

শিশু ধনপতি, সচ্ছল সংসারের চেহারা সে দেখেছে, আবার সেই সংসারটাকে নতুন করে দেখলো। তিন সাঁঝ পেট ভরা ভাত খাওয়া দূরে থাক, একবেলা ঘেঁটা ভাত জোটাতেও বাবাকে কত মেহনত করতে হয়। শিশু ধনপতি, সেই শৈশবেই বুঝতে পেরেছিল, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার পথটা খুব সহজ নয়।

সত্যি, সহজ ছিল না সেদিনের বেঁচে থাকাটা। তা যদি থাকতো তা হলে হা-ভাতে কুঁড়োর খাল পারের গেঁয়ো গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে মরতো না জীবন ভূঁইয়া।

ধনপতির মনে আছে, বাবার মরা দেহ দেখে সে বেশি সময় কাঁদতে পারেনি। অনাহারে অর্ধাহারে শরীরের হাল হয়েছিল এমনি। দুদণ্ড কাঁদতেও তো শক্তি লাগে বুকের। ফুসফুসে বাতাস ভরে নেবার শক্তি যদি না থাকে, তবে কান্নার স্বর ফুটবে কেমন করে।

জীবন ভূঁইয়া মরে গেল। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ধনপতি পৃথিবীটাকে আর এক রূপে দেখলো। সে রূপটা ভয়ংকর। ভয়াল ভয়ংকর। বাবার মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যে সে উচ্ছেদের পরোয়ানা পেল। আড়াইশ' টাকায় ভিটেমাটি বন্ধক ছিল পিফার মকসুদ আলির কাছে।

বার বছরের ছেলে ধনপতি। আইন আদালতের কথা কোত্থেকে জানবে। আর জেনেই বা কী লাভ। তবু সে বিধবা মাকে নিয়ে গেল মকসুদ আলির কাছে। দরবার করলো। কিন্তু কোনই ফল ফললো না। হ্যাণ্ডনোটের নিচে সে বাপের দস্তখত দেখে ঘরে ফিরলো।

ঘটনাচক্র একবিন্দুতে স্থির থাকে না। ধনপতির চোখের সামনে যত অন্ধকারই থাক, পৃথিবীতে তবু একই নিয়মে সূর্য উঠতে লাগলো।

'দাঁড় টানতে পারবি'—ন্যাজাটে ভেড়ির পারে দাঁড়িয়ে ছিল ধনপতি, সেখানেই শুনেছিল কথাটা। জিজ্ঞেস করেছিল মোল্লাখালির গুরুপদ হাউলি।

'পারবো', ধনপতি উত্তর দিয়েছিল নিজের সুঠাম হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে।

সে আজ কতদিন আগের কথা। দু'যুগ হয়ে গেল। গুরুপদ হাউলিকে সে ছোটবেলা থেকে দেখেছে। বাবার কাছে আসতো ধানের মরশুম শেষে। টাকা কর্জ করতে। টিনের তোরঙ্গ থেকে গুনে গুনে টাকা বার করে দিত বাবা। হাউলি সে টাকা নিয়ে যেত সুন্দরবনের মধুর ব্যাপারিদের দাদন দিতে। বর্ষাকালে আবার কর্জের টাকা ফিরিয়ে দিয়ে যেত হাউলি। সুদ নিত না বাবা। সুদের কথা উঠলে বাবা বলতো, যে সুদ খায়, পরজন্মে সে জোঁক হয়ে জন্মায়।

জীবন ভুঁইয়ার মরার খবর লোকমুখে শুনেছিল গুরুপদ। শুনে এসেছিল। এসে ধনপতির কাছ থেকে শুনেছিল দুঃখের কাহিনী। তারপর সন্ধ্যেবেলা ভেড়ির ধারে দাঁড়িয়ে অনেক চিন্তার পর তবেই জিজ্ঞাসা করেছিল ধনপতিকে, 'দাঁড় টানতে পারবি'।

ন্যাজাট-বয়ারমারির বাস উঠলো। ধনপতি তার মা-বোনকে নিয়ে এলো মোল্লাখালির গুরুপদ হাউলির বাড়ি।

ন্যাজাট-বয়ারমারি থেকে তিন 'ভাঁটি'র পথ মোল্লাখালি। গুরুপদ হাউলি নিজেই বসেছিল ডিঙির হাল ধরে। দাঁড়ে ছিল গুরুপদর মাইনে করা দাঁড়ি মেকাই কয়াল।

ছোট বেলায় এক-আধবার নৌকোয় চেপেছে ধনপতি, কিন্তু সে আর কতটুকু। ন্যাজাট আর কালিনগরের মাঝের গাঙটুকু পেরোনো। একবার শুধু মাসির বিয়েতে গয়নার নৌকো চেপে ভোলাখালি গিয়েছিল। কিন্তু এত দূরের পথ নৌকোয় চেপে আসা এই প্রথম।

সেই স্মৃতি ধনপতির মনের পটে এখনো স্পষ্ট হয়ে আছে। বিদ্যাধরী, কালিন্দী, গোসাবা, বিদ্যা, কলাগাছির বুকের ওপর দিয়ে ডিঙি ভাসিয়ে গুরুপদ হাউলি এসে পৌঁছলো তাদের মোল্লাখালির বাড়ি।

আসার পথে নদীর নামগুলো মুখস্ত করেছিল ধনপতি। কী সুন্দর নাম।

পুরো দুদিন দুরাত নৌকোয় ছিল ধনপতি। সেই দুদিন দুরাতের স্মৃতিটা এখনো ম্লান হয় নি। সারাদিন ও বসে থাকতো ছই-এর মুখে। চেয়ে থাকতো নদীর রেখা ধরে দূরের দিকে, যেখানে নদীর বাঁক ফিরেছে দক্ষিণে না হয় উত্তরে। কী সুন্দর নদী, উদ্দাম তার স্রোত, উন্মাদ তার ঢেউ। নদীর এ-পার ও-পার, কত সুন্দর। দু'পারে কত জানা অজানা গাছ। নদীপারের গাছগুলোর কী কষ্ট, জোয়ারে তারা নদীর জলে হাবুডুবু খায়, আবার ভাঁটার টানে তাদের কংকালের মত শিকড়গুলো বেরিয়ে পড়ে। নোনা নদীর পাড়, এই আছে এই নেই। গাঙ পারের ওই গাছগুলোর সঙ্গে নোনাজলের অহরহ সংগ্রাম। মাটিকে ভাসিয়ে নেবে বলে নোনা জল আছড়ে পড়ে এপারে ওপারে, আর মাটিকে ধরে রাখবে বলে ওই গাছগুলো শিকড়ের জাল ছড়িয়ে রাখে। শেষপর্যন্ত গেঁয়ো-কেওড়া কিংবা অন্যনামের গাছগুলো আত্মাহুতি দেয় জলে। নদীর পাড় ভেঙে ভেঙে পড়ে। মাতাল নোনা গাঙের ভ্রূক্ষেপ নেই কোনদিকে। তার নেশা শুধু সাগরসঙ্গমে যাবার।

ধনপতির মনে আছে, শেষের দিন মাঝরাতে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। নৌকো গেরাবি ফেলেছিল কলাগাছি গাঙের দক্ষিণ পারে। সবাই ঘুমিয়েছিল ছই-এর ভিতরে। ধনপতি গুটি গুটি পা ফেলে এসেছিল ছই-এর বাইরে। বাইরে এসেই তার মনে চমক লেগেছিল, দু'চোখে জেগে ছিল অপার বিস্ময়। সে চমক আজও ধনপতির মনে, সে বিস্ময় আজও ওর দু'চোখে।

মেকাই কয়াল সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিল ধনপতিকে, অমন করে কী দেখিস রে খোকা। পাগলা গাঙের দিকে অমন করে দেখিস নে—তোরেও পাগল করে দেবে।

মেকাই কয়ালের কথার মধ্যে কতখানি সত্যি ছিল, সেদিন না বুঝলেও, আজ তা বোঝে ধনপতি।

স্মৃতির রোমন্থন করতে করতে কখন যেন দাঁড় টানা বন্ধ করেছে ধনপতি। কানে আসে নটবর ঘরামির ডাক, অ ধনপতি—ধনপতি রে—

ধনপতি মুখে কোন সাড়া না দিয়ে দাঁড় টানতে আরম্ভ করে। দাঁড় টানার ছলাৎ-ছলাৎ শব্দটা আবার ওকে চেতনা-রাজ্যে ফিরিয়ে আনে।

নটবর বলে, ধনপতি রে—পিছন দিকে ঠাওর করতো, একটা 'আলোপানা' কি যেন দেখা যায়।

পিছন ফিরে চায় ধনপতি। কোনদিকে আলোর নিশানা দেখতে না পেয়ে বলে, ও তোমার চোখের ভুল। আলো কোথায় ?

নটবর নতুন করে আলোটা দেখতে গিয়ে আর খুঁজে পায় না। কোথায় যেন নিমেষের মধ্যে হারিয়ে গেছে হঠাৎ-দেখা আলোর চিহ্নটা।

নটবরের স্বভাব ধনপতি ভালো করেই জানে। ওকে দেখছে তো ক'বছর ধরে। দিনের আলোয় সাহসের অন্ত নেই, কিন্তু সন্ধ্যের পর থেকে লোকটা কেমন যেন দমে যায়। ওর নাকি অপদেবতার ভয়। আর সে ভয়টা কখন কোন ছল ছুতোয় ওর মনের মধ্যে জাগবে তার ঠিক নেই।

এত সময় বেশ আসছিল নটবর, কিন্তু এই হঠাৎ-দেখা আলোটা ওকে ভাবিয়ে তুললো। ধনপতি বলতে পারে, এ তার দেখার ভুল, কিন্তু নটবর তো মিথ্যে দেখেনি। সে ঠিকই দেখেছে, দূরে বাঁকের মুখে একটা আলো টিম্ টিম্ করে জ্বলছিল। স্পষ্ট দেখেছে। হয়তো আলো নয়, আলেয়া। না হয় কোন মাছমারা দানো।

—দয়াপুরের কাছারির ঘাট আর কত দূর রে—অ ধনপতি, নটবরের কণ্ঠস্বর কেমন যেন থমথমে, বলে, এই ভাঁটিতে যাতি পারবি তো ?

ধনপতি বলে, সামনে হাঁসচরার বাঁক, এর পরই তো দয়াপুর। এই পহরেই পৌঁছে যাবো। তুমি বোসো দিকি চুপ করে।

নটবর আবার সেই আলোর কথায় ফিরে আসে। বলে, ও আলোটা মিথ্যে নয় রে ধনপতি।

ধনপতি বলে, না হয় নাই হলো। সত্যি হলে দোষ কী। হয়তো আলো হাতে কেউ ভেড়ি ধরে চলতিছিল, নেমে গেছে মাঠের মধ্যে।

নটবর মুহূর্তের জন্যে চুপ করে থাকে। তার পর বলে, তুই জানিসনে ধনপতি—

ধনপতি এবার একটু গলা চড়িয়ে বলে ওঠে, কী—জানবার আছে কি ? নিকুচি করেছে তোমার আলোর। নেও—জুৎ করে হাল ধরো, না হয় একটা বিড়ি খেয়ে গা গরম করে নেও।

মন্দ বলেনি ধনপতি। কথাটা নটবরের মনের মত হয়েছে। হাল ছেড়ে দিয়ে বিড়ি ধরালো নটবর। একটা বিড়িতে নেশাটা ঠিক জমলো না, বিড়ির আগুনেই আরো একটা বিড়ি ধরিয়ে আবার শক্ত হাতে হালের মুঠি ধরে বসলো নটবর।

হাঁসচরার বাঁকের মুখে জলের টানটা একটু জোরালো ঠেকলো। এ জায়গাটাও একটু বিদঘুটে। পর পর বেশ কয়েকটা ঘোল আছে। তারপর দক্ষিণ দিকটা ঘেঁষে রয়েছে জল-ডোবা চর। হালকা ডিঙি বলে রক্ষে, নয়তো গয়না কিংবা কিস্তি হলে এই 'রেতে ভাঁটায়' চলা মুশকিল। তবু ডিঙির গতিটা হঠাৎ বাড়তে ধনপতি একবার জলের দিকে লক্ষ্য করলে। না—ঠিকই চলছে ডিঙি।

হাঁসচরার বাঁক পেরোতেই ঘণ্টা কাবার। মনে হয় সামান্য পথ—কিন্তু সামান্য নয়। বাঁকের এ মুখ থেকে ও মুখ দেখা যায় না।

বাঁক পেরিয়েই নদীটা আবার বাঁক ফিরেছে পূবে। এ জায়গায় নদীর চেহারা হাড়-গোড়-ভাঙা দ-এর মত। দিনের আলো হলে দয়াপুরের কাছারি বাড়ির টিনের চাল এখান থেকে দেখা যায়। কিন্তু দেখা গেলে কি হবে, বাঁক ফিরে কাছারি বাড়ির ঘাটে পৌছতে অন্তত দু'ঘণ্টা সময় হাতে রাখতে হবে। কিন্তু সে সময়টা কই। ধনপতি আন্দাজ মত হিসেব করে দেখলো, ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে জোয়ার লেগে যাবে। উজানে আধ ঘণ্টার পথ পেরোতে দু'ঘণ্টা লাগবে। তাও যাওয়া মুশকিল। সেই কখন থেকে একটানা দাঁড় টানছে সে। হাত দুটোর তো বিরাম চাই। তারপর একনাগাড়ে দাঁড় টানতে ফুসফুসটাও কম জখম হয় না।

হাঁসচরার বাঁক পেরিয়ে এলো। ধনপতি কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে যন্ত্রের মত দাঁড় টেনে চলেছে। এই শীতের মধ্যেও তার সর্বাঙ্গে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

ওদিকে নটবরের মনটাও যেন পর পর বিড়ি টেনে কতকটা হালকা হয়েছে। হাল ধরে বসে ছিল ডিঙির মাথায়, হঠাৎ নিজের খেয়ালে গান ধরে,

ও তোর এলো খোঁপায় দেবো
কনক চাঁপার ফুল,
তোর কানে পরিয়ে দেব
ঝুমকো লতার দুল।
তোর গায়ে দেব ওড়না রঙিন
গলায় চন্দ্র হার,
(আর) তোর পায়ে দেব রূপোর নূপুর
নাকে নোলক আর।...

কোন ছোট বেলায় বাগান অধিকারীর 'জরিনার' দলে গান করতো নটবর

ঘন্নামি। সেই সব গানগুলো এখনো ভুলতে পারেনি নটবর। এখনো মনটা কোনো স্বপ্নে ফুর-ফুর করে উঠলে সেই সব গানগুলো গায়।

বয়সের ভারে নটবরের গলা পড়ে গেছে। নিচের পাটির সামনের দাঁতগুলোও নেই, কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে বেরোয় না। তবু নটবর নিজের খুশিতে গেয়ে চলে, স্বরে তালে কোথাও ভুল হয় না।

মহাজনের লোক ঘুমিয়ে ছিল ছই-এর নিচে। নটবরের গানের দাপটে তার ঘুম ভেঙে যায়। কোমরে বাঁধা টাকার গেঁজে-য় হাত দিয়ে তড়াক করে উঠে বসে। আড়ামোড়া ভেঙে বারকয়েক হাই তুলে ধনপতিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, দয়াপুরের কাছারি ঘাট আর কতদূর।

ধনপতি বলে, হাঁসচরার বাঁক পেরিয়ে এ্যালাম এই, আপনি আর এক ঘুম দে নেন, তার মধ্যে কাছারির ঘাটে গেরাবি ফ্যালবো।

সন্ধ্যের আগে থেকেই লোকটি ঘুমিয়েছে। কত রাত হয়েছে ঠিক করতে পারছে না। ছই-এর বাইরে মুখ বাড়িয়ে নদীর এপার-ওপার দেখলো, তারপর আকাশের দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করলে, রাত কত হবে?

—কত আর, নটা বাজেনি। ধনপতি বলে, দশটায় জোয়ার লাগবে। জলে এখনো টান আছে।

মহাজনের লোক তবু রাতের থমথমে আকাশের দিকে ফিরে চায়। এ পথে এই তার প্রথম আসা নয়, আজ দশ বছর ধরে ধানের মরশুমে সে আসছে সাহেবের লাটে, কুমিরমারি, পুঁইজালি, পারঘুমটির তল্লাটে। এখন টাকা দাদন দিয়ে যাওয়া, তারপর মাস দুয়েক বাদে মাঘের শেষাশেষি আবার কিস্তি নিয়ে আসা।

বিশ্বাসী মাঝি ধনপতি। মহাজনের হয়ে খাটছে আজ ক বছর ধরে। রাস-পূর্ণিমার পর মোল্লাখালির ধনপতি মাঝির এই মহাজনের ভাড়াটা বরাদ্দ আছে। ভাড়া নিয়েও কচলা-কচলি করতে হয় না। মহাজন ঠিক মত পুষিয়ে দেয়। মহাজনের লোককে নিয়ে প্রথম দফায় সাত আট দিন ঘোরা, তারপর কিস্তির সঙ্গে আর একবার তদারকি করতে আসা। সম্পর্কটা বেশ কয়েক বছরের, মহাজনের লোকের সঙ্গে তাই যেমন হোক একটা কুটুম্বিতে হয়ে পড়েছে।

কিন্তু এবার এমনটা হল কেন? জোয়ার হোক, ভাঁটা হোক, ধনপতি সন্ধ্যের আগে দয়াপুরের কাছারির ঘাটে নৌকো বাঁধে, আবার 'রেতে গনে'

নৌকো ছাড়তে পারলে ভালো, নয়তো রাত ভোরে ডিঙি ছেড়ে দেয় সজনেখালির দিকে। মহাজনের লোকের মনে তাই যেন খচ-খচি, এবার এমনটা হলো কেন? কিন্তু মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারলো না। এমনিতে শান্ত মানুষ ধনপতি, কিন্তু মনের মত কথা না হলে চটে যায়।

শেষ পর্যন্ত মহাজনের লোক আমতা আমতা করে বলে, ধনপতি, তুমি যখন আছো ভয় নেই, তবু এই হাঁসচরার বাঁকের কাছে বুকটা ধুক ধুক করে ওঠে। তাই বলছিলাম, একটু টেনে চলো।

ধনপতি কোনো কথা বলে না। গুম হয়ে বসে দাঁড় টেনে চলে। মহাজনের লোকটিও চুপ করে যায়। জানে, বেশি কথা বাড়ালে ধনপতি চটে উঠবে। একবার চটে গেলে আর রক্ষে নেই। ওর বিগড়োনো মেজাজটা ঠাণ্ডা হতে হয়তো পুরো রাত কাবার হয়ে যাবে।

ধনপতি মুখে কিছু না বলুক, মহাজনের লোকের ভয়টা কোথায় তা সে জানে। আর জানে বলেই তো চুপ করে আছে।

নদীর নাম কলাগাছি, এপারে হাঁসচরা ওপারে সাহেবের তিন নম্বর লাট। ক ঘর মালোর বাস এই হাঁসচরায়। মরশুমের সময় চাষবাস, আর অন্য সময় নদীপথে রাহাজানি ওদের কাজ। এমন কোন কুকাজ নেই যা ওরা পারে না। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন—কু-প্রবৃত্তির যত রকম কীট আছে, মাঠে ঘাটে যখন কাজকাম না থাকে সেগুলো কিলবিলিয়ে ওঠে ওদের মাথায়। ধনপতির ভাষায়, ওরা হল 'নোনা গাঙের দুশমন'। কিন্তু জীবনে ভয় যে কী, ধনপতি তা জানে না। জলের কুমির, ডাঙার বাঘ আর হাঁসচরা কিংবা সাত-জেলের দুশমনদের কখনো ডরায়নি ধনপতি। কতবার এই পথে যাতায়াত করতে এই সব দুশমনদের মুখোমুখি হয়েছে, কিন্তু কখনো ওর ডিঙির কাছে ঘেঁযেনি কেউ। 'মালকাঠঝাঁকা' ধনপতির এইটুকু প্রতিপত্তি সুন্দরবনের বাদাবন আর আবাদ অঞ্চলে।

পাকা তাল গাছের গুঁড়ি আর গোড়া দিয়ে তৈরী ছোট বড় মালকাঠ। এই বাদাবনের দেশে এক সময় এই মালকাঠ নিয়ে শারীরিক কসরৎ দেখানো রেওয়াজ ছিল। আজকাল সেসব উঠে গেছে বললেই হয়। মোল্লাখালির কর্ম বাউলি জোয়ান পুরুষ। বাদায় মধু ভাঙা ছিল পেশা। যখন তখন বাদায় যেতে হয়, তাই শরীরটাকে মজবুত করার ঝোঁক। তাই দশ পনেরটা তালগাছের মালকাঠ তৈরী করেছিল। কিন্তু তালগাছের গোড়া দিয়ে তৈরী

মালকাঠ ঝাঁকা দূরে থাক, সে নিজে কখনো হাঁটুর ওপর তুলতে পারে নি। কর্ম বাউলির কাছে মালকাঠ ঝাঁকা শিখতো ধনপতি। আশ্চর্য, যে মালকাঠ কর্ম বাউলি হাঁটুর ওপর তুলতে পারেনি, একদিন সেই মালকাঠটা অনায়াসে দু' হাতের শক্তিতে মাথার ওপর তুলেছিল ধনপতি। সেই থেকে মোল্লাখালির লোকে বলতো, মালকাঠ-ঝাঁকা ধনপতি। সেই নামটাই কালে ছড়িয়ে গেছে এই আবাদ আর বাদাবনের দেশে।

বেশ কিছু সময় আপন মনে দাঁড় টেনে এলো ধনপতি। হাঁসচরার পথ পেরিয়ে এসেছে। আর দূরে নয় দয়াপুরের কাছারির ঘাট। ধনপতি এতক্ষণে আরাম করে বিড়ি টানার জন্যে দাঁড় টানা বন্ধ করলে। গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ধীরে সুস্থে একটা বিড়ি ধরালো। একনাগাড়ে বসে দাঁড় টানতে কোমর ধরে গেছে। উঠে দাঁড়ালো মেরুদণ্ড সোজা করে। ফিরে তাকালো এদিক ওদিক। রাতে নদীপথের দূরত্ব অনুমান করা অসম্ভব, তবু নদী পারের দিকে তাকিয়ে মনে মনে হিসেব করে দেখলো, দয়াপুরের কাছারির ঘাটের কাছাকাছি এসে গেছে।

নটবর জিজ্ঞাসা করে, কিছু হদিশ পেলি রে ?

ধনপতি বলে, ঘাটের কাছে এসে পড়েছি। একটা ঝুল টেনে গেলেই পৌঁছে যাবো। বরাত ভালো ঘরামি খুড়ো, আমার তো ভাবনা হইছিল।

নটবর বলে, গুরুর কিরপায় সবই সম্ভব হয় রে ধনপতি। তোরা সব গুরু মানিস নে, কিন্তু এই ভাঁটিতে এলি কি করে বল তো ? দেড় ঘণ্টার পথ ঘণ্টায় পেরোলি কেমন করে ?

ধনপতি হেসে বলে, এবার তোমার গুরুরে দাঁড়ে বসতে বলো—কই ডাকো তোমার গুরুরে।

এমন করে কথার প্যাঁচে ফেলবে ধনপতি, তা বুঝতে পারেনি নটবর। বলে, তোকে নিয়েই আমার গুরুর বল। বুঝলি রে।

—বুঝিছি, এবার বোসো দিকি হাল ধরে। একটা ঝুল টেনে নেই, বলে বিড়িতে সুখটান দিয়ে আবার দাঁড় টানতে সুরু করে ধনপতি।

জলকাটার শব্দ তুলে আবার ধনপতির ডিঙি এগিয়ে চলে দয়াপুরের কাছারি বাড়ির দিকে।

হঠাৎ একটা উৎকট দুর্গন্ধ নাকে আসে। কী বিশ্রী গন্ধ। নিশ্চয়ই কোন মরা জন্তুজানোয়ার ভেসে যাচ্ছে নদীতে। না হয় ডাঙায় কিছু পচেছে।

ধনপতির গা গুলিয়ে ওঠে। আর নটবর তো গন্ধের ঝোঁকে ভয়ে বেসামাল হয়ে পড়েছে। এই গাঙ-দেশে এ সব গন্ধের একটা জটিল মানে আছে। রাতে নাম করে না যাদের, তারা তো এই গন্ধেই ছুটে আসে।

—ধনপতি রে, আচমকা সভয়ে চাপা চিৎকার করে ওঠে নটবর।

—কী হ'ল ?

—হালে কি আটকেছে। শিগগীর ইদিকে আয়।

ছই-এর ভিতরে ভাঁড়ের মধ্যে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ ছিল। দাঁড় ছেড়ে উঠে আসে ধনপতি। টর্চ বার করে নটবরের হাত থেকে হালের মুঠি কেড়ে নেয়। টর্চের আলোয় দেখে একটা মরা বাছুরের পচা খসা দেহ এসে আটকে গেছে হালের মুখে। কলার বাসনা দিয়ে বাঁধা ছিল বাছুরের গলা, সেগুলো পাকে পাকে জড়িয়ে গেছে হালের মুখে। সজোরে হালের মুঠো ধরে নাড়া দিতে তবে সেটা খুলে গেল। তারপর ডিঙির গা দিয়ে ভেসে গেল মরা বাছুরটা। ধনপতি আবার একটা বিড়ি ধরিয়ে দাঁড়ে এসে বসলো।

জোয়ার লাগার মুখে দয়াপুরের কাছারির ঘাটে ডিঙি গেরাবি করলো ধনপতি। রাতটুকু এখানেই কাটাবে।

শেষরাতে ফিকে কুয়াশা নেমেছিল নদীর বুকে। উত্তুরে বাতাসটা ফিরছিল কলাগাছির গাঙের বুকের ওপর দিয়ে। নোনা হাওয়ায় শীতের কামড়টা কম, তবু কুয়াশাজড়ানো রাতে কেমন যেন একটা জড়তা ধনপতিকে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল।

কাঠ আর গোলপাতার কিস্তিগুলোর কয়েকটা জোয়ারের টানে চলে গেছে দয়াপুরের কাছারির ঘাট ছেড়ে। গয়নার নৌকো সব কটাই ভাঁটা লাগতে গেরাবি তুলে চলে গেছে। শুধু চার পাঁচটা ডিঙি আর দুটো শূন্য কিস্তি রয়েছে কাছারির ঘাটে।

ধনপতি এক একবার দেখছে পূবের আকাশের দিকে। কখন সূর্য উঠবে! পূবের আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে, কিন্তু কুয়াশার জন্যে হয়তো প্রথম সূর্যটাকে স্পষ্ট করে দেখা যাবে না। তা না যাক, কুয়াশার মধ্যে সূর্যের রঙের যে আভাটুকু দেখা যাবে, তাও সুন্দর। কুয়াশার জালের আড়ালে সূর্য— তার একটা আলাদা রূপ আছে। সে রূপটাও সুন্দর। তাতেও রাতের তপস্যার জৌলুস।

সূর্য উঠছে পূব দিগন্তের কোণে। ধনপতি উঠে দাঁড়ায়। ফিরে তাকায়।

সূর্যোদয়ের মুহূর্তে ওর মনটাও নতুন করে জন্ম নেয় যেন। নব নব জন্ম ওর প্রতিদিন সূর্যোদয়ের মুহূর্তে। ওর রক্তে লাগে নতুন জীবনের দোলা, ওর শিরায় উপশিরায় জোয়ার আসে—প্রাণের জোয়ার। ওর ছত্রিশ বছরের পুরোনো মনটা আনন্দে নেচে ওঠে। যেন সে এক কচি শিশু। আজই ভূমিষ্ঠ হলো।

সূর্য উঠলো। ধনপতির চেতনা-রাজ্যে মুহূর্তে আলোড়ন জাগলো। দু'চোখে অফুরন্ত বিস্ময় নিয়ে চেয়ে রইল রক্তিম সূর্যের দিকে। আলোর রথ ছুটিয়ে এলো সূর্য।

—অ ঘরামি খুড়ো, চিৎকার করে নটবরকে ডাক দিলে ধনপতি, অ ঘরামি খুড়ো, ওঠো—আর কত ঘুমোবা।

নটবর উঠে বসে। আড়মোড়া ভাঙে। তারপর বার কয়েক শ্বাসটানা কাশি কেশে একটা বিড়ি ধরায়। কড়া বিড়ি—টানের সঙ্গে সঙ্গে আরো বারকয়েক থক্ থক্ করে কাশলো নটবর। গলা ঝেড়ে দু'এক দলা সর্দিও ফেললো। তারপর ময়লা কাঁথাটা গায়ে জড়িয়ে ছই-এর বাইরে এসে সূর্যি ঠাকুরকে প্রণাম করলো।

—অ ধনপতি, নটবর বালতি করে গাঙের জল তুলতে তুলতে বলে, একেবারে মুখে জল দে দুটো পান্তা খেয়ে নিলে হতো না?

—তোমার শুধু খাই খাই। ধনপতি বলে, চলো এক ঝুল বেয়ে যাই। এর মধ্যে খাবা কি? দুপোর রাতে ভাত খেয়ে এই সাত ভোরে তোমার ক্ষিধেও পায়, বলিহারি—

নোনা জলে মুখ ধুতে আরম্ভ করে নটবর বলে, বুড়ো মানষের ক্ষিধে হোক না হোক, খাই খাই বাতিকটা থাকে।

—নেও, তুমি হালে গে বসো। ধনপতি গেরাবি তুলতে তুলতে বলে, একটা ঝুল বেয়ে যদি সজনেখালির মুখে গে পড়তে পারি, তবে তোমারে দু থালা পান্তা দেবো।

হঠাৎ ধনপতির চোখ পড়ে নদী পারের দিকে। দুটো জেলে ডিঙি আসছে। এদিকেই। নিশ্চয়ই ওতে মাছ আছে। ধনপতি দাঁড়ে বসে থাকে চুপচাপ। ডিঙি দুটো আসুক। যদি কিছু টাটকা মাছ মেলে, তাহলে এ বেলার সওদাটা সেরে নেবে। মাছের নামে, কৈভোল মাছের কথা মনে হয়। মনের মত কৈভোল মাছ অনেকদিন দেখতে পায়নি ধনপতি। যাও-বা মেলে তা ঠিক নজর পছন্দ হয় না।

—ও ভাই, মাছ আছে নাকি গো, ধনপতি গলা চড়িয়ে ডাকে।

—কি মাছ নেবা, জেলে ডিঙির মাঝি জিজ্ঞাসা করে, খয়রা আছে আর কুঁজো ভেটকি।

—এদিকে এসো। ধনপতি ডাকে জেলে ডিঙির মাঝিকে।

জেলে ডিঙি কাছে এলো। খয়রা আর কুঁজো ভেটকি। একটা ছোট ভাঙানও রয়েছে। তিনটে মানুষ খাবে, বেছে বেছে গোটা কতক খয়রা আর ভাঙান মাছটা নিলে ধনপতি।

এবারে নৌকো ছাড়ার পালা। ধনপতি দাঁড় টানা আরম্ভ করলে। টাটকা খয়রামাছগুলো দেখে নটবরের মেজাজটাই যেন বদলে গেছে। হালের মুঠি ধরে গান গাইতে শুরু করলে।

আহা—
তুলোরাম খেলারাম বাবাজী,
মাটি কাটা ভয়ে,
পাঁচ সিকে দিয়ে
হালে হইছি বৈরাগী।

এই গানের মধ্যে জড়িয়ে আছে তার বিগত দিনের হারানো সুর—কৈশোর আর প্রথম যৌবনের দিনগুলি। বালক কীর্তন, জারি, জরিনা—যাত্রার আসরেও নেমেছে বার কয়েক। কিন্তু জারি, জরিনার দলে গান করে যত আনন্দ পেয়েছে, এমন আর কিছুতে না। কিন্তু বাগান অধিকারীও মরলো, জারি, জরিনার দলও গেল। চেষ্টা করেছিল নটবর, দলটাকে বেঁধে রাখতে, কিন্তু পারেনি। দল ভেঙে গেল। দলের ছোক্‌রারা যে যার মত ছিটকে পড়লো। নটবরও চেষ্টা করেছিল আর কোথাও যাবে, যেখানে বাগান অধিকারীর মত গান-পাগলা কাউকে খুঁজে পাবে। যার হাতে নতুন করে নাড়া বেঁধে তাকে 'গুরু' বলে মানবে। খুঁজেও ছিল—কিন্তু তেমন কাউকে খুঁজে পেল না।

জারি জরিনার দল ছেড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলো। নটবর ফিরেছে, দিগম্বর ঘরামির তাইতেই আনন্দ। ছেলে বিয়ে-থা করুক, সংসারী হোক, এ ছাড়া মা-বাপের আর কি ইচ্ছে থাকতে পারে।

দিগম্বর ঘরামি জাতে সৎচাষী। দিগম্বরের বাপ-ঠাকুর্দার পেশা ছিল নিজ লাঙ্গলে চাষবাস। উপাধি ছিল মণ্ডল। কিন্তু দিগম্বর তার আমলে পেশাটা বদলে ফেলেছিল। চাষবাস ছেড়ে পেশা করেছিল ঘর ছাওয়া। লোকে বলতো

দিগম্বর ঘরামি। এই ঘরামি উপাধিটাই পাকাপাকি ভাবে বহাল থেকে গেল। তারপর থেকেই ওরা 'ঘরামি'।

দিগম্বরের তিন ছেলে। হলধর, জলধর আর নটবর। নটবর ছোটবেলা থেকে ছন্নছাড়া স্বভাবের। সে নিজে থেকেই ভিড়েছিল বাগান অধিকারীর দলে। বাপ-মায়ের নিষেধের তোয়াক্কা রাখেনি। দু'পাঁচ বছর নয়, একনাগাড়ে বারো বছর ছিল বাগান অধিকারীর দলে। বাগান অধিকারী মরে গেল, গানবাজনার পাট উঠলো নটবরের। কিন্তু ঘরে ফিরেও মানুষটা ঠিক ঘরের মানুষ হতে পারলো না।

বিয়ে হলো নটবরের। নিজেরই পছন্দ করা মেয়ে। ভোলাখালির নেতাই দাসের মেয়ে ফুলটুসি। ডাগর মেয়ে, অমন মেয়ে তখনকার দিনে আবাদ অঞ্চলের কারো ঘরে থাকতো না। কুল নিয়ে বদনাম ছিল নেতাই দাসের। ফুলটুসির হাতে তাই এই ধাপধাপানি বয়েস পর্যন্ত শাঁখা নোয়া ওঠেনি। সে যেন নটবরের জন্যেই ওই বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল।

ছেলের বিয়েতে অনেক বাদ্যিবাজনা করেছিল দিগম্বর। গাইয়ে বাজিয়ে ছেলে, তার বিয়েতে বাজনা না হলে কি মানায়? লোকে বলবে কি?

বিয়ের বাসরে জরিনার মজাদার গান গেয়েছিল নটবর। রসের গান। সে গান শুনে বাসরের মেয়েরা নথ-নোলক ঢেকে ফেলেছিল আলপাকা শাড়ির ঘোমটায়।

সত্যিই সে রাতে গর্বে ভরে উঠেছিল ফুলটুসির বুক। পরের দিন ডিঙি চেপে শ্বশুরবাড়ি আসতে ছই-এর নিচে চুপিস্বরে স্বামীকে বলেছিল, ভারি সোন্দর তোমার গলা। কোকিল হেরে যায়। এ গান তুমি কুথাকে শিখলে?

নটবর বলেছিল, এ গান শিখিচি বাগান অধিকারীর কাছে। এই গানের জন্যে আমি বেবাগী হইছিলাম। কিন্তু বেবাগী হওয়া হল না।

বলে নটবর গুনগুন করে সুর ধরেছিল,

ইচ্ছে ছিল, মন আমার হবে না সংসারী,
জীবন ভোর গান গেয়ে সে, করবে রংদারী।

এ-সব গান বাগান অধিকারীর বাঁধা। বাগান অধিকারী নিজেই মাথা খাটিয়ে 'পালা' লিখতো, গান বাঁধতো। আবার সে নিজেই সে-সব গানে সুর চড়াতো। আসরে সেই সব গান দরাজ গলায় গাইতো নটবর। লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবি সাঁটা হারমোনিয়ামটা নিয়ে বাগান অধিকারী নিজেই বসতো আসরের মাঝখানে। গানের তালে তালে অদ্ভুতভাবে মাথাটা হারমোনিয়মের ওপর দোলাতো

বাগান অধিকারী। বাবরি ছাঁট-দেওয়া এলোমেলো চুলগুলো পিছন দিক থেকে ফিরে মুখের ওপর লুটিয়ে পড়তো। যত সময় না পালা শেষ হত, তত সময় আসর জাঁকিয়ে বসে থাকতো বাগান অধিকারী।

গান-অন্ত প্রাণ ছিল বাগান অধিকারীর। ঘরসংসার ছিল না। সে ছিল এক জন্ম-বাউণ্ডুলে। স্রোতের শ্যাওলার মত ভেসে বেড়াতো এখানে ওখানে। সঙ্গে থাকতো গানের দলের ছোকরা আর বাজনদারেরা। আজ এখানে কাল সেখানে। নেশা করে মানুষটার দেহটা শুকিয়ে দড়ির মত হয়ে গিয়েছিল। খেতে পারতো না, শুকনো পেটেই নেশা করতো। আর দিনরাত চুকচুক চা খেত। এ ছাড়া মেয়েমানুষ পোষারও বাতিক ছিল তার।

শরীর আর কতো সইবে, গানের আসরেই মারা গেল বাগান অধিকারী। হঠাৎ। নটবর তখন আসরে গাইছে, আর হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে অধিকারী। আচমকা হারমোনিয়মের ওপর ঢলে পড়লো সে। হারমোনিয়ামটি নানা স্বরে ককিয়ে উঠে থেমে গেল।

নটবর তুলে ধরলো অধিকারীর মাথা। তারপর শুইয়ে দিল আসরের শতরঞ্চির ওপর। কিন্তু যাকে শোয়ানো হলো সে তখন শেষ হয়ে গেছে।

—অ ভাই, করো কি, সামাল—চিৎকার করে অপর এক ডিঙির মাঝি।

আড়াআড়ি নদী পার হচ্ছিল একটা মাছ-মারা ডিঙি। ধনপতির ডিঙির মাথা লেগেছিল প্রায় সে ডিঙির ছই-এ। লাগলে ছই-এর চালটা ফুটো হয়ে যেত।

হালে বসে নটবর, গান গাইতে গাইতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। খেয়াল করেনি। তাছাড়া মাছ-মারা ডিঙি নদীর মাঝ বরাবর আসছিল। খুব সামলে নিয়েছে ধনপতি, হাত দুটো বাড়িয়ে ছই ধরে ফেলেছিল, নয়তো বে-টক্কর একটা কিছু ঘটে যেত।

—কি রকম মাঝি তুমি? মাছ-মারাদের ডিঙির মাঝি ধমক দিয়ে বলে, ধানকানা নাকি?

—মনে কিছু করো না। ধনপতি মোলায়েম স্বরে বলে, একটু বেতাল হয়ে গেছে আর কি।

নটবর এতক্ষণে খাড়া হয়ে বসেছে। ডিঙির মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে পাড় বরাবর। মাছ-মারাদের ডিঙি ওপারের দিকে অনেকখানি চলে গেছে।

ধনপতি বলে, কি ভাবছিলে ?

নটবর বলে, সে কিছু না। গান গাইলে আমার মনটা কেমন আকুপাকু করে ওঠে। গান আর গাবো না।

—গান গাবা কেন ? ধনপতি জিজ্ঞাসা করে, তোমার হলো কি ?

—হবে আবার কি ? যে গান গেয়ে সুখ পাইনে, সে গান গেয়ে কি লাভ !

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে নটবর আবার বলে, ধনপতি রে—শুধু ফুলটুসির জন্যেই বেঁচে আছি। নয়তো এ্যাদ্দিনে এই নোনা গাঙে ডুবে মরতাম। ওই একটা সুতোর বাঁধন, ও বাঁধনটা ছিঁড়েও ছেঁড়ে না।

নটবরের মুখে এ কথাগুলো এর আগেও শুনেছে ধনপতি। তাই তো কোনো মন্তব্য করে না। কিন্তু ওর এ নীরবতায় নটবর খুশী হলো না। ডাকে—ধনপতি, অ ধনপতি।

—কি ?

—তুই কিছু বল।

—আমি আর কি বলবো। এখন নেও—সজনেখালির নাক বরাবর এসে গেছি। ডিঙি গেরাবি করো—দুটো পান্তা খাবার জোগাড় দেখি।

পান্তা খাবার নামে নটবর সব দুঃখ ভুলে যায়। হালের মুঠি জুৎ করে ধরে ডিঙির মুখ ফেরায় পারের দিকে।

এদিকে জোয়ার লাগার সময় হলো। সুতরাং এখন আর গেরাবি তুললো না। তাছাড়া দুপুরের রান্নাখাওয়ার পাটও আছে। পান্তা জল খেয়ে নটবর ডোরায় গেল রান্না করতে।

সারা দুপুর ধনপতির ডিঙি গেরাবি করা রইলো। বেলা তিনটে নাগাদ ভাঁটার টান এলো গাঙে। গেরাবি তুলে ডিঙি ভাসালো ধনপতি। সাহেবের তিন নম্বর লাট আর সামান্য পথ। একটা বাঁক ঘুরলেই তিন নম্বর লাটের ঘাট। মহাজনের লোকও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বেলা থাকতে পৌছলে আজই সে এখানকার কাজ চুকিয়ে কুমিরমারি যেতে পারবে। কুমিরমারির কাজ যদি কাল মিটে যায়, তা হলে পরশু তক পুঁইজালির কাজ মিটিয়ে নিতে পারবে।

এপারে আবাদ, ওপারে সজনেখালির বাদা। তিন গাঙের মহড়া-মুখে ফরেস্ট অফিস। গোসাবার গাঙ চলে গেছে দক্ষিণ-পুব কোণ বরাবর। ওই গাঙের মুখে পাখিরালা। শীতের মরশুমে দেশ-বিদেশের পাখিরা আসে সুন্দরবনের

এই এলাকায়। লোকে বলে, পাখিরালা হল শিকারীর স্বর্গ। যেদিকে চাও
শুধু সবুজ বন। আর অজস্র পাখির সমারোহ সেই বনকে ঘিরে।

ধনপতির ইচ্ছে ফেরার পথে পাখিরালা হয়ে ফিরবে। বাদাবনের কাছে এসে বাদাবন না দেখে ফিরে যেতে মন চায় না ধনপতির। ও যতবার যে কাজে এসেছে এ-পথে, ততবারই বাদাবন না দেখে যায় নি। কাজ না থাকলেও কতবার ও খালি ডিঙি নিয়ে এসেছে, নোনা গাঙের দরিয়া বরাবর ডিঙি ভাসিয়ে গেছে মরিচঝাঁপি, কালিচক, সজনেখালি, পাখিরালা—গেছে আরো দূরে, আরো দক্ষিণে রায়মঙ্গল, রাখালী সপ্তমুখী হয়ে সাগরের মুখের কাছে।

ধনপতির রক্তে কেমন যেন নেশার আমেজ আসে এই বাদা অঞ্চলে এলে। এ নেশা তার অনেক দিনের, অনেক পুরোনো।

॥ দুই ॥

সাহেবের তিন নম্বর লাটের ঘাটে পৌছতেই সন্ধ্যে ঘন হয়ে উঠলো। আজ আর কুমিরমারি যাওয়া হয়তো হবে না।

কোমরে বাঁধা টাকার গেঁজে দেখে নিয়ে মহাজনের লোক ডাঙায় নামে। ডাঙায় নামতে একহাঁটু কাদা। কাদা ভেঙে ভেড়ি বাঁধে উঠতে মহাজনের লোক বেসামাল হবার জোগাড়। ধনপতি নিচে নেমে না ধরলে কাদায় লুটোপুটি খেত। প্রায় আড়কোলা করে লোকটিকে ডাঙায় তুলে দেয় ধনপতি। তারপর জিজ্ঞাসা করে, একা যাতি পারবা তো?

—পারবো। বলে মহাজনের লোক হাতের টর্চ জ্বেলে ভেড়ি পথের ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়।

মহাজনের লোক চলে গেল। ধনপতি গাঙ-পারে বেশ কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকে। মহাজনের লোক বলে গেছে টাকা ক'টা মোড়লের হাতে দিয়েই সে ফিরবে। পোয়াটাক পথ যেতে আসতে আর কতটুকু সময়। আধ ঘণ্টা লাগবে না। আর কথা বলতে বিশ-পঁচিশ মিনিট। মহাজন আসুক তারপর ডিঙিতে উঠবে ধনপতি, এই ভেবে ভেড়ির ধারে দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ।

ধনপতি দাঁড়িয়ে আছে পারের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে। কী সুন্দর ওই জঙ্গলের দেশ। দিনের আলোয় জঙ্গলের রূপটা এক, রাতের অন্ধকারে সে রূপ আর এক রূপে দেখা দেয়। আবার যদি জ্যোৎস্নারাত হয়, তবে এই জঙ্গলের রাজ্য অপরূপ হয়ে ওঠে।

ধনপতি অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে জঙ্গলের দিকে। এ চেয়ে থাকার অর্থটা অনেক সময় সে নিজেও বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু এটুকু বোঝে, ওই বাদাবনেরও একটা মোহ আছে, যে মোহে সে অন্ধ।

—চা খাবি নাকি? ডিঙির গলুইতে বসে নটবর শুধোয়, ধনপতি চা খাবি?

—না। ধনপতি উত্তর দেয়, তুমি তো জানো ও-সব আমি খাইনে, খেতে চাইনে, তবু ফি-দিন জিগেস করো কেন। তুমি যদি খাবা তো খাও।

—নেশা জিনিসটা একা একা করতি ভালো লাগে না। তাই তোরে বললাম। বলে নটবর ছই-এর ভিতর ডোৱার কাছে গিয়ে বসে।

অন্ধকারে দেশালাইটা হাতড়ে খুঁজে বার করে নটবর। উনুন জ্বালে। কালিপড়া এলুমিনিয়মের বাটিতে জল গরম করে চা-এর জন্যে। দুধের নাম নেই, গুড় দিয়ে ফোটানো জলে এক মগ চা করে আবার গলুই-এর ওপর এসে বসে।

মহাজনের লোকের ফিরতে প্রায় দু-ঘণ্টা দেরি হল। ফিরলো হাউ-হাউ করে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে। সঙ্গে একজন লোক এসেছে হ্যারিকেন নিয়ে।

মহাজনের লোকের পা ফেলার ধরন দেখে ধনপতি বুঝলো শান্ত মোড়লের বাড়িতে কিছুটা 'পান' হয়েছে। মুখে কিছু না বললেও, মনে মনে ও জিনিসটাকে ঘৃণা করে ধনপতি। তার ধারণা, ওসব ছাইপাঁশগুলো খাওয়া মানে নিজেকে বরবাদ করা।

—ধনপতি,—মহাজনের লোক জড়িত কণ্ঠে বলে, এই ভাঁটিতে কুমিরমারি যেতে পারবি তো?

ধনপতি কোনো কথা বলে না। গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। লোকটি বিশ্রী ভঙ্গিতে সুর করে হাসে। তারপর কয়েক পা এগিয়ে ধনপতিকে জড়িয়ে ধরে বলে, জানিস—আমার প্রাণে এখন জোয়ার। খুব খাইয়েছে শান্ত মোড়ল, পুরো একটা বোতল, আর এক পাত্তর শোল মাছ ভাজা। আর এই ত্যাখ— বলে চাদরের আড়াল থেকে পুরো একটা বোতল বার করে লোকটি।

ধনপতি এতক্ষণে একটু সহজ হয়েছে। সে বোঝে, লোকটিকে কিছু বলা তার সাজে না। সে মহাজনের ভাড়া-করা ডিঙির মাঝি। চুক্তিমত সাত-আট দিন এই লোকটিকে নিয়ে আবাদ মহলে ঘুরবে। এ-কদিন ও লোকটি তার কাছে মনিবের সামিল।

—আমার হাতটা ধর ধনপতি। বলে লোকটি হাত বাড়িয়ে দেয়।

ভাঁটার টানে জল আরো অনেকখানি নেমে গেছে। কাদার ভাগটাও আরো বেশি। ডিঙির কাছাকাছি আসতে লোকটি 'উ' বলে অস্ফুট আওয়াজ করে ওঠে। কাদার মধ্যে পায়ে কিছু ফুটেছে। হয়তো মরা শামুক, না হয় আর কিছু। সেই জ্বালাতেই লোকটি অস্থির হয়ে ওঠে। ডান হাত থেকে বোতলটা পড়ে যায় জল কাদার মধ্যে। জ্বালা ভুলে যায় লোকটি, হুমড়ে পড়ে বোতলটা তুলবার জন্যে। ধনপতি সুযোগ বুঝে একটা পা দিয়ে বোতলটা চেপে দেয় কাদার মধ্যে। লোকটি ককিয়ে ওঠে, তুই কি চোখে ঠাওর পাসনে ধনপতি ?

হঠাৎ ধনপতির মনটা বিষিয়ে ওঠে মহাজনের লোকের ওপর। মনে পড়ে যায় পুরোনো কথা। একদিন সুদখোর মহাজনের হাতেই তার ভিটে-মাটি সব গিয়েছিল। আজ এই মুহূর্তে সেই পুরোনো ঘৃণা আর বিদ্বেষটাই মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। যেমন বোতলটা চেপে দিয়েছে পা দিয়ে, তেমনি লোকটাকে চেপে দিলে দু'হাতে। বললে, থাকো এখানে। মাতলামোর আর জায়গা পাওনি।

বলেই ডিঙি ছেড়ে দেয় ধনপতি। মহাজনের লোকটার সব অনুনয় ব্যর্থ হয়।

ডিঙি তখন বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। মহাজনের লোকটা তখনো ধনপতির নাম ধরে চিৎকার করে ডাকছে। কিন্তু সে ডাকে সাড়া দেবার মত মন নেই ধনপতির।

জোয়ার লাগতে আর দেরি নেই। দণ্ড দুয়েকের মধ্যে জোয়ারের টান লাগবে গাঙে। এর মধ্যে বাঘনা ফরেস্ট অফিসে না পৌছলে নয়। বাঘনা পৌছলেই তো কুমিরমারি। ফরেস্ট অফিসের জেটিতে নেমে ভেড়ি-পথে খানিকটা হাঁটলেই কুমিরমারির বসতি।

ধনপতির দাঁড় টানার বিরাম নেই। যন্ত্রের মত দাঁড় টেনে চলেছে। মাঝে মাঝে ফিরে দেখছে কিনারার দিকে। গাঙের বুক থেকে ঘাটের নিশানা পাওয়া দায়। রাতের বেলা এই গাঙ-দেশে সব যেন একাকার হয়ে যায়।

এতদিন এই সব গাঙের বুকে নৌকো নিয়ে ভাসছে ধনপতি, তবু এখনো তার ভুল হয়ে যায়। দিনের বেলা তেমন অসুবিধে নেই, কিন্তু রাতে সবই যেন গোলোক-ধাঁধার মতো মনে হয়। আঁধার রাতেও যা, চাঁদনি রাতেও তা। চাঁদনি রাতে নদীর কিনারা তো আরো রহস্যময় হয়ে ওঠে। নদী-পারের গেঁয়ো, কেওড়া, ওড়া, পিটুলি গাছের ছায়া এসে পড়ে নদীর জলে। সে ছায়া আর

সত্যি গাছগুলো যেন একাকার হয়ে যায়। ছায়াগুলো চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। মাঝদরিয়ায় নৌকো চলেছে, সেখান থেকে মনে হয়, ওই বুঝি নদীর পাড়, ওই তো গেঁয়ো কেওড়ার গাছগুলো। এমন ভুল এই গাঙ-দেশের মাঝিরা বারবার করে। এ ভুলের মাশুল দিতে গিয়ে কত সময় বেটকর ডোবা-চরে ডিঙি আটকে যায়, কত সময় 'ঘোলের' মধ্যে গিয়ে পড়ে। আবার কখনো বা অন্য বিপদ জড়িয়ে আসে। সাবধানী মাঝি ধনপতি—রাতের বেলায় সব সময়ের জন্যে সে সতর্ক হয়ে থাকে, তবু মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়। আর সে ভুলটা তখনই হয়, যখন ওর বাদাবনের প্রেমে-পড়া মনটা মাঝি ধনপতির মন থেকে দূরে সরে যায়।

—অ ভাই, দূর থেকে ডাক ভেসে আসে, অ মাঝি ভাই, ডিঙি নে কোথায় যাবা ?

—কারে ডাকো ? সাড়া দেয় ধনপতি।

—কারে আবার, নদীপার থেকে কণ্ঠস্বর আসে, তোমারে জিগোই। কোথায় যাবে ডিঙি ?

ধনপতি মুহূর্তের জন্যে কী যেন চিন্তা করে। তারপর উত্তর দেয়, বাঘনা অফিসে।

—ডিঙিতে কারা ? কী কাজে যাও ?

—তোমার তাতে কাজ কি ? ধনপতির কণ্ঠস্বরটা যেমন চড়া তেমন রুক্ষ।

পারের মানুষ আর ধনপতির কণ্ঠস্বরে রাতের নীরবতা ভেঙে যায়। নদী-পারের দিকে তাকিয়ে দেখে ধনপতি। কাউকে দেখা যায় না। পায়ের কাছে চটের থলেয় পাঁচ ব্যাটারির টর্চ—টর্চটা বার করে নদীপারের দিকে আলোটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলে। না, কোনো লোক দেখা যায় না। নিশ্চয়ই সে ভেড়ি কিংবা কোনো গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে।

নটবর বোধহয় একটু ভয় পেয়েই থাকবে। বলে, আলো ফেলে কাজ কি। বেয়ে চল ধনপতি।

—তার মানে ? ধনপতি সেই এক ভাবে টর্চের আলো ঘোরাতে ঘোরাতে বলে, ধনপতির বুকে অতো ভয় নেই খুড়ো। যেই হোক, ওরে দেখে তবে যাবো। তুমি ডিঙি পারের দিকে নে চলো, দেখি—আমার কোন্ সুমুন্দি ওখানে।

মুখে যা-ই বলুক, নটবর কাজের বেলায় ধনপতির আজ্ঞাবহ। ভয়ে ভয়ে

সে ডিঙির মুখ ফেরায় পারের দিকে। ধনপতি দাঁড় টানতে টানতে চিৎকার করে বলে, কই গো কত্যা, ধনপতি মাঝির সামনে এসো।

ডিঙি পারে ভিড়তেই গরানের কোঁড়া আর টর্চটা হাতে নিয়ে ধনপতি লাফিয়ে পড়ে কাদার মধ্যে। কাদা ছিটকে ওঠে সর্বাঙ্গে। ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। ধনপতি কোঁড়াটা বাগিয়ে ধরে ভেড়িবাঁধের ওপর উঠে যায়। তারপর টর্চের আলোটা এদিক-ওদিক ফেলতেই এক জায়গায় চোখে পড়ে, একটা গাছের ডাল যেন নড়ছে। ছুটে যায় ধনপতি। যা ভেবেছিল তাই, দু'জন লোক গাছের ডাল জড়িয়ে ধরে বসে আছে। কোঁড়া আস্ফালন করে ধনপতি হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, নাব শালারা—নাব, ছ্যাখ তো আমারে চিনতে পারিস কিনা ?

লোক দুটি ভয়ে ভয়ে নেমে আসে। জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ায়। বেশ বোঝা যায়, ধনপতি মাঝিকে তারা জানে। তবু ভয়ে ভয়ে জানায় তারা, বদ মতলবে এখানে আসেনি। এসেছিল মাছের আলা পাহারা দিতে। রাতের দিকে এ গাঙে তো তেমন ডিঙিটিঙি যায় না, তাই জানতে চেয়েছে।

ধনপতির রাগ বেশিক্ষণ থাকে না। যেমন হঠাৎ চটে ওঠে, তেমনি হঠাৎ জল হয়ে যায়। রাগলে ওর গলার স্বরটা শাঁখের আওয়াজের মতো মনে হয়, কিন্তু শান্ত হলে সে স্বরটা শোনায় মিষ্টি-মিহি।

ধনপতি জিজ্ঞাসা করে, কী, এই রকম বেহিসেবী কাজ আর করবি ?

—না। লোক দুটি একই সঙ্গে বলে ওঠে। ধনপতি আর কথা না বাড়িয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে আসে।

'লগি মেরে' দাঁড়িয়ে ছিল নটবর, ধনপতি ডিঙিতে উঠে কাদামাখা পা দুটো ধুয়ে নেয়। তারপর 'দাঁড়ে' বসে বলে, নেও—বাঘনা অফিসে গে ডিঙি রাখবো।

ভাঁটার টানে ডিঙির মুখ ঘুরিয়ে নেয় নটবর। দাঁড় টানতে আরম্ভ করে ধনপতি বলে ওঠে, জোয়ার লাগলো বলে—খুড়ো, পারের দিকে নজর রেখো, বাঘনার ঘাট না পেরিয়ে যাই।

বাঘনা ফরেস্ট অফিসের সামনে কাঠের 'জেটি'। যেখানে আরো কয়েকটা ডিঙি নৌকো, কিস্তি নোঙর করা রয়েছে, তারই মধ্যে একটা ফাঁক দেখে ডিঙি গেরাপি করলো ধনপতি।

এইটুকু পথ দাঁড় টেনেছে ধনপতি মরীয়া হয়ে। সত্যি তার দাঁড় টানার ক্ষমতা আছে। অন্যকোনো মাঝি হলে এই ভাঁটায় পৌছতে পারতো না।

ডিঙির মাথায় বসে একটু জিরিয়ে নেয় ধনপতি। এত সময় গা-গরম

ছিল, এবারে শীতটা যেন গায়ে লাগে। চাদরটা বার করে গায়ে জড়ায় ধনপতি। নটবর একটা বিড়ি টেনে ডোরায় গিয়ে বসে তুটো ভাত রান্না করবে বলে। মাছের ঝোল রান্না আছে। এ-বেলা গরম গরম ভাত হলেই হলো।

উনুন জালতে চোখ তুটো ধোঁয়ায় লাল করে ফেললো নটবর। কাঠগুলো বাইরে ছিল বলেই স্যাঁতসেঁতিয়ে উঠেছে 'নেওরে'। লম্প থেকে কেরোসিন ঢেলে কাঠগুলোয় শেষ পর্যন্ত আগুন ধরালো নটবর। তারপর জল সমেত হাঁড়ি উনুনে বসিয়ে চাল ধুতে বসলো।

ডোরার উনুনের কাছে বসে উত্তাপ নিতে নিতে নটবর ভাবে ঘরের কথা। ফুলটুসি এখন কি করছে? হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে, না হয় পড়শির ঘরে গিয়ে কারো ছেলে কোলে করে বসে আছে। একটি সন্তানের জন্যে ফুলটুসির ভারি তুঃখ। সে তুঃখটা মাঝে মাঝে প্রায়-বৃদ্ধ নটবরের মনেও বাজে। ছেলে হোক, মেয়ে হোক, ফুলটুসির গর্ভে যদি একজন কেউ আসতো—সে মা বলে ডাকতো তাকে। ওই ডাক শুনেই তার মনটা ভরে উঠতো। কিন্তু পোড়া কপাল, মা বলে ডাকতে কেউ এলো না ফুলটুসির কোল জুড়ে। নটবরের মনটাও খাঁ খাঁ করে ওঠে সে কথা ভাবলে। তবু হাজার হোক পুরুষ মানুষের মন—নানা কাজে ভুলে থাকে। কিন্তু ফুলটুসি মেয়েমানুষ, তার মনটা সব সময়ে তো একটা ব্যথায় কাতর হয়ে থাকে। বয়সকালে সব সময়ে হাসতো ফুলটুসি, হাসিটাও ছিল ভারি মিষ্টি, কিন্তু আজকাল ভুল করেও হাসে না সে। হাসতে ভুলে গেছে। তা ছাড়া অমন যে সুন্দর ফুলটুসি, তার গায়ের রং-টাও কেমন যেন পোড়া-পোড়া হয়ে গেছে। নটবর কত সময় ভেবেছে, কোনো ছেলেকে পুষ্যি নেয়, সে কথা তু-একবার বলেছেও, কিন্তু ফুলটুসি নারাজ। সে বলে 'যা নিজের নয়, তা কি নিজের মনে করা যায়?'

ফুলটুসির কথা ভাবতে নটবরের মনের মধ্যে সাগরের হাওয়া বয়ে যায়। মনে পড়ে বয়স-কালের কথা। কোথায় গেল সেই জীবন! সেই গান, সুর, সেই ফুলটুসি, তারপর সেই ডগমগ দিনগুলো—সব মরে গেছে, মরে ভূত হয়ে গেছে। যেখানে ছিল সবুজ বাগিচা, সেখানে এখন ধু ধু মরুভূমি।

—যাবো, আমিও যাবো—উনুনে জাল ঠেলে দিয়ে নটবর আপনমনে বলে, ফুলটুসিও যাবে, সবাই যাবে—মিছে ভেবে কি হবে।

মুখে যতই বলুক, তবু নটবরের মন থেকে ভাবনা যায় না। বরং ভাবনার জটটা আরো পাকিয়ে ওঠে মনের মধ্যে।

নতুন চালের ভাত। সিদ্ধ হতে কতটুকু সময়। ভাতের ফ্যান ঝরিয়ে নটবর হাঁড়িটা ঝাঁকানি দিয়ে তে-পায়ার ওপর রাখে। ঝোলের মালসাটা চাপিয়ে দেয় নিভন্ত উনুনের ওপর। ঝোলটা ততক্ষণে একটু গরম হোক।

কলাই-করা থালা ভরতি গরম ভাত আর মাছের ঝোল—তারপর সারাদিন দাঁড় টেনে ধনপতির ক্ষিধেটাও মন্দ হয়নি, বেশ খানিকটা খাওয়ার পর তবে সে মুখ খুললো, তোমার রান্নাটি কিন্তু বেশ হয় খুড়ো।

নটবরের দাঁত নেই, ভাত চটকে তবে খেতে হয়, নইলে মাড়ি দিয়ে আর কত চিবোনো যায়। ভাত চটকাতে চটকাতে নটবর বলে, এ-রান্নাটা ডাঙায় গে খেলে কিন্তু মুখে ধরবে না ধনপতি।

খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুম। ছই-এর নিচে পাশাপাশি বিছানা পেতে শুয়ে পড়ে নটবর আর ধনপতি। কাৎ হয়ে শুয়ে একটা বিড়ি ধরায় নটবর। বার কয়েক টান দিয়ে গলা ঝেড়ে বলে, অ ধনপতি—ধনপতি রে—

—উঁ, সাড়া দেয় ধনপতি।

নটবর মোলায়েম স্বরে বলে, এবারে একটা সোন্দর দেখে মেয়ে বে কর—অ ধনপতি, আমার কথা কানে যাচ্ছে।

—তুমি ঘুমোও খুড়ো। ধনপতির চোখে ঘুম নামছে। অনুচ্চ এবং ভাঙা-ভাঙা গলায় বলে, এই তো বেশ আছি খুড়ো।

বিড়িতে সুখটান দিয়ে নটবর বলে, একা দাঁড়ি কি ডিঙি বাইতে পারে রে! হাল ধরার জন্যে একটা মানুষ লাগে, বুঝলি—জীবনটাও তো একটা জলে-ভাসা ডিঙি—এপার থেকে ভেসে ওপারে যাবে। হাল ধরার লোক না থাকলে ঠিক ঘাটে গিয়ে বাঁধবে কে?

এ কথাগুলো কানে যায়নি ধনপতির। ততক্ষণে সে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। ধনপতিকে কথাটা শোনাবার জন্যে নটবর তার গায়ে হাত দিয়ে ডাকে। ধনপতির মেজাজটা অন্য সময় হলে গরম হয়ে উঠতো, আজ কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলেও শান্ত মনে শুনলে, তার নটবর খুড়োর তত্ত্বকথা। সত্যি, মানুষের জীবনটা একটা জলে-ভাসা ডিঙির মতন। এপার থেকে ওপারে যাবে। কিন্তু হাল ধরার লোক না হয় নাই-বা থাকলো। ডিঙি এমনিতে তো ভাসবে, না হয় ডুবো-চরে আটকাবে, কিংবা ঘূর্ণি ঝড়ে ডুববে।

এ ব্যাখ্যাটা ধনপতির নিজের। নিজেই মনে মনে ব্যাখ্যা করে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমোবার আগে নটবরকে শুনিয়ে দিলে, তার কথাটা সে ভেবে দেখবে।

আরো তিন দিন, তিন রাত, ধনপতি তার খেয়াল-খুশিতে আবাদের লাটে লাটে ঘুরে বেড়ালো। তারপর ঘরে ফেরার পালা।

ফেরার পথে ধনপতি সাতজেলিয়ার হাটখোলায় একবার নামবে বলে ঠিক করে রেখেছে। গুরুপদ হাউলির জামাই-এর বাড়ি সাতজেলিয়ার হাটখোলার কাছে। গুরুপদ বেঁচে নেই, কিন্তু তার সম্পর্কে যে যেখানে আছে, তাদের সঙ্গে বন্ধনটুকু বজায় রেখেছে ধনপতি। তাছাড়া গুরুপদ'র বড় মেয়ে বারুণীবালা প্রায় তার সমবয়সী। দু'এক বছরের ছোট। ছোটবেলায় ওরা একই সঙ্গে খেলেছে, বেড়িয়েছে। গুরুপদ'র ইচ্ছে ছিল ধনপতিকে জামাই করে। কিন্তু জাতের বিচারে শেষপর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। গুরুপদ'র ইচ্ছে আর ধনপতির মায়ের ইচ্ছেই সেদিন সব ছিল না। সমাজ বাদ সেধেছিল। যাই হোক, বারুণীর সঙ্গে ধনপতির যেটুকু ভাব-ভালোবাসা ছিল, ওদের সমাজ তার দাম দিতে পারেনি।

বারুণীর কথাটা মনে পড়তে ধনপতির বুকের মধ্যে একটা চাপা ব্যথা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। সে ব্যথাটা কখনো কখনো বড় তীব্র হয়। কিন্তু বারুণীর সামনে দাঁড়ালে ধনপতিকে দেখে কে বলবে তার বুকে ব্যথা আছে। লোকে বোঝে না, কিন্তু বারুণী বোঝে। তার এতটুকু বুঝতে ভুল হয় না। ধনপতির সামনে তাই সে কোনদিন বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। পাছে তার দুর্বলতা অন্যের চোখে ধরা পড়ে তাই তার নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা।

জোয়ারের টানে ধনপতির ডিঙি চলেছে। কিন্তু উত্তরে বাতাসের বেগটা যেন বড্ড বেশি। ডিঙি ঠিক মতো এগোচ্ছে না।

সাতজেলিয়ার হাটখোলা আর দূরে নয়। রাঙাবেলিয়ার লাট দেখা যাচ্ছে। ওখান থেকে সামান্য পথ। বেলা থাকতে থাকতে পৌঁছে যাবে সাতজেলিয়ায়।

ধনপতি মাথা গুঁজে একভাবে দাঁড় টেনে চলেছে আর ভাবছে বারুণীবালার কথা। এখন কী করছে সে? ধান ভানছে, না হয় শুকনো ঘুঁটে তুলে 'পাঁজা' করছে; না, হয়তো গোবর-গোলা দিয়ে ঘরের দাওয়া নিকোচ্ছে।

বারুণীবালাকে গেল বছরেও দেখেছে ধনপতি। সে ঠিক তেমনি আছে। চারটি ছেলেমেয়ের মা হয়েছে, তা যেন বোঝাই যায় না। রায়মঙ্গলের মতো বারুণীর দেহেও এখনো রূপ-যৌবন টলমল করছে। ঠিক তেমনি আছে সে, যেমন পনের-বিশ বছর আগে ছিল।

যতবার বারুণীবালার কাছে গেছে ধনপতি, ততবার বারুণীবালা তাকে বলেছে, এবারে ঘর-সংসার করো। বাউণ্ডুলের মতো আর কতকাল নদীনালায়

ঘুরে বেড়াবে ? ধনপতি সে কথার উত্তর দেয়নি, সে শুধু হেসেছে। সে হাসিটা কখনো কখনো উচ্চগ্রামে পৌঁছেচে।

ধনপতির এই জীবনের মধ্যে যেটুকু শিথিলতা তা যেন বারুণীবালার জন্যে। বারুণীবালার মনের মধ্যেও তাই অশান্তির স্পর্শ। ধনপতি সংসার করছে জানলে সে যেন সত্যিই খুশি হয়। কিন্তু সে কথাটা কখনো ধনপতিকে বোঝাতে পারেনি। বোঝাতে চেয়েছে, কিন্তু মনের মধ্যে বোবা কান্নার ঢেউ এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। মনের কথা আব খুলে বলা হয়ে ওঠেনি। তারপর ধনপতিও তার বাড়িতে এসে কখনো দু'দণ্ড স্থির হয়ে বসে না। সে যেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসে। এসেই বারুণীবালার ছেলেমেয়েদের কাছে ডাকে। সাতজেলিয়ার হাটখোলা থেকে কিনে আনা মেঠাইগুলো জনে জনে ভাগ করে দেয়, তারপর তাদের নিয়ে দু'পাঁচ-মিনিট হাসি-তামাসা করে। বারুণীবালার স্বামী কেষ্ট নস্কর, সে যদি বাড়ি থাকে, তবে তাকেও ধনপতি 'বোনাই' বলে ডেকে একটু রঙ্গরসিকতা করে। কেষ্ট নস্কর মানুষটাও আমুদে। ধনপতিকে পেয়ে সে যেন খুশিই হয়। বলে, 'শালা আশের আসা হয়, কিন্তু থাকা হয় না কেন! মাছটাছ মারি, ভালো-মন্দ রসুই করুক তোমার বোন, আজ দিনটা কাটিয়ে যাও।' ধনপতি বলে, 'পরের বার এসে থাকবো, তোমার গিন্নীকে ডাক দেও, দুটো কথা বলে যাই।' এই দুটো কথা বলার জন্যেই কি ধনপতির আসা, না বারুণীবালাকে চোখের দেখা দেখে যাওয়া।

বারুণীবালা আসে হাতের কাজ চুকিয়ে কিংবা কাজ ফেলে। দাওয়ায় মাদুর পেতে পান জল দেয়, তারপর বাপের বাড়ির দেশের ভালোমন্দ খবরাখবর নিয়ে কথা শুরু করে।

ধনপতি দুদণ্ড স্থির হয়ে বসতে চায় না, এসেই 'উঠি-উঠি' আরম্ভ করে। প্রতিবার প্রায় একই কথা বলে, ঘাটে না' বেঁধে এইছি। না গেলে নটবর খুড়ো রাগারাগি করবে। তা ছাড়া দেরি করলে 'বেগন' পড়ে যাবে।

এই 'উঠি-উঠি' করে যেটুকু সময় উঠতে। তার মধ্যে দু'চার কথা যা হয়, তাই। এই কথার মধ্যেই বারুণীবালা বলে, 'এবারে একটা ডাগর মেয়ে দেখে বে থা করো। এভাবে আর মানায় ? তারপর বয়েস তো হেঁটে যাচ্ছে।'

কেষ্ট নস্কর কাছে-পিঠে থাকলে সেও বারুণীবালার কথায় তালিম দিয়ে বলে, 'শালা আশ—আর দেরি নয়, যা হোক একটা কাণ্ড করে ফ্যালো। এরপর মুখে হাঁ করলেও কেউ রা কাড়বে না। বলো তো একটা বুড়িটুড়ির খোঁজ করি।'

এ-সব কথায় ধনপতি তার স্বভাবমতো হো হো করে আকাশ-ফাটানো হাসি হাসে। সেই হাসির মধ্যেই হয়তো বা বলে ওঠে, 'ধনপতি মাঝির আবার ঘর ,ক! ডিঙি নে জীবন ভোর করে দেব। ঘরের বাতিক আমার নেই।'

ধনপতির এই হাসি আর কথা—এরপর বারুণীবালা আর তার সামনে থাকতে পারে না। সরে যায় আড়ালে।

বিদায় নেবার আগে ধনপতি নিজেই যায় বারুণীবালার কাছে। 'আজ যাই, আসবো ফের' বলে বারুণীবালার মুখের দিকে চেয়ে পরক্ষণে চলে যায় ঘাটের পথে। খিড়কির ধারে দাঁড়িয়ে থাকে বারুণীবালা, যতক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়, ততক্ষণ চেয়ে থাকে ধনপতির দিকে। লম্বা লম্বা পা ফেলে ধনপতি অদৃশ্য হয়ে যায় ভেড়ির আড়ালে। বারুণীবালা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে ফিরে আসে ঘরে। হাতে কাজ না থাকলেও কাজের অছিলায় নিজেকে অহেতুক ব্যস্ত করে তোলে। না হয়, ছেলেমেয়েদের নিয়ে খানিক মাতামাতি করে। সময়ে আবার পুরোনো স্মৃতির ওপর পলেস্তারা পড়ে যায়।

সাতজেলিয়ার হাটখোলার ঘাটে ডিঙি বেঁধে ধনপতি আজও আসে বারুণীবালার বাড়ি। দূর থেকেই চিৎকার জুড়ে দেয়, বোনাই আছো—বোনাই?

কারো সাড়া নেই। অথচ একটা ঘরের দরজা খোলা। উঠোনে বাঁধা দুটো গাই। একটা বাছুর ছুটোছুটি করছে উঠোনে। যখনই আসে ধনপতি, তখনই বারুণীবালার কাচ্চাবাচ্চারা ছুটে আসে। মেঠাই নেবে বলে লাফালাফি শুরু করে দেয়। কিন্তু এবারে কারো সাড়া নেই কেন? তবে কি কেউ বাড়ি নেই!

হঠাৎ ধনপতির চোখ পড়ে খিড়কির দরজার দিকে। বারুণী আসছে। ধনপতির চিৎকার সে শুনেছে খিড়কির ডোবা-পুকুর থেকে। আ-মাজা বাসনগুলো ঘাটে ফেলে রেখে চলে এসেছে তাড়া করে।

ধনপতি এগিয়ে যায়। বলে, কী হলো, সব গেল কোথায়?

বারুণী বলে, তোমার বোনই-এর সাথে সব পীরগঞ্জে মেলা দেখতে গেছে। সাঁঝের বেলায় ফিরবে।

—তা বেশ হয়েছে, ধনপতি জিজ্ঞাসা করে, তুমি যাওনি কেন?

—মেলা দেখার শখ আমার নেই। বারুণীবালা বলে, তা দাঁড়িয়ে কেন, বসবে এসো। না, কি—বসবে না, ঘাটে না' বেঁধে এয়েচো।

দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে দেয় বারুণী। ধনপতিকে বসতে বলে। মাদুরে

পা-মুড়ে বসে ধনপতি। মেঠাই-এর ঠোঙা দেয় বারুণীর হাতে। বলে, এক ঘটি জল দেও, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

—বোসো, আনি।

শুধু জল নয়, একটা পাত্রে খানিকটা খেজুরের গুড় মাখা মুড়ি এনে মাতুরের ওপর রেখে বারুণীবালা বলে, যাও-হাত মুখ ধুয়ে এসো। ওই কানাচে মেটে কলসিতে জল আছে।

হাত মুখ ধুয়ে ধনপতি গুড় মুড়ির পাত্র নিয়ে বসে। গ্রাসে গ্রাসে শেষ করে ফেলে গুড় মাখা মুড়ি। তারপর ঢকঢক করে এক ঘটি জল পান করে আরামের নিঃশ্বাস ছাড়ে।

বারুণীবালা জিজ্ঞাসা করে, কোথাও গিছিলে—না যাচ্ছো ?

আসা-যাওয়ার পথের কথা সংক্ষেপে শোনায় ধনপতি। তার মধ্যে একটা নতুন কথা ওর মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যায়। কতদিন পর বারুণীকে একা পেয়েছে সে। এমন করে আলাদা করে তাকে কাছে পায়নি দীর্ঘদিন।

ধনপতির মনের কথা বোধহয় বারুণীবালার মনেও। নয়তো সহজ হয়ে বসে থাকার মধ্যেও অমন জড়তা এসে ওর মনটাকে জড়িয়ে ফেলবে কেন।

কতদিন পর এলো ধনপতি, কত কথা বলবে, কিন্তু কথা বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বরটা হারিয়ে গেল। বলতে পারলো না সে। তার মনের মধ্যে কেমন যেন ছটফটানি শুরু হলো। বারুণীবালার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দৃষ্টিটা যেন ঝাপসা হয়ে উঠলো।

বারুণীবালাও বলার মতো কথা খুঁজে পেল না। অন্য সময় হলে দেশ-গাঁয়ের খবর শুধোত, ভালোমন্দ খবর জানতে চাইতো, কিন্তু আজ কোনো খবর জানবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলো না।

বলিষ্ঠ দেহ ধনপতির। মনটাও তার তেমনি। পাগলা ঘোড়ার রাশ যেমন করে টেনে ধরে পাকা সওয়ার, তেমনি ধনপতি তার দুরন্ত মনটাকে যখন তখন ইচ্ছে করলে একটা জায়গায় এনে দাঁড় করাতে পারে। এতদিন তো সে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। যাত্রার আসরে পাপের বিরুদ্ধে, অনাচারের বিরুদ্ধে যেমন গেরুয়া আলখাল্লা পরা বিবেক গান গেয়ে ওঠে, তার মনের মধ্যেও যখন কোনো দুষ্ট চিন্তা এসে হানা দেয়, তখনই তার বিবেক চড়া সুরে গান গায়। হালকাঠ-ঝাঁকা ধনপতি মাঝি সে গান শোনে। তার বুকটা ভরে ওঠে।

—আজ আমি যাই বারুণী, ধনপতি উঠে দাঁড়ায়, বলে, বোনাইরে বোলো আমার কথা, ছেলেমেয়েদের জানিও তাদের মামা এইছিল, কেমন ?

—আর একটু বসবা না, বারুণী-অনুচ্চকণ্ঠে বলে, কদ্দিন পর এলে, মন খুলে দুটো কথা বলা হলো না।

—ঘাটে ডিঙি বাঁধা রয়েছে, তা ছাড়া এই টানেই না গেলে আজ আর মোল্লাখালি যাতি পারবো না। তুমি আর আপত্তি কোরো না।

ধনপতি দাওয়া থেকে নেমে পড়ে উঠোনে। বারুণীবালা তবুও একবার বলে, আর একটু বসে যাও, ঘরে দুধ আছে—গরম করে দেই, খেয়ে যাও।

—আজ থাক, এবারে একদিন আসবো, ভালো করে পেট ভরে খেয়ে যাবো, কেমন ?

—কবে আসবা বলো ?

—তার কি ঠিক আছে। এ গাঙে ধনপতির ডিঙি যখনই যায়, এ ঘাটে ডিঙি না বাঁধলে তার চলে না, বুঝেচো—এ হলো বারুণীবালার ঘাট। বলে ধনপতি হো হো করে হেসে ওঠে। তারপর মুহূর্তমাত্র না দাঁড়িয়ে ঝড়ের মতো ছুটে যায় নদীর ঘাটের দিকে।

বারুণীবালা অচঞ্চল দাঁড়িয়ে থাকে দাওয়ার নিচে। তার দুচোখে নামে জলের ধারা। বারবার চাপা-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেও তার ভারি বুকটা যেন হালকা হয় না।

কমলি বাছুরটা কখন যেন ডেকে ওঠে হাম্বা রবে। চমক ভাঙে বারুণীবালার। ঘাটে পড়ে রয়েছে এঁটো বাসন। খিড়কির দরজা দিয়ে ত্বরিৎ চলে যায় বারুণী। ধনপতির শেষের কথাগুলো নতুন করে স্মরণ করতে চেষ্টা করে। সাতজেলিয়ার হাটখোলার ঘাটের নতুন নাম দিয়েছে ধনপতি, বারুণীবালার ঘাট। একথা ভাবতেও বারুণীর মনটা ভরে ওঠে।

॥ তিন ॥

প্রায় এক পক্ষ হয়ে গেল, মোল্লাখালির আঘাটায় ডিঙি গেরাবি করে রেখেছে ধনপতি। ডিঙি ভাসাবার কোনো গরজ নেই। কতজন খোশামোদ করে গেছে কদিন ধরে, চড়া ভাড়ার লোভ দেখিয়েছে, তবু ধনপতি সে ভাড়া

ধরেনি। বলেছে, এখন কোনো ভাড়া ধরবে না। শুধু তাই নয়, মোল্লাখালির হাটে ক'দিন আগে চার দিনের জন্যে যাত্রাগানের আসর বসেছিল, নটবর ঘরামি কত খোশামোদ করেছে ধনপতিকে, কিন্তু ডিঙি ছেড়ে ওঠেনি ধনপতি। এমন কি, নিজের ঘরেও যায়নি। নটবর কত রকমে বোঝাতে চেয়েছে ধনপতিকে, কিন্তু ধনপতি সেই এক কথা বলেছে, 'তুমি যাও ঘরামি খুড়ো, ও সব নাচগান আমার ভালো লাগে না।'

ধনপতির ধারণা নটবর যেন একটু রাগই করেছিল, নয়তো পাঁচ সাতদিন তার দেখা নেই কেন! ধনপতির মনে চিন্তা ঘরামি খুড়োর জন্যে। এমনও হতে পারে অসুখ করেছে নটবরের। রাগ করে এতদিন ঘরে বসে থাকার মানুষ সে নয়।

সেদিন বিকেল। ধনপতি অনেক চিন্তা করে নটবরের বাড়ি গেল। যা ভেবেছিল তা নয়, নটবরের কিছু হয়নি। অসুখ করেছে ফুলটুসির। শয্যা নিয়েছে। সর্বাঙ্গে তার ব্যথা—হাত-পা নাড়তে ব্যথাটা টনটনিয়ে ওঠে।

নটবর বসেছিল ফুলটুসির মাথার কাছে। ধনপতি ঘরে ঢুকতে সে উঠে একটা চাটাই পেতে দেয়। শোনায় স্ত্রীর অসুখের কথা। বলতে বলতে নটবরের চোখটা ছলছল করে ওঠে। শেষে ধরা গলায় বলে, ফুলটুসি বলে কি জানিস—বলে, ও নাকি বাঁচবে না। ওর মা নাকি সগ্য থেকে ওকে ডাক দেছে। তুই বল ধনপতি, স্বপ্ন কখনো সত্যি হয়?

ধনপতি কথা বলে না। চেয়ে থাকে ঘুমন্ত ফুলটুসির দিকে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে ফুলটুসি। একটা ময়লা কাঁথা দিয়ে তার বুক থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা। মুখখানা থমথম করছে। কেমন যেন ফোলা-ফোলা চোখ মুখ। কপালের কাছে গুটি গুটি কি যেন বেরিয়েছে।

—কারে দেখাচ্ছো খুড়ো? ধনপতি জিজ্ঞাসা করে।

—হারান বদ্যি চিকিচ্ছে করতেছে। বলে বাত-জ্বর হয়েছে। ওষুধ পথ্যি খাচ্ছে, তবু রোগের কমতি নেই—নটবর চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে, আমার মন কিন্তু ভালো বলে না ধনপতি।

ধনপতি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। নটবরের কথা তার কানে যায় না। তার মনের মধ্যে তখন অন্য চিন্তা। ফুলটুসির অসুখটা সহজ কিছু নয়। হারান বদ্যির চিকিৎসায় কিছু হবে না। ওরা তো বদ্যি নয়, গো-বদ্যিরও অধম। ওদের ওষুধ খাওয়ার চেয়ে ভগবানের নামে রাখা ভালো।

—কথা কস নে কেনে? নটবর বলে, কি যে করি, তার ঠিক পাচ্ছি নে। হারান বদ্যি ছাড়া এখানে তো চিকিচ্ছে করার কেউ নেই।

—আমি বলি কি, খুড়িরে হাসপাতালে নে চলো। ওখানে তো নতুন পাশ করা ডাক্তার এয়েচে—তেনারে দেখিয়ে হাসপাতালে ভরতি করে দে দেও। সবাই বলে নতুন ডাক্তার নাকি খুব ভালো।

ফুলটুসি হাউ হাউ করে উঠলো হাসপাতালের নামে। হাসপাতালে সে যাবে না। মরতে হয় এখানেই মরবে। এই শ্বশুরের ভিটেয়। আর্তকণ্ঠে বলতে থাকে, ওগো—আমারে হাসপাতালে নে যেও না।

ধনপতি কিছু সময় চুপ করে থাকে। তারপর সে বুঝিয়ে বলতে আরম্ভ করে হাসপাতালের কথা। কিন্তু কাকে বোঝাবে। ধনপতি যতই বলুক, সেখানে পাশ করা ডাক্তার আছে, শহরের হাসপাতালের মতো পাকাবাড়ি সেখানে, দামী দামী ওষুধ-পত্তর আছে—তারপর আরো সব কথা, তবু ফুলটুসি বোঝে না। সে ককিয়ে ককিয়ে বলে, আমি এ-ঘর ছেড়ে কোনো ঠাঁই যাবো না। যদি মরি এখানে মরবো।

ধনপতি বলে, আমার কথা শুনলি ভালো করতে খুড়ি।

ফুলটুসি তার রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও বলে ওঠে, তবে আমারে নে ডিঙিতে তোল, আমি গাঙে ঝাঁপায়ে পড়বো।

এরপর আর কোনো কথা চলে না। না নটবর, না ধনপতি—কেউ কিছু বলে না। দু'জনে চুপচাপ বসে থাকে ফুলটুসির বিছানার কাছে। ফুলটুসি অস্ফুটকণ্ঠে কাতরাতে কাতরাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

জানালা দিয়ে ঘরে এসেছিল বিকেলের রোদ। এক সময় সে রোদ জানালার পথ থেকে হারিয়ে গেল। খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে ধনপতি যেন চমকে ওঠে—তাড়াতাড়ি উঠে আসে ঘরের বাইরে।

না, এখনো সূর্য অস্ত যায়নি। এখনো লাল সূর্যটা পশ্চিম দিগন্তের দক্ষিণ কোণ ঘেঁষে জ্বলজ্বল করছে।

নটবরের বাড়ির অদূরেই জলঘেরির উঁচু বাঁধ। ধনপতি হন্তদন্ত হয়ে বাঁধের ওপরে গিয়ে ওঠে। চেয়ে থাকে দিগন্তের দিকে, যেখানে শীতের সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

সূর্য ডুবছে। ধনপতি আত্ম-সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে আছে অচঞ্চল।

সূর্য ডুবে গেল। হারিয়ে গেল একটা দিন। নতুন দিন আসবে, কিন্তু এ দিনটা আর ফিরে আসবে না।

সূর্য ডোবার পরেও অনেক সময় সেই ভেড়ি বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে ধনপতি। তারপর আস্তে আস্তে নেমে আসে বাঁধের ওপর থেকে। আর নটবর খুড়োর বাড়ির পথ নয়, মোল্লাখালির হাটের মধ্যে দিয়ে আপন ডিঙিতে ফিরে আসে।

জোয়ার এসেছে গাঙে, জল অনেকখানি ওপরে উঠেছে। ধনপতির গেরাবি করা ডিঙি জোয়ারের টানে টলমল করছে।

ডিঙির কাছি ধরতে প্রায় এক-হাঁটু জলে নামতে হয় ধনপতিকে। তারপর কাছি টেনে ডিঙির মুখটা টেনে আনে। দু'হাতে ডিঙির মাথা ধরে লাফিয়ে ওপরে ওঠে ধনপতি। কিনারে বসে কাদামাখা পা ধুয়ে ডিঙির মাথায় ছেঁড়া চট বিছিয়ে বসে।

ভেবেছিল ধনপতি ভাববে না ফুলটুসির কথা—তবু তাকে ভাবতে হয়। শুধু তাই নয়, তার মনটাও যেন কাতর হয়ে ওঠে নটবর খুড়োর কথা ভেবে। ধনপতির মন বলছে, খুড়ি এবার মরবে। হারান বদ্যি বলছে বাতজ্বর, কিন্তু ধনপতির ধারণা 'মায়ের দয়া' হবে খুড়ির। গা-গতর ব্যথা সেই জন্যেই। তারপর মুখের ওপর বেশ গুটি দেখা দিয়েছে। ধনপতির মায়েরও ঠিক এমনি হয়েছিল। বাইরে থেকে তেমন বোঝা যায় না, কিন্তু দেহের ভেতরটা হাজার হাজার রক্তঝরা গুটিতে ভরে যায়। মাকে সে দেখেছে, মায়েরও চিকিৎসা করেছিল এই হারান বদ্যি।

হারান বদ্যির কথা উঠলেই ধনপতি বলে, ও বদ্যি নয়—যম, যমের বাড়ি যাতি চাওতো ওরে ডাকো, ওর ওষুধ খাও। ব্যাটা ছিল ওঝা, হলো কবরেজ, আবার নল কিনে ডাক্তার হয়েছে। নেহাত ফুলটুসি ঘরে ছিল বলেই আজ হারান বদ্যির কথা শুনেও ধনপতি তেমন কিছু বলেনি। চুপ করে ছিল।

নটবর খুড়োর জন্য চিন্তা হয় ধনপতির। সত্যি খুড়ি যদি এ যাত্রায় মরে যায়, তা হলে খুড়োর কষ্টের অন্ত থাকবে না। দূর ছাই কী হবে অত কথা ভেবে।

—কার ডিঙি, পারের ভেড়ি থেকে ডাক শুনতে পায় ধনপতি, না'য়ে কেডা?

—আমি ধনপতি।

—অ, লোকটি কিনারার দিকে এগিয়ে আসে পায়ে পায়ে। বলে, আমারে তুমি চেনবা না, তবে আমি তোমারে চিনি। তুমি তো মালকাঠ-ঝাঁকা ধনপতি?

—হু, লোকে তাই বলে।

—তা, আমায়ে একটু কাউখালি নে যাবা?

—না, আমি এখন ভাড়ায় যাবো না।

—লোকটি খানিকসময় চুপ করে থাকে। তারপর অনুনয় জানিয়ে বলে, বড্ড বিপদে পড়েছি ভাই—নয়তো এই রাত-বিরেতে কেউ নদী পথে যায়! খবর প্যালাম আমার মেয়েটার খুব অসুখ।

অসুখের কথা শোনার পরেও চুপ করে থাকে ধনপতি। লোকটি তবু আশা ছাড়ে না। সে বলতে থাকে, পাঁচ কোশ পথ হেঁটে আসতি বিলম্ব হয়ে গেছে, আর একটু আগে আসতি পারলে সন্ধ্যের লান্‌চো ধরতি পারতাম। তুমি একটু দয়া করো ভাই। ঘাটে একটাও ডিঙি না পেয়ে তোমার কাছে এ্যালাম। একজন লোক বললে, উদিকে যাও, আঘাটায় ধনপতির ডিঙি আছে—সে যদি নে যায়, তবে যাতি পারবা।

ধনপতির মনটা যেন একটু নরম হয়েছে। জিজ্ঞাসা করে, তোমার বাড়ি কোথায়?

—ঠাকুরের আবাদে, লোকটি উত্তর দেয়, দুটো খেয়া পেরিয়ে তবে মোল্লাখালি এইচি।

—ঠাকুরের আবাদ আমি চিনি। ধনপতি বলে, কিন্তু কাউখালি যাতি গেলে উজোনে যাতি হবে। দাঁড় না হয় টানলাম, কিন্তু হাল ধরবে কেডা?

—হাল আমি ধরবানে।

—তবে এসো। বলে ছই-এর ভেতর থেকে টর্চ বার করে পারের দিকে আলো ফেললো ধনপতি। লোকটি কাদার ওপর দিয়ে নেমে আসে ডিঙির কাছে।

এতসময় ধনপতি লক্ষ্য করেনি লোকটির মুখের দিকে। মুখটা নজরে পড়তেই বড় চেনামুখ বলে বোধ হলো। কিন্তু ঠিক মনে করতে পারে না লোকটিকে কোথায় দেখেছে।

না—এ তার মনের ভুল।

হালে বসে লোকটি। বেশ বোঝা যায় তার হাল ধরা অভ্যাস আছে। ধনপতি পা-দুটো ভেঁজে দিয়ে সোজা হয়ে বসেছে দাঁড় ধরে। কাউখালি যেতে হলে এখন সারা পথ উজান বেয়ে যেতে হবে।

হালে বসা লোকটির নাম রাখাল মৃধা। ঠাকুরের আবাদে তিন পুরুষের বাস। তার আগে ওদের বাস ছিল ডায়মণ্ডহারবারের কাছাকাছি। ঠাকুরের আবাদ 'উঠিত' হলে কিছু জমি পত্তনি নিয়ে ওর ঠাকুরদা উঠে আসে ঠাকুরের আবাদে।

রাখাল মৃধার বয়েস হবে পঞ্চাশের কাছাকাছি। ওর বাপেরা ছিল তিন ভাই। ঠাকুরদার জমি-জমার তিন শরিক। ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যায় বাপ-কাকাদের মধ্যে। পৈতৃক যা ছিল, তাতো আছেই, এরপর বাপ-কাকারা নিজেদের মতো কিছু কিছু বাড়িয়েছে। রাখালের বাবা ভাইদের মধ্যে বড়। কাকারা আলাদা হলেও এখনো রাখালের বাপের ওপর তাদের কথা চলে না। দস্তুরমতো 'মান্যি' করে। সে কথায় কথায় বলে, 'সংসার আলাদা বলে আমরা তো আলাদা নই। এক মা'র পেটের ভাই আমরা।'

সে যাই হোক, কপাল মন্দ রাখালের। বংশের ধারাটা বোধহয় তার পুরুষে লোপ পেল। ছেলে-মেয়ে হয়েছিল ছ'টি, কিন্তু এমনি পোড়া কপাল দুটি মেয়ে ছাড়া আর সব এক-এক করে আঁতুড় ঘরেই গেছে। তারপর গাছ থাকলেও না হয় ফলের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু রাখালের বৌ-ও মরলো সান্নিপাতিক জ্বরে। সেঁজুতি আর সোহাগী—এই দুটি মেয়েই রাখালের চোখের মণি।

দুই মেয়েরই বিয়ে হয়েছে। বড় সেঁজুতি, স্বামীর ঘরেই আছে; ছোট জামাইকে ঘরেই রেখেছে রাখাল। গরীবের ছেলে ছোট জামাই—ঘরে আছে ছেলের মত। এই জন্যে শ্বশুরের ওপর রাগ বড় জামাই-এর। নিজেও আসে না, সেঁজুতিকেও পাঠায় না। সেঁজুতি আসতে চায়, কিন্তু জামাই-এর ভয়ে আসার উপায় নেই। বদরাগী জামাই - একটুতেই তার মাথায় খুন চেপে যায়। রাগারাগি করে বাড়ি মাথায় তোলে।

রাখাল মাঝে মাঝে যায় সেঁজুতিকে দেখতে। কী মেয়ে ছিল, আর কি হয়ে গেছে। তবু মুখ ফুটে কিছু বলে না। না বললে কি হবে, লোক-পরম্পরায় সবই শোনে রাখাল। মেয়েটাকে বড় কষ্ট দেয় জামাই। কথায় কথায় মেরে ফেলবো, ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো বলে শাসায়। তারপর এ-কথাও শুনেছে রাখাল, জামাই নাকি মাঝে মাঝে নেশা-ভাঙ করে। রাখাল অনেক আশা করে সেঁজুতির বিয়ে দিয়েছিল বড় ঘরে। কাউখালির গাঁতিদারের ঘর। সেঁজুতির শ্বশুর পানু ওরেফ পান্না মণ্ডলের দস্তুরমতো বোলবোলোয়া ছিল এ তল্লাটে। পানু মোড়ল বেঁচে থাকতে এসব কিছু শোনা যায়নি। ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পেল জামাই-এর গুণপনা।

এক মনে রাখাল মনের কথা বলছে। কতক কানে আসছে ধনপতির কতক তার কানে পৌঁছচ্ছে না। এক নাগাড়ে দাঁড় টেনে চলেছে সে। শীতের

মধ্যেও তার সর্বাঙ্গে ঘাম। উজান বেয়ে যাওয়া বড় মেহনত। তবু তো ছোট গাঙে একরকম চলছে, বড় গাঙের মুখে পড়লে আর রক্ষে নেই। তাও পিঠেন বাতাস হলে একরকম।

বড় গাঙের আড়পারে কাউখালি। গাঙের পাড় থেকে বসতি এলাকা মাইলটাক দূরে। পায়ে হেঁটেও যাওয়া চলে, নয়তো ঝিঙেতলার খাল দিয়ে গ্রামের ভেতর ঢোকা যায়। সে সব ভাবনা পরে। আগে বড় গাঙ পার হওয়া, তারপর ওসব চিন্তা।

বাঁক ঘুরেই বড় গাঙ। নাম কেউ বলে কালিন্দী, কেউ বলে পুঁইজালি। আসলে এটা কালিন্দীর ধারা। তবে মাঝি-মাল্লারা সাধারণত বলে থাকে বড় গাঙ। এ নামটা হারিয়ে গেছে রায়মঙ্গলের মুখে পৌছে।

বড় গাঙের মুখে পড়ে ধনপতি ফিরে চায় এপার ওপার। একে অন্ধকার তার ওপর ঘন কুয়াশা। কিছু দেখা যায় না। তবু চোখ টেনে টেনে দেখতে থাকে, কোন্ জায়গাটা দিয়ে পারে যাবে সে। যতই চেনা জানা হোক, ধনপতি জানে এ-সব গাঙকে বিশ্বাস নেই। যদিও এখন শীতের দিন, নদী শান্ত, তবু বিশ্বাস করা যায় না। কোথায় চোরা ঘোল আছে কে জানে। চোরা ঘোলে একবার পড়লে আর রক্ষে নেই। রাখালকে এর মধ্যে সাবধান করে দিয়েছে ধনপতি। নিজেও সাবধানী মাঝির মতো শক্ত হাতে দাঁড় টেনে চলেছে। শীতের রাতে সবচেয়ে বিপদ হল কুয়াশা—সামনে পেছনে দৃষ্টি চলে না।

মাঝদরিয়ায় পৌছে ধনপতি দেখতে পায় পাশাপাশি দুটি গয়নার নৌকো চলেছে ভাঁটার টানে। ধনপতি ডেকে জিজ্ঞাসা করে, ও ভাই—কাউখালি যাতি হলে কি সোজা পার হবো? ও ভাই—

গয়নার নৌকোর মাঝি বলে, এই রেতে তো কিছু ঠাওর পাইনে ভাই।

ধনপতি বলে, কোথায় এ্যালাম বলতি পারো?

উত্তর আসে, এপারে দেখিতো বোসের আবাদ—ওপারে তো কাউখালি হতি পারে। তা এই রেতে উজোনে যাবার কি দরকার পড়লো?

ধনপতি বলে, দরকার না হলে কি এই বিপদের ঝুঁকি কেউ নেয়। দেখি, পারে তো যাই।

রাখাল মৃধারও যেন একটু চিন্তা হয়েছে। বলে, কাজডা হয়তো ভালো হয়নি ধনপতি ভাই। রাতটা কাটিয়ে এলেই ভালো হতো। গাঙ পথে বিপদ অনেক।

ধনপতি বলে, ও-সব ভাবনা আমার নয়, আমি ভাবি—রাতে ঠিক পৌছতি

পারবো কিনা। যাচ্ছো মেয়ের অসুখের খবর পেয়ে—এখন তাড়াতাড়ি পৌঁছনোর দরকার—নেও, ওসব ভাবনা ভেবে লাভ নেই।

ঢেউ কেটে কেটে ধনপতির ডিঙি চলেছে বড় গাঙের পারে। মাঝে চুপ করেছিল রাখাল মৃধা, আবার বলতে আরম্ভ করে সেঁজুতির কথা।

সেঁজুতির অসুখ—খবর দিয়েছে সেঁজুতি নিজে। তাও লোকমুখে। বাপের বাড়ির দেশের মানুষ দেখতে পেয়ে তাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে। তাও গোপনে। শ্বশুরবাড়ির কাকপক্ষীও জানে না। খবর পেয়েই রাখাল মৃধা ছুটে চলেছে কাউখালি। মেয়েকে চোখে না দেখা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

রাখালের দুঃখটা ধনপতির মনেও। সেঁজুতির কথা শুনতে শুনতে তার মনও ভিজে ওঠে। চোখে দেখেনি কস্মিনকালে—অথচ অদেখা সেঁজুতির জন্যে তার মনটাও কেমন ছটফট করতে থাকে।

বড় গাঙের পার বরাবর এসে ঝিঙেতলার মুখ। খালের মুখের কটা বয়া ভাসছে। 'বেনজাল' পেতেছে মাছমারারা। দুটো জেলেডিঙি খালের মাঝে গেরাবি করা। একটা ডিঙিতে টিমটিম করে আলো জ্বলছে। সে আলোয় স্পষ্ট দেখা যায়, তিন চারজন লোক জড়োসড়ো হয়ে বসে। ধনপতির ডিঙি খালের মুখে ঢুকলেই জেলেডিঙির আলোর জোর বেড়ে যায়। একটা লোক ছই-এর বাইরে এসে বলে ওঠে, সামলে ভাই—জালের দড়ি টানা রয়েছে, ওই পাশের মুখ দে যাও।

ডিঙি মুখ ঘুরিয়ে পিছু গিয়ে তারপর একটা কোণ বরাবর এগিয়ে খালের ভিতরে ঢোকে ধনপতি। খালের ভিতরে ঢুকে খানিকটা স্বস্তি বোধ করে রাখাল। আর দূরে নয়, বিশ পঁচিশ মিনিট বেয়ে গেলেই কাউখালির মোড়লদের বাড়ি। খালের ধারেই বাড়ি। ঘাটের নামও হয়েছে তাই মোড়লবাড়ির ঘাট।

মোড়লবাড়ির ঘাটেই ডিঙি বাঁধলো ধনপতি। রাখাল মৃধা একা নামতে নারাজ। কিন্তু ধনপতি জানায়, এক্ষেত্রে রাখালের জামাই-এর বাড়ি যাওয়া তার পক্ষে ঠিক হবে না। রাখাল নাছোড়বান্দা। শেষটা ধনপতি কতকটা নিমরাজি হয়েই রাখালের সঙ্গে নামে। ডিঙিটা টানা কাছি দিয়ে বেঁধে রাখে ওপরের একটা কেওড়া গাছের গুঁড়ির সঙ্গে।

এত পথ কত ব্যস্ততা ছিল রাখালের। কিন্তু মোড়লবাড়ির কাছে এসে সে কেমন স্থির হয়ে যায়। তবু পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে।

মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা পানু মোড়লের বাড়ি। দু'মহলে ভাগ করা। সামনের দিকে ধানের মরাই, গোলাঘর, গোয়াল, নাগারিঘর, চণ্ডীমণ্ডপ ছাড়া আরো কয়েকটা দোচালা। পিছনের দিকে আর এক মহলে পাশাপাশি পাঁচটা টিনে ছাওয়া আটচালা ঘর। দক্ষিণের ঘরটাই রাখালের জামাই-এর।

সদর মহলে ঢুকতেই দুটো কুকুর ঘেউ ঘেউ করে লাফিয়ে পড়লো নাড়া-পলের গাদার ওপর থেকে। কিছুতেই থামে না তাদের ডাক। একটানা ঘেউ ঘেউ করে সারা বাড়ি মাতিয়ে তোলে।

বোধহয় কুকুরের ডাকেই, বার-মহলের চাকর-মান্দারের ঘুম ভেঙে গেছে। শীতের মধ্যে বিছানা থেকেই কুকুর দুটোকে 'বাঘা কালু' নামে ডাক দেয়। তবু কুকুর দুটো থামে না। এতক্ষণে লোকটি উঠে আসে। তেল-চিটে কাঁথা গায়ে জড়িয়ে লোকটি কাঁপতে কাঁপতে উঠোনে এসে দাঁড়ায়। কুকুর দুটোর ডাক এবারে বন্ধ হয়েছে।

এ-বাড়ির পুরনো মান্দার মদন। রাখাল মৃধাকে সে চেনে। বড় কর্তার শ্বশুর বলে 'মান্যিও' করে। ডাকে খুড়োমশায় বলে।

—এই রেতে খুড়োমশায়!

—বেগনে আসতে রাত হয়ে গেল। সন্ধ্যের লনচো ধরতে পারিনি। ডিঙি নে এইচি!

—অ। মদন কি যেন ভাবে ক্ষণমাত্র। তারপর মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে, বড় কত্যা এখনো ফেরেনি। ফিরতি রাত হবে।

—আরো রাত হবে! রাখাল বিস্মিত হয়।

—যাত্রার আখড়ায় গেছে। কত্যা যে যাত্রার দল খুলিছে। দুটো বই 'পেলে' হবে। হঠাৎ মদন নিজের ভুলে নিজেই যেন চমকে ওঠে। বলে, এই দেখেন—মশায়রা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁড়ান, ছোট কত্যাকে ডাক দেই।

রাখালের ধৈর্যে সয় না। মনে করে মদনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে সেঁজুতির খবর। কিন্তু তা কি সম্ভব! বাড়ির মান্দারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে বাড়ির বৌ-এর খবর।

—বড় মা'রে দিনকতক ঘরে নে রাখেন খুড়োমশাই। মদন বলে ফেললো কথাটা। বলেই থতমত খেয়ে যায়।

ভিতর-মহলের দরজায় মুখে দাঁড়িয়ে ছোট কর্তাকে ডাক দেয় মদন। দরজা খুললো এ বাড়ির ছোটকর্তা অর্থাৎ সেঁজুতির দেওর। দরজা খুলেই

তালুইমশায়কে দেখে অবাক হয়ে যায়। পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলে, এতো রাতে তালুইমশায়! আসুন, আসুন।

সেঁজুতি বোধহয় জেগেছিল, সাড়া পেয়েই দরজা খুলে বাইরে আসে। এসেই—বাবা, বলে কতকটা আর্তকণ্ঠে ডুকরে ওঠে। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নেয়। ধীরে সুস্থে এগিয়ে এসে বাবাকে প্রণাম করে। জিজ্ঞাসা করে, ভালো আছো তো বাবা? সোহাগী কেমন আছে?

—সে ভালোই আছে মা। রাখাল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সেঁজুতিকে। কি ছিল, আর কি হয়েছে সেঁজুতি। চিনবার উপায় নেই। হাড়-মাস এক হয়ে গেছে। গায়ের রঙ ঝুল পড়া। শুধু ঢলঢল করছে মুখখানি। আর ডাগর চোখ দুটি ঠিক তেমনি আছে।

বাবা মেয়ে দুজনের চোখেই জল। সে জল শুকিয়ে যাবার আগেই গণ্ড বেয়ে ঝরে পড়ছে মাটিতে।

ধনপতি একটু দূরে দাঁড়িয়ে। দূর থেকেই সে একবার পলকের দৃষ্টিতে দেখেছে সেঁজুতিকে। পলকের দেখায় বুঝতে পেরেছে, অনেক দুঃখের বোঝা নিয়ে বেঁচে আছে এই মেয়ে।

—বৌঠান, তালুইমশায়কে ঘরে নে যাও। আর শোনো, তুমি ব্যস্ত হয়ো না, তোমার জাকে ডেকে দিচ্ছি আমি।

বেশ শান্ত স্বভাবের ছেলে সেঁজুতির এই লক্ষ্মণ দেওরটি। নামেও লক্ষ্মণ, স্বভাবেও নামের অনুরূপ। কিন্তু রাম নামে 'ঘেন্না' ধরে গেছে রাখালের। জামাই-এর নাম কেন যে রামচন্দ্র রেখেছিল বেয়াই। রাম নয় তো, রাবণ। একেবারে মহীরাবণ।

—ওর ভালো হবে মা। রাখাল বলে, ও ছেলে বেয়াই-এর নাম রাখবে।

এক ঘরে বাবা-মেয়ের কথা চলছে, অন্য ঘরে লক্ষ্মণ বসেছে ধনপতিকে নিয়ে। ছোট-বৌ রান্না ঘরে গেছে। কুটুম্বদের জন্যে রান্না করতে।

সেঁজুতির দুঃখের কাহিনী শুনলো রাখাল। বাপ মারা যাওয়ার আগে থেকেই 'পান' দোষ ছিল রামচন্দ্রের। তবে তখন ছিল গোপনে। এখন আর গোপন বলে কিছু নেই। প্রতি রাত্রে মদ খাওয়া তো আছে, তারপর অন্য দোষও ঢুকেছে। মালোপাড়ায় এক বিধবার ঘরে তার নিত্য যাতায়াত। প্রায় রোজ রাত কাবার করে ঘরে ফেরে রামচন্দ্র। এসেই সেঁজুতির ওপর বে-ধড়ক গালিগালাজ আরম্ভ হয়ে যায়। কথার প্রতিবাদ করলে কিল, চড়, কোনদিন বা লাথি।

পর পর দুটি সন্তান মারা গেছে সেঁজুতির। তৃতীয়ের আশা ছিল। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়লো। কদিন আগে শেষ রাতে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে সেঁজুতিকে ডাকে। ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল সেঁজুতির। তাই নিয়ে অশ্রাব্য উক্তি, মুখের ওপর কি যেন বলেছিল সেঁজুতি, তারপরেই তলপেটে লাথি।

এরপর আর বলতে পারে না সেঁজুতি। কান্নায় ভেঙে পড়ে।

কিছুক্ষণ পরে সেঁজুতি নিজে থেকে চোখের জল মুছে ফেলে। নিজে থেকেই শান্ত হয়।

রাখাল এত সময় চুপ করে থেকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেচে। মেয়েকে সে নিয়ে যাবে। জামাই যদি নাও পাঠাতে চায়, তবুও। সে মনে করবে, তার মেয়ের বিয়ে হয়নি, না হয়—

এর পরের কথা ভাবতে পারে না রাখাল। হঠাৎ উতলা হয়ে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে। বলে, বাড়ি যাবি সেঁজুতি?

—যাবো। আমায় এখান থেকে নে চলো বাবা, আমি বাঁচতি চাই।

—তাই হবে মা। আমি তোরে এ যাত্রায় নে যাবো এখান থেকে।

সেঁজুতি গভীর প্রত্যাশা নিয়ে ফিরে তাকায় বাবার মুখের দিকে। রাখাল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে, পোড়া কপালের লেখা কেউ খণ্ডাতে পারে না— ঘর-বর দেখে তোর বে দিইছিলাম, কিন্তু কপালে তা সহ্য হলো না। নয়তো আমারই বয়সী বেয়াই, সে মরবে কেন অকালে।

মানুষের মতো মানুষ ছিল পানু মোড়ল। সে বেঁচে থাকতে ছেলেরা রং-বাজি করা দূরে থাক, এতটুকু বেলেল্লাপনা করতে পারেনি। সাত বছর বিয়ে হয়েছে সেঁজুতির, পানু মোড়ল মারা গেছে তাও পাঁচ বছর হলো। আর রাখালের বেয়ান তো আগেই গেছে। রাম লক্ষণ তখন বালক। বয়স ছিল পানু মোড়লের, আর পয়সার অভাব তো কোনদিন টের পায়নি, তবু দ্বিতীয়বার বিয়ে করেনি সে। বলতো, মানুষ তো আর ছাগল গরু নয়—বৌ মরেছে বলে আবার বে করবো কেন?

পানু বেঁচে থাকতে এ-বাড়ির বড় বৌ-এর কত দাপট ছিল সংসারে। বড় বৌ যা বলবে, তাই হবে সংসারে। তার কথার বাইরে কিছু না। কিন্তু পানু উঠোনে শুতেই চাপাপড়া বিষ উগরে উঠলো। সেঁজুতি চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে পারেনি তার অবাধ্য স্বামীকে সামলাতে। ভাই ভাই প্রথম ঝগড়ার সূত্রপাত রেস্ত টাকা নিয়ে। রামের ধারণা, বাপের রেস্ত লক্ষ্মণের হেপাজতে, কিন্তু লক্ষ্মণ

জানালো, চলতি মরশুমের ধান বিক্রির পাঁচ হাজার টাকা ছাড়া আর কিছু নেই তার কাছে। কিন্তু সে কথা কে শোনে। এই নিয়ে ছোট ভাই-এর সঙ্গে রামের মন-কষাকষি শুরু হলো। ছোট ভাই লক্ষ্মণ বরাবরই শান্ত, চাইলো আপস রফা করতে। দাদা যাতে খুশি হয় তাই করুক; নিজে ভাগ করুক জমিজমা— নিজের ভাগ বুঝে নিক, বাকিটা লক্ষ্মণ নেবে। আর তাই নিয়েছিল লক্ষ্মণ। ছোট-বৌ ময়নামতী বরং একটু খুঁতখুঁত করেছিল। কিন্তু লক্ষ্মণ তার খুঁত-খুঁতুনিতে কান দেয়নি। সে যা পরিষ্কার বুঝেছিল, তাই করেছিল। আশ্চর্য যে, এই ঘটনার পরেও সে দাদা-বৌঠানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রেখে এসেছে। বৌঠানকে সে না জানিয়ে এখনো কোনো কাজ করে না। ধার-দেনায় দাদা জমি-জমা বিক্রি করছে, বৌঠানের সঙ্গে পরামর্শ করে লক্ষ্মণ সে-সব জমিগুলো কিনে রাখছে বেনামীতে বাজার ছাড়া চড়া দাম দিয়ে। কিন্তু বড় ভাইকে অসৎ সঙ্গে পড়ে সর্বস্বান্ত হতে দেখেও সে ভাই-এর মুখের ওপর একটা কথাও বলে না। বরং বৌঠান যদি তাকে কোনদিন ওসব সম্পর্কে কোনো কথা বলে, সেখানে লক্ষ্মণকে বলতে শোনা যায়, 'যে রসাতলে যাবে, সেখানে যাবার আগে তার বুদ্ধি খোলে না। আপনা থেকে যদি চেতনা হয়, হবে, নইলে কেউ কিছু করতে পারবে না।'

লক্ষ্মণের সুখ্যাতিতে সেঁজুতি পঞ্চমুখ। এ সংসারে সে এখনো বেঁচে থাকতে পেরেছে এই দেওরটির জন্যে। নইলে এতদিনে সে শেষ হয়ে যেত।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতে অনেক রাত হলো। লক্ষ্মণের বৌ ময়নামতী এই রাতেও তিন চার ভাগে রান্না করেছে। সেঁজুতি শোনেনি, এই অসুস্থ শরীরেও সমানে বসে থেকেছে ছোট-বৌয়ের ঘরে। বসে থেকে দেখেছে বাবা আর ধনপতি মাঝির খাওয়া। তারপর বাবা আর ধনপতি শয্যা গ্রহণ করতে নিজে ফিরে গেছে ঘরে।

রাত শেষ হতে বাকি ছিল না। তবু যেটুকু সময়, সেটুকু নিশ্চিন্তে ঘুমালো ধনপতি। রাখালের চোখে ঘুম নেই, সারারাত শুয়ে থেকে ভাবলো সেঁজুতির কথা। লক্ষ্মণ বলেছে, বৌঠানকে নিয়ে যাবার জন্যে। ময়নামতীরও সেই কথা। কিন্তু রাখালের চিন্তা, জামাই আপত্তি করবে কি না।

জেগে ছিল রাখাল, কিন্তু রাতে সাড়াশব্দ পায়নি জামাই-এর। হয়তো ফেরেনি। যদিও ফিরে থাকে—নিঃশব্দে।

রাত ভোরে ঘুম থেকে উঠে রাখাল সোজা চলে এলো মেয়ের কাছে। সেঁজুতি সবেমাত্র উঠেছে। বাইরে এসে দেখতে পায় বাবাকে।

রাতের বেলায় মেয়েকে দেখেছিল রাখাল, কিন্তু এমন করে চমকে ওঠেনি। সেঁজুতিও রাতে বাবার মুখোমুখি দাঁড়াতে এমন করে নুয়ে পড়েনি। রাখাল লক্ষ্য করে, মেয়ের শরীরে কিছুই নেই। হাড়ে-মাসে জড়ানো দেহটার মধ্যে প্রাণটা শুধু ধুকধুক করছে।

—জামাই ফিরেছে? রাখাল জিজ্ঞাসা করে।

—হ্যাঁ, ঘুমোচ্ছে। সেঁজুতি উত্তর দেয়।

—আমি এইচি সে জানে?

—জানে।

—কি বললে?

—কিছু বলেনি।

—অ।

হঠাৎ রাখাল মৃধা কেমন যেন কঠোর হয়ে ওঠে। কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে খানিকসময় কিছু চিন্তা করে। তারপর বলে, তুই তৈরী হয়ে নে, এই গণেই ডিঙি ছাড়বো।

—বাবা! সেঁজুতি অনুচ্চকণ্ঠে ডাকে। তারপর পিঠের কাপড় আলগা করে দেখায় রাতের অত্যাচারের চিহ্ন। স্বামীকে সে জানিয়েছিল বাপের বাড়ি যাবার কথা। নেশাখোর স্বামী সে কথায় কোনো কথা না বলে শংকর মাছের চাবুক দিয়ে সেঁজুতির পিঠে আঘাত করে। নীরবে সয়েছিল সে আঘাত। পাছে কান্নাকাটি করলে তার বাপের ঘুম ভেঙে যায়, তাই টুঁ শব্দ করেনি।

—কোথায় সে জানোয়ার, ডাক তাকে, রাখাল হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, ডাক তাকে, বল আমি ডাকছি। দেখি, জানোয়ারের গায়ে কত বল হয়েছে।

রাখালের চিৎকারে বাড়ির লোকজন, চাকর-মানদার সবাই জেগে ওঠে। ধনপতি উঠে খাল পারে গিয়েছিল সূর্যোদয় দেখতে, দূর থেকে চিৎকার শুনে সে-ও হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির মধ্যে আসে।

সেঁজুতি ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। তার বাবাকে তো জানে সে, এতো শান্ত মানুষ যে রাগে আগুন হতে পারে, এ তার জানা ছিল না। ছুটে এসে বাবার পা

জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে। রাখালের কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে তখনো ফুঁসিয়ে ফুঁসিয়ে উঠছে। লক্ষ্মণ এসে কতরকম বোঝায়, কিন্তু রাখালের রাগ পড়ে না। শেষটা ধনপতি এসে বলে, তুমি ঠাণ্ডা হও দিকিন। মাথা গরম-করতি নেই। মেয়েরে নে যাবা, নে চলো।

—তাই। রাখাল মেয়েকে পায়ের কাছ থেকে তুলে ধরে বলে, চল—ওই যে-কাপড়ে আছিস, সে-কাপড়ে চল। এখানে থাকলে সে বুনো শূয়োরটা তোরে শেষ করে ফ্যালবে।

আচমকা ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়া থেকে উঠোনে লাফিয়ে পড়ে রাম। এক ঝটকায় সেঁজুতিকে টেনে একপাশে সরিয়ে দেয়। তারপর দাঁতে দাঁত ঘষে বলে ওঠে, দেখি, কোন্ বাপ তোরে নে যায়।

ধনপতি এতসময় দাঁড়িয়েছিল শান্ত মানুষটির মতো। সেও মনে মনে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। অথচ তার উত্তেজনার কোনো প্রকাশ নেই। এগিয়ে যায় রাখালের জামাই-এর দিকে। বলিষ্ঠ হাতে চেপে ধরে তার একখানি হাত। ককিয়ে ওঠে রাম। সাক্ষাৎ রাবণের মতো তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ধনপতি মাঝি। ভয়ে ভয়ে বলে, তুমি কে?

—মাল-কাঠ-ঝাঁকা ধনপতির নাম শুনেছো? উত্তরটা ধনপতি শান্তভাবেই দেয়, আমার নাম ধনপতি। লোকে বলে ধনপতি মাঝি। নেও, বৌ ঠেঙিয়ে মদ খেয়ে খুব তো জারিজুরি দেখাও, এবারে বলো দিকিন কি বলবা। তোমার বৌ যাচ্ছে তার বাপের বাড়ি। যদি কোনদিন মানুষ হয়ে সেখানে যাতি পারো, যাবা—বৌ নে আসবা।

ঘটনাটা যে এমনভাবে ঘটবে, এটা কেউ-ই আশা করেনি। সেঁজুতি উঠে চলে গেল ঘরের মধ্যে। ছোট একটা প্যাটরা গুছিয়ে আনলো কাঁখে করে। পরনের কাপড়টাও বদলে এসেছে সে।

রাখাল ডাকে, ইদিকে আয় সেঁজুতি।

সেঁজুতি সামনে এসে দাঁড়ায়। সর্ব-সমক্ষে রাখাল মেয়ের পিঠের কাপড় সরিয়ে ব্লাউজ তুলে দেখায় গত রাতের চাবুক মারার চিহ্ন। এখনো পিঠের ওপর রক্ত-জমা দাগ।

লক্ষ্মণ আজই বোধহয় প্রথম ভাইয়ের মুখের ওপর কথা বললে। তীব্র শ্লেষ মিশিয়ে বললে, মোড়লবাড়ির ইজ্জত তুমি নষ্ট করলে দাদা—যাও, গলায় দড়ি দাও গে—ছি, ছি।

রামচন্দ্র নিষ্ফল আক্রোশে মনে মনে ফুঁসতে থাকে। তারই চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে তারই বিয়ে-করা বৌ সেঁজুতি। যে বৌকে ইংরেজী বাজনা বাজিয়ে বরণ করেছিল পান্নু মোড়ল।

সেঁজুতি দাঁড়িয়ে থেকে চোখের জলে ভাসছে। ছোট-বৌ ময়নামতী একটা ন্যাকড়ার পুঁটুলিতে কী যেন দিয়ে বলে যায়, না'য়ে বসে এগুলো খেয়ো দিদি।

হাত পেতে পুঁটুলিটা নিলে সেঁজুতি। কিন্তু ছোট-বৌ-এর কথা তার কানে গেল না। তার মনের মধ্যে তখন ভাসছে পুরনো দিনের ছবি। যেদিন সে এ-বাড়িতে প্রথম এসেছিল বড়-বৌ হয়ে।

সেদিন বাজনা বেজেছিল এ-বাড়ির বার মহল্লায়। ইংরেজী বাজনা। কলকাতা থেকে অনেক টাকা খরচ করে বাজনদারের দল আনিয়েছিল পান্নু মোড়ল। বৌ দেখতে নয়, শুধু বাজনা শুনতে এসেছিল বিশ তিরিশ গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষ। তারা বাজনা শুনেছিল, আবার সেঁজুতিকেও দেখেছিল। বলেছিল সবাই, হ্যাঁ, বৌ হয়েছে বটে। ষোল বছরের মেয়ে সেঁজুতি—সেও অবাক হয়ে গিয়েছিল মোড়লবাড়ির জৌলুস দেখে।

আজ সেই সেঁজুতি ফিরে যাচ্ছে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে। একদিন যে এসেছিল গরবিনীর মতো, আজ সে চলে যাচ্ছে অভাগিনীর মতো।

ঝিঙেতলার খালে এখন ভাঁটার টান শুরু হয়েছে।

॥ চার ॥

চারদিন পর।

ধনপতির ডিঙি ভিড়লো মোল্লাখালির ঘাটে। নটবর তারই অপেক্ষায় বসে ছিল ঘাটচালায়। কখন আসবে ধনপতি।

আজ দুদিন হলো ফুলটুসি চলে গেছে। মৃত্যুর দিন সকাল পর্যন্ত যন্ত্রণায় ছটফট করেছে ফুলটুসি, কিন্তু দুপুর থেকেই সে শান্ত হয়ে গিয়েছিল। বারবার বলেছিল ধনপতির কথা। মরবার আগে ধনপতিকে দেখতে চেয়েছিল। আর কারো নাম সে করেনি। নটবর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশ্বাস দিয়ে বলেছিল 'সে আসবে'। কিন্তু আসেনি সে।

ধনপতি যেদিন ফুলটুসিকে দেখে এলো, সেইদিন রাত থেকেই শুরু হলো

ভরা জোয়ারে টলমল করছে মোল্লাখালির গাঙ। উত্তরে বাতাসে ছোট ছোট ঢেউ জেগেছে। অপরাহ্ণের সূর্যের ঝিকমিক আলো এসে পড়েছে নদীর বুকে। সে আলোয় ঝলমল করছে নোনা গাঙের জল।

দূরে বাঁকের মুখে এক দঙ্গল বালিহাঁস নেমেছে জলে। ত্রিভুজের মতো রেখা টেনে তারা বসেছে গাঙের জলে। একদল পানকৌড়ি উড়ছে আকাশে। ওরা নামবে হয়তো রায়মঙ্গলে, না হয় কোনো জল-ঘেরিতে। না হয় চক্রাকারে উড়তে উড়তে যাবে দক্ষিণে সুন্দরবনে।

ধনপতির শূন্য দৃষ্টি উড়ন্ত পানকৌড়ির দিকে। দৃষ্টির সীমানা পেরিয়ে দক্ষিণের আকাশে হারিয়ে গেল পানকৌড়িরা—ধনপতির দৃষ্টি ফিরে এলো নদীর বাঁকের কাছে। যেখানে বালিহাঁসগুলো জলে নেমেছে।

দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছে। লঞ্চের শব্দ। হিঙ্গলগঞ্জ থেকে লঞ্চ আসছে, যাবে মোল্লাখালি হয়ে পারঘুমটি পর্যন্ত। লঞ্চের শব্দ শুনেই বোধহয় বালিহাঁসের দলটা সরে গেল বাঁকের মুখ থেকে। দূরে নদীর পাড় ঘেঁষে বসলো চক্রাকারে।

ধনপতির দৃষ্টি যেখানেই থাক না কেন, মন তার পড়ে রয়েছে ঠাকুরের আবাদে। রাখাল মৃধার ঘরে।

কাউখালি থেকে ঠাকুরের আবাদ। পুরো দু'জোয়ারের পথ। এই পথ একা দাঁড় টেনে গেছে ধনপতি। দুই জোয়ারের মাঝে ভাঁটা ছিল সারা দুপুর বিকেল। ঐ সময়টা সজনেখালির মুখে ডিঙি বেঁধে নাওয়া-খাওয়া সেরে ঘণ্টাদুয়েক বিশ্রাম করেছিল ধনপতি। তারপর জোয়ার আসতে আবার ডিঙি ছেড়েছিল। সন্ধ্যের আগে সজনেখালি থেকে ছেড়ে ঠাকুরের আবাদে পৌঁছতে হবে বলেই তো অবিরাম দাঁড় টেনেছিল ধনপতি।

সকাল থেকে রাত এগারোটা। সেঁজুতি বসে ছিল ছই-এর মুখে। তার করুণ মিনতি জড়ানো দুটি চোখে ছিল কী এক কুহকী মায়ার ইঙ্গিত, নয়তো ধনপতি সে চোখের দিকে তাকাতে সূর্যাস্ত দেখতে ভুলে যাবে কেন! না জানি কী দেখেছে সে অভাগিনী সেঁজুতির চোখের তারায়। সে কি তার দৃষ্টির কুহকী মায়া! না, ধনপতির বিভ্রান্ত দৃষ্টি!

সূর্য ডুবতে চমকে উঠেছিল ধনপতি। তবুও শেষ আশা নিয়ে দাঁড় টানতে টানতে ফিরে তাকিয়েছিল পশ্চিম দিগন্তের দিকে। শুধু অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পায়নি। সেই অন্ধকারের মধ্যে ও আলোর রেখা খুঁজতে চেষ্টা করেছিল।

সেই মুহূর্তে ধনপতির মনের মধ্যেকার গেরুয়াপরা বিবেক গান গেয়ে উঠেছিল। সেই বিবেকের গান শুনতে শুনতে সে দাঁড় টেনে পাড়ি জমিয়েছিল জোয়ারের বেগে। তার দৃষ্টি ফিরে ফিরে বেড়াচ্ছিল আকাশের নক্ষত্রের কাছে আলোর সন্ধানে।

সেঁজুতির ম্লান মুখের ছবিটা ধনপতির চোখের সামনে। সেদিন ঠাকুরের আবাদে পৌঁছে সেঁজুতির দুচোখেই যেন আলো দেখতে পেয়েছিল। অন্ধকারে জ্বলা জোনাকির আলোর মতো।

—অ ধনপতি।

নটবরের ডাকে যেন চমকে উঠলো ধনপতি। লঞ্চের শব্দটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ধনপতি উঠে দাঁড়ায়, ফিরে তাকায় পশ্চিম দিগন্তের দিকে। যেখানে সূর্য অস্ত যাচ্ছে সারাদিনের পথ-পরিক্রমার পর।

কি জানি কেন, আজ অস্তগামী সূর্যের রূপটা যেন বিবর্ণ মনে হলো ধনপতির। মনে হলো রঙটা যেন অন্যদিনের মতো গাঢ় নয়, ফিকে। সূর্য ডুবে যাবার পরেও অন্যদিন অনেক সময়ের জন্যে পশ্চিম দিগন্ত জুড়ে থাকে আলোর ছটা, আজ তাও যেন নিমেষে হারিয়ে গেল।

—ধনপতি, নটবর জিজ্ঞাসা করে, তোর কি হয়েছে রে?

—কি আবার হবে। কিছু না। ধনপতি নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে, আমারে একটু চুপ করে থাকতে দেও খুড়ো, আর নিজেও চুপচাপ থাকো।

—চুপ করে থাকবো কি? চুপ করলেই যে পরান হু হু করে ওঠে। দুদিন আগেও যে ছিল আজ সে নেই, আমি যে ভেবে কূল-কিনারা পাইনে ধনপতি। তার যে মরার বয়েস হয়নি। আমার থেকে কত ছোট ফুলটুসি।

আপন মনে বকতে আরম্ভ করে নটবর। তার সব কথাই ফুলটুসিকে নিয়ে। সে কথায় কান নেই ধনপতির। তার মন তখন অন্য দিকে। ভাবছে, এবারে সে অকূল দরিয়ায় পাড়ি দেবে। বাদাবন পেরিয়ে যাবে সমুদ্রের দিকে। ঝড়-তুফানে তার ডর নেই, আর যদি 'না' ডুবে যায়, যাবে। তাতেও ক্ষতি নেই। নীরবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে জগৎ থেকে। সেই ভালো—ঘাটে ঘাটে আর তো তাকে সওয়ারির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না।

এক চিন্তা থেকে আর এক চিন্তা। বারুণীবালার কথা মনে পড়ে। মনের মধ্যে কোন্ গোপন কোণে লুকিয়েছিল বারুণীবালা, সে বেরিয়ে এলো মনের গোপন দরজার আগল ভেঙে।

এখন কী করছে সে? হয়তো হেঁসেলে গেছে রান্না করতে। না হয় ছোট ছেলে-মেয়েদের ঘুম পাড়াতে গিয়ে নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছে। না হয় গঞ্জে গেছে কেষ্ট নস্কর, তারই জন্যে অপেক্ষা করছে বারুণী। কিংবা কেরোসিনের কুপী নিয়ে গোরুর জাবনা দিতে গেছে।

বারুণীবালার ঘরকন্নার কল্পিত ছবি ধনপতির মনে। ধনপতি তার ডিঙির মাথায় বসে সে কল্পিত ছবি দেখে।

এরই মধ্যে কখন যেন তার মনের মধ্যেকার আর একটা মন জেগে ওঠে। বারুণীবালার ছবিটা অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে যায় অন্ধকার বৃত্তের মধ্যে। একটা আলোর রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

লঞ্চ এসে পৌঁছেচে মোল্লাখালির গাঙে। ঘাটে ভিড়বার আগে লঞ্চের সার্চলাইট এসে পড়েছে ধনপতির চোখে-মুখে।

ধনপতি উঠে দাঁড়ায়। অবগাহন করে লঞ্চের সার্চলাইটের চোখ-ধাঁধানো আলোয়।

কিছু যাত্রী নামলো মোল্লাখালির ঘাটে। কিছু উঠলো। লঞ্চ এখান থেকে ঘুরে যাবে কলাগাছি গাঙ দিয়ে রায়মঙ্গলে। ওখান থেকে পুঁইজালি কুমিরমারি হয়ে পারঘুমটি পর্যন্ত।

যারা এই মোল্লাখালি হয়ে গোসাবার দিকে যাবে, তারা হয় রাত কাটাবে এখানকার কোনো দোকানে কিংবা কারো বাড়িতে, না হয় রাতে যদি কোনো ডিঙি কিংবা চলতি গয়না, কিস্তি পায় তাতেই চলে যাবে। কিন্তু রাতবিরেতে এসব গাঙপথে কেউ যেতে চায় না। শীতের দিনে ঝড়-তুফানের ভয় কম হলেও অন্য ভয় আছে। জল-পথে রাতে লুটতরাজ, রাহাজানি তো লেগেই আছে। রীতিমতো বুকের পাটা আর লোকজন সঙ্গে না থাকলে যাওয়া চলে না।

লঞ্চটা মিনিট পাঁচেকের জন্যে দাঁড়িয়ে থেকে আবার চলতে শুরু করলো মুখ ঘুরিয়ে। যে-পথ দিয়ে এসেছে ওই পথে খানিক গিয়ে বড় বাঁকের মুখের কাছ থেকে যাবে বড় গাঙের দিকে।

—সাতজেলেয় যাবার ডিঙিটিঙি আছে নাকি গো? নদীপার থেকে চিৎকার করছে লঞ্চে-আসা কোনো যাত্রী।

—না। এই রেতে গণে কেউ ডিঙি ছাড়বে না। ধনপতি নয়, উত্তর দেয় আর এক ডিঙি থেকে অন্য কোনো মাঝি।

—ভাড়া বেশি দেবানে। পাঁচ টাকা।

—দশ টাকা দেও তো যাই, হঠাৎ কী খেয়ালে ধনপতি বলে বসে, যাও তো এসো। ভাড়া নে আর কচলাকচলি কোরো না।

—দশ টাকা বড় বেশি হয় যে।

—দশ টাকার কমটম হবে না। যাবার তাড়া থাকে, আসতি পারো। ধনপতি জিজ্ঞাসা করে, আছো ক'জন ?

—পাঁচ জন।

—মাথাপিছু দু'টাকা করে, এ আর বেশি হলো কোথায়। যাক, যাবা তো এসো—ভাঁটা লেগে গেছে।

এক এক করে পাঁচজন ডিঙিতে এসে বসে। পায়ের কাদা ধুয়ে নেয় ডিঙির গলুইতে বসে। অপেক্ষা না করে ধনপতি গেরাবি তুলে লগি মেরে ডিঙির মুখ ঘুরিয়ে নেয়। নটবর যথারীতি হাল ধরে বসে। ভাঁটার টানে নৌকো খানিকটা এগিয়ে যায়। খানিক সময় চুপচাপ বসে থেকে মাঝদরিয়ায় পৌছে তবে দাঁড় টানতে আরম্ভ করে ধনপতি।

একসময় ধনপতি জিজ্ঞাসা করে, সাতজেলিয়ার কোন ঘাটে নামবা তোমরা ? ঘাট তো একটা নয়।

—সরদারের ঘাটে।

সাতজেলিয়ার সরদারের ঘাট। হাটখোলার ঘাট পেরিয়ে আরো খানিক যেতে হবে।

ধনপতি এবারে শক্ত হাতে দাঁড় টানতে আরম্ভ করে। একটু বেয়ে না গেলে এই গনে পৌছোনো দায়।

একে জলের টান, তারপর উত্তরে বাতাসেরও যেন 'দম' আছে। ধনপতির ডিঙি তীরের মত এগিয়ে চলেছে। দিনের বেলা হলে পাল তুলে দিত। এ রকম বাতাস পেলে ডিঙি চলতো ময়ূরপঙ্খীর মত।

দেখতে দেখতে মোল্লাখালির হাটখোলার আলোগুলো হারিয়ে গেল। গাঙটা এখান থেকে একটু পশ্চিম দিকে ঘুরেছে। জলের টানটাও বেশি মনে হয় এদিকটা। ওই বাঁকের জন্যেই হবে বোধহয়।

এসব গাঙ-পথের 'নাড়ী-নক্ষত্র' জানে ধনপতি। কোথায় ঘোল আছে, তাও চোখ বুজে বলে দিতে পারে। ডোবা চর কোথায় কোথায় আছে তাও ওর জানা। এত জানা-চেনা সত্ত্বেও রাতের বেলায় ডিঙি নিয়ে বেরোলেই ও সতর্ক মাঝির মত চারদিকে নজর রেখে চলে। এ-সব নোনা গাঙকে বিশ্বাস

নেই। কত মাঝিকে তো দেখেছে, এই সব গাঙের বুকে বিপাকে পড়তে। নিজেও দু'একবার বিপদের মুখোমুখি হয়েছে। সাহসী মাঝি ধনপতি, বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও ভয় পায়নি, বরং অনায়াসে সে বিপদকে অতিক্রম করেছে।

কোথায় সেই তের বছর বয়সের কিশোর, আর কোথায় ছত্রিশ বছরের যুবক। মাঝে প্রায় দুই যুগের ব্যবধান। এর মধ্যে যদি কিছু ইতিহাস থাকে, তবে সে হলো এই নোনা গাঙ দেশের একজন মাঝির ইতিহাস। কালবোশেখীর মেঘ আর ঝড়ের সংকেত পিছনে রেখে যে দুরন্ত রায়মঙ্গল পার হয়েছে, ঘূর্ণি ঝড়ের মধ্যে যে দামাল ঠাকুরানের পারে পৌঁছেচে মাঝদরিয়া থেকে। ডিঙিতে সওয়ারি থাকতে ধনপতি নিজের কথা ভাবে না। সে জানে, তার ডিঙির সওয়ারির জীবন তার হাতে। নিজের জীবন থাকতে সে সওয়ারির জীবন বিপন্ন হতে দেবে না।

একবার একটি ঘটনার কথা: মরিচঝাঁপির জঙ্গলের অফিসে কজন শিকারীকে নিয়ে যাবার চুক্তি করে ধনপতি। মোল্লাখালির হাটখোলা থেকে মরিচঝাঁপির জঙ্গলের অফিস। মাঝে দুটো বড় গাঙ পার হতে হয়। সময়টা ছিল চৈত্রের শেষ। এ-সব গাঙ তখন আর শান্ত নয়। তারপর বিকেলের দিকে আবহাওয়ার ঠিক থাকে না। ধনপতি শিকারীদের বলেছিল সেকথা। কিন্তু তারা নাছোড়বান্দা, সন্ধ্যের মধ্যে তারা নিশ্চিত পৌঁছতে চায় মরিচঝাঁপির জঙ্গলের অফিসে। সেই রকম কথা আছে। নয়তো রাত্রে তারা মোটর বোটে বেরোতে পারবে না কালিচকের দিকে।

শেষ পর্যন্ত ধনপতি রাজি হল। ধনপতির দোসর বলতে তখনো এই নটবর। দুপুরের পর ঠাকুরের নাম নিয়ে নৌকো ভাসালো ধনপতি। আকাশ তখন পরিষ্কার ছিল।

বড় গাঙের মুখ বরাবর পৌঁছে দেখতে পেল পশ্চিমে মেঘ করেছে। এ-সব মেঘের চরিত্র ধনপতির জানা। বাতাসও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে।

বড় গাঙের মুখের কাছ থেকে ফিরে নৌকো তীরে ভিড়ানোর কথা মনে করে ধনপতি। নটবরও সেই কথা বলে। কিন্তু সওয়ারিরা পারে যেতে নারাজ। ধনপতি তাদের কোনমতে বোঝাতে পারে না যে এখনি ঝড় উঠবে। শেষটা একজন বলে ওঠে, 'তুমি কেমন মাঝি, এই মেঘ দেখে ভয় পাচ্ছ!' সেকথা শুনে ধনপতির জিদ চেপে যায়। না, তীরে ভিড়বে না সে। হোক ঝড়, তবু পাড়ি দেবে বড় গাঙ রায়মঙ্গল।

আরো একবার গুরুর নাম স্মরণ করে ধনপতি। শক্ত দু'হাতে দাঁড় টেনে রায়মঙ্গলে গিয়ে পড়ে। একবার চারদিকে লক্ষ্য করে ধনপতি। ধারে-কাছে যে ক'টা ডিঙি সব ক'টাই মেঘ দেখে পারের দিকে চলেছে। শুধু দুটি বড় কিস্তি রায়মঙ্গল দিয়ে রাঙাবেলিয়ার দিকে যাচ্ছে।

একনাগাড়ে দাঁড় টেনে চলেছে ধনপতি। কালো মেঘ ইতিমধ্যে আরো ছড়িয়ে গেছে। মেঘের কোল ঘেঁষে ক'টা গাঙ-চিল উড়ছে চক্রাকারে। ধনপতি এক একবার ফিরে চায় মেঘের দিকে, আর পরক্ষণে দ্বিগুন শক্তিতে দাঁড় টানতে শুরু করে।

মরিচঝাঁপির জঙ্গলের অফিস দেখা যায় গাঙের এ-মুখ থেকে। দেখা গেলেও এ-পথটুকু পার হতে অন্ততঃ দুঘণ্টা সময় লাগে। গাঙের এক পারে আবাদ, অন্য পারে বাদা। তারপর গাঙের স্রোত এখানে উত্তর-দক্ষিণ। ঝড় উঠলে আর রক্ষে নেই। ধনপতি জানে, এ তল্লাটে ফি বছর পাঁচ-দশটা নৌকো মারা পড়ে ঝড়-তুফানে। কিন্তু সে ভাবনা এখন নয়, এখন চিন্তা নিরাপদে গন্তব্য স্থানে পৌঁছনোর।

—হুঁশিয়ার, খুড়ো, হুঁশিয়ার। ধনপতি অকস্মাৎ চিৎকার করে ওঠে, বদরের নাম নেও খুড়ো—ঝড় এলো বলে।

ঝড় আসছে। পশ্চিমের টুকরো মেঘ ছড়িয়ে পড়ছে আকাশ জুড়ে। সূর্য ঢাকা পড়েছে মেঘের আড়ালে। শোঁ শোঁ শব্দ উঠছে। গোঙানির মতো। গুমরে উঠছে যেন হাজার দৈত্য।

বদরের নাম নিয়ে শক্ত হাতে দাঁড় ধরেছে ধনপতি। নটবর উঠে দাঁড়ায় হালের মুঠি ধরে। সওয়ারিদের সতর্ক করে দিয়েছে ধনপতি। কেউ যেন এদিক-ওদিক না করে।

নিমেষের মধ্যে ঝড় এলো। তুফান উঠলো বড় গাঙে। মাতাল নদী রায়মঙ্গল অশান্ত হয়ে উঠলো মুহূর্তে। দু'পারে আছড়ে পড়লো বড় বড় ঢেউ। সে ঢেউ ভেঙে খানখান হয়ে গেল।

টলে উঠলো ধনপতির সেগুন কাঠের ডিঙি। ওলট-পালট খেয়ে গেল মুহূর্তে এক ঝটকায় বিশ হাত দূরে সরে গেল ডিঙি। জলের ঝাপটা এলো ডিঙিতে।

ঝড়ের প্রথম দাপট সহ্য করাই দায়। তবু আশ্চর্য, কুশলী মাঝি ধনপতি সেই ঝড়ের মধ্যে দাঁড় টেনে এগিয়ে চললো বড় বড় ঢেউ কেটে। তার চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন দূরে থাক, একটি রেখাও কুঞ্চিত হয়ে ওঠেনি। শান্ত সংযত

মাঝি ধনপতি, সে জানে এই ঝড় তুফানে দুর্বল হয়ে পড়ার মানে। সওয়ারিরা প্রমাদ গণল, না জানি তাদের ভাগ্যে কী আছে। সেই দুর্যোগের মধ্যেও ধনপতি শোনালো অভয় বাণী, ভয় নেই বাবুদের, হালে যখন আমি আছি ঠিকই পৌঁছে দেবানে।

সেই ঝড়ের মধ্যে ডিঙি বেয়ে চললো ধনপতি আর নটবর। ধনপতি শান্ত। কিন্তু নটবর থেকে থেকে ফুকরে উঠছে—'বল ভাই বদর বদর'।

সেদিন সন্ধ্যের পর মরিচঝাঁপির জঙ্গলের অফিসের ঘাটে ডিঙি বেঁধে ধনপতি এলিয়ে পড়েছিল গলুই-এর ওপর। বসে থাকতে পারেনি, একটা কথা বলা দূরে থাক।

শুধু এই একদিনের ঘটনা নয়, ধনপতি মাঝির জীবনে এমন অনেক ঘটনার নজীর আছে। আর সেই সব ঘটনার পাকে পাকে জড়ানো তার জীবন।

এই জীবনে কত ঘাটে ভিড়েছে ধনপতির ডিঙি। কত আঘাটার যাত্রী নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে ঘাটে। এই দুই যুগ ধরে কত নর-নারীর পা পড়েছে তার ডিঙিতে। গাঙের ঢেউকে যেমন আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় না, তেমনি কোন যাত্রীর কথা মনে রাখতে পারে না ধনপতি। যে যতক্ষণ সওয়ারি ততক্ষণ সে কাছের মানুষ। যেই সে নেমে গেল, পরক্ষণে তার কথা ভুলে যায় ধনপতি। কিন্তু ব্যতিক্রম যেন একা সেঁজুতি। আজ এই মুহূর্তে তার কথা মনে পড়ছে। ভুলতে চেষ্টা করেও ভুলতে পারছে না সে।

দাঁড় টানতে টানতে মাঝে মাঝে সেঁজুতির চিন্তায় উন্মনা হয়ে পড়ছে ধনপতি। শক্ত মুঠি শিথিল হয়ে আসছে বারবার। আর মনটা যেন কেমন শূন্য হয়ে পড়ছে।

রাতের অন্ধকার নেমেছে। অন্য রাতের চেয়ে আজ কুয়াশাও জমেছে ঘটা করে। এই ঘন কুয়াশার মধ্যে সাতজেলিয়ার সরদারের ঘাটের দিকে ডিঙি নিয়ে চলেছে ধনপতি। ডিঙি চলেছে সত্যি, কিন্তু ধনপতির মন যেন গতি হারিয়ে এক বিন্দুতে স্থির হয়ে পড়েছে।

সাতজেলিয়ার হাটখোলার কাছে ধনপতির মনে পড়ে বারুণীবালার কথা। ঘাটের দিকে ফিরে চায়। শূন্য ঘাট—অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। কয়েকটা ডিঙি একটা গাছের গুঁড়িতে কাছি দিয়ে বাঁধা।

সাতজেলিয়ার হাটখোলার ঘাট থেকে সরদার ঘাট। সরদার ঘাটে ডিঙি ছাধলো ধনপতি। নগদ দশটি টাকা গুনে দিয়ে নেমে গেল সওয়ারি পাঁচজন।

দ্বিতীয় ডিঙি নেই সরদার ঘাটে। ধনপতির ইচ্ছে এইখানে কোথাও ডিঙি বেঁধে রাতটা কাটিয়ে দেয়। কিন্তু নটবরের তাতে আপত্তি। বলে, হাটখোলার ঘাটে ফিরে যাবে। ফিরে যাওয়া বললেই যাওয়া নয়, উজান বেয়ে এতটা পথ যাওয়া সোজা কথা নয়। ভাঁটা লাগতে এখনো অনেক দেরি।

আর কোথাও যাওয়া হল না। সেই সরদার ঘাটেই ডিঙি গেরাবি করে রাখে ধনপতি। খাওয়া-দাওয়ার পর পাশাপাশি শুয়েছিল নটবর আর ধনপতি। গুন্‌গুন্ করে অনেক দিনের পুরনো একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে নটবর ঘুমিয়ে পড়ে। তারপরেও খানিক সময় জেগে রইলো ধনপতি। একবার তার মনে হল, এই রাতে ডিঙি নিয়ে যায়, সাতজেলিয়ার ঘাটে। যে ঘাটের নাম দিয়েছে সে, বারুণীবালার ঘাট। কিন্তু মুহূর্তের সে আগ্রহকে দূরে সরিয়ে রাখলো ধনপতি। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলো মনটাকে নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা নিয়ে।

এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে ধনপতি। ঘুমের মধ্যে সে এক বিচিত্র স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ে। স্বপ্নের মধ্যে সে দেখতে পায়, একা ধনপতি ডিঙি নিয়ে চলেছে দক্ষিণে বাদার মধ্যে। কখনো বড় গাঙ দিয়ে, কখনো খাড়ির মধ্যে চলেছে তার ডিঙি। দিনের পর দিন শেষ হয়ে যায়, কিন্তু ধনপতির ডিঙি আর কোথাও থামে না। সমুদ্রে যাবে বলে সে যেন ডিঙি ভাসিয়েছে। শেষে ঠাকুরানের মুখে পড়লো ধনপতির ডিঙি। দামাল গাঙ ঠাকুরান, সিধে সাগরে গিয়ে পড়েছে। ধনপতি যেন উন্মাদ হয়ে পড়েছে সাগরে যাবে বলে। ভাঁটার টানে সে রাখালী নদীর মুখ থেকে ডিঙি ছেড়ে ঠাকুরানের গাঙে এসে পড়েছে। এবারে দাঁড় টানা বন্ধ করেছে ধনপতি—ভাঁটার টানে যেমন খুশি ভেসে চলুক ডিঙি—ধনপতির শুধু একটি স্বপ্ন, সে সাগর দেখতে চায়, সাগরের ঢেউ ভেঙে ভেঙে এগিয়ে যেতে চায় অথৈ জলের দিকে। যেখানে দেখা যায় না কূল-কিনারা, যেখানে আকাশ আর জল ছাড়া আর কিছু নেই। ধনপতি হাল ছেড়ে বসে আছে একা—

শুধু স্বপ্ন নয়, ধনপতি কত দিন জাগ্রত-চেতনায় ভেবেছে সাগরে যাবার কথা। কতবার স্থির সংকল্প নিয়ে দিনক্ষণ দেখে যাবার আয়োজনও করেছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত যাওয়া হয়নি। কতবার গহন বাদায় গেছে মধু সংগ্রহকারীদের

নিয়ে। যেখান থেকে সাগর বেশি দূরে নয়, মনে করেছে যাবে, কিন্তু যেতে পারেনি। একবার ঠাকুরানের গাঙ থেকে সাগরের মুখ দেখেছিল—সেবারে ধনপতি যেন ক্ষেপে গিয়েছিল, কিন্তু আরো ডিঙির মাঝিরা ওকে নিরস্ত করে।

স্বপ্ন শেষ হতে ধনপতি তড়াক করে উঠে বসে। উঠে বসতে ছই-এর বাতায় মাথা ঠুকে যায়। ঘুমের ঘোরটা সম্পূর্ণ কেটে যায় মুহূর্তে। উঠে বাইরে আসে ধনপতি। ফিরে চায় পূবের আকাশের দিকে। যেখানে সূর্য উঠছে ঘন কুয়াশার আড়াল থেকে।

বেলা বাড়তে কুয়াশা অনেক হালকা হয়ে গেছে। সূর্যের আলো পরিষ্কার হয়ে ফুটেছে।

রাতে গরম খিচুড়ি খানিক ঢেকে রেখেছিল নটবর। দুটো সানকিতে তা ভাগ করে নটবর ডাক দেয় ধনপতিকে। ধনপতি বলে, আমার এখন খাতি ইচ্ছে নেই। তুমি খাও খুড়ো।

—খেয়ে নে। গন লাগতি বিলম্ব নেই। বলে নটবর খিচুড়ির সানকি নিয়ে জোর করেই ধনপতির হাতে তুলে দেয়।

এবারে আর আপত্তি করে না ধনপতি। ঠাণ্ডা খিচুড়ির দলাটা শেষ করে এক ঘটি জল খায়। তারপর বলে, চলো—বাদার দিকে ঘুরে আসি খুড়ো।

—ক্ষেপে গেলি নাকি। অকারণ বাদায় যাবি কেনে ?

—কারণে তো সবাই যায়।

—কিন্তু তোর খুড়ির কাজ না মিটিয়ে যাবো কেমনে ?

—অ, তা বটে।

—ছাখ ধনপতি, আমার তো ঘর-বার এক হয়ে গেল, তাই বলি, এবারে তুই একটা ঘর বাঁধ।

—ঘর তো আমার আছে।

—ও ঘরের কথা কচ্ছি না, এবারে বে-থা কর।

—সংসার আমার জন্যে নয় খুড়ো। ও কথা তুমি আমারে বোলো না।

—বেশ বলবো না। তুইও আমায় কোনো কথা কসনে।

হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে ধনপতি। বেশ কয়েকদিন পর এমন করে হাসতে পেরেছে সে। হাসতে হাসতে সে দাঁড়ে গিয়ে বসে। বলে, চালাও খুড়ো—মোল্লাখালি।

—সে কী রে, গন লাগুক।

—দুত্তোর, কখন গণ লাগবে, তার অপেক্ষায় বসে থাকবা—নেও। বলে ঠাকুরের নাম নিয়ে দাঁড় টানা আরম্ভ করে দেয় ধনপতি। ডিঙিটা এক জায়গায় ঘুরপাক খায়।

—তোর কি মাথা খারাপ হলো, গেরাবি তোলা হয়নি যে।

ধনপতি আরো একবার উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে। তারপর গেরাবি তুলতে আরম্ভ করে বলে, খুড়ো—তবুও আমি সংসার করবো না। সংসার করা মানে জীবনটারে গেরাবি ফেলে এক জায়গায় রাখা। আমি ও সব তালে নেই।

ঘটনাটা অপ্রত্যাশিত, কেউ-ই ভাবেনি, না ধনপতি, না বারুণীবালা। ভাববার কথাই নয়। এ-পথে যখনই গেছে ধনপতি, তখনই সাতজেলিয়ার হাটখোলার ঘাটে ডিঙি বেঁধে ধনপতি একবার মুহূর্তের জন্যে হলেও দেখা দিয়ে এসেছে বারুণীবালাকে। কিন্তু আজই বোধহয় প্রথম দিন, যেদিন ধনপতি মনে মনে ঠিক করেছিল হাটখোলার ঘাটে ডিঙি বাঁধবে না।

কিন্তু হাটখোলার ঘাট পেরিয়ে যাবার সময় ঘটল ঘটনাটা। একা কেষ্ট নস্কর নয়, বারুণীবালাও ঘাটে দাঁড়িয়েছিল কাচ্চাবাচ্চাদের নিয়ে। ধনপতি ঘাটের দিকে ফিরে তাকাতেই অবাক। কেষ্ট নস্করও ওকে দেখতে পায়, ডাকে- -আরে শালা আশ যে, কোথায় গিছিলে—বাঁধো, বাঁধো, ডিঙি বাঁধো।

ধনপতি তাড়াতাড়ি ডিঙির মুখ ঘুরিয়ে নিলে পারের দিকে। জিজ্ঞাসা করলে, সবাই মিলে ঘাটে কেন বোনাই ?

—আর বলো কেন ? কেষ্ট নস্কর বলে, তপার চরে যাতি হবে। বোনাই-এর ছেলের মুখে ভাত।

—তা চলে এসো আমার ডিঙিতে, ওই পথেই তো যাবো আমি। এসো—

পারে নেমে বারুণীবালার ছেলে-মেয়েদের ধনপতি নিজেই হাত ধরে ডিঙিতে তুলে নেয়। বড় ছেলেটা ধনপতির নেওটো। ডিঙিতে উঠেই বলে, মামা মেঠাই কই।

—মেঠাই! তাই তো রে মেঠাই কেনা হয়নি। বলেই একলাফে ডিঙি থেকে নেমে পড়ে। কেষ্ট নস্কর বলে, আরে করো কি। এসো দিকিনি।

কে কার কথা শোনে। ধনপতি হন হন করে উঠে যায় পাড়ের ওপরে। 'একটু রাখো—আমি যাবো আর আসবো'—বলে ছুটে যায় হাটের দিকে।

যেমন যাওয়া, তেমনি আসা। এসেই মেঠাই-এর ঠোঙা থেকে মুঠো ভরে

কুচো গজা আর জিলিপি তুলে দেয় বারুণীবালার ছেলে-মেয়েদের হাতে। বারুণীবালার হাতে ঠোঙার বাকি মেঠাই দিয়ে বলে, নেও, তুমি খাও, আর বোনাইকে দেও।

—শুধু বোনাই খাবে কেন? বারুণীবালা মুঠো ভরে জিলিপি আর কুচো-গজা ধনপতির হাতে গুঁজে দিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বলে, তুমিও খাও—মেঠাই খাতি তুমি তো খুব ভালোবাসো।

শুধু অনুচ্চকণ্ঠে কথাটা বললে না বারুণী, মুচকি হেসে কি যেন ইঙ্গিত করলো। সে ইঙ্গিতের ভাষাটা অস্পষ্ট। ধনপতি কি বুঝলো সেই জানে। কিন্তু সেই মুহূর্তে বারুণীর সঙ্গে চোখাচোখি হতে ওর সর্বাঙ্গ যেন শিউরে উঠলো।

মেঠাই হাতে নিয়ে ধনপতি এসে বসে দাঁড়ের কাছে। মেঠাইগুলো মুঠো ভরে মুখের মধ্যে পুরে ধনপতি দাঁড়ে হাত দিলে।

ইতিমধ্যে জোয়ারের টান শেষ হয়ে নদীতে ভাঁটা লেগেছে। টানটা এখনো তেমন জোরালো হয়নি। তবু এই টানেই ডিঙি ভাসালো ধনপতি।

ভাঁটার টানে ডিঙি ভেসে চলেছে। হাল ধরে বসে আছে নটবর। দাঁড় দুটো এখনো জলে নামায়নি ধনপতি। ডিঙি চলেছে চলুক।

ছই-এর বাইরে রোদে পিঠ দিয়ে বসেছে বারুণী। কোলের ছেলেটা কোলের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে। বারুণীবালা একটু কাত হয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে ফিরে চাইছে ধনপতির দিকে। কতকটা ইচ্ছে করেই ধনপতি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে।

ডিঙির এদিকে ছেলে কোলে বারুণীবালা, ওদিকে আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসে আছে কেষ্ট নস্কর।

মাঝদরিয়া বরাবর ডিঙি চলেছে। গাঙের এপারে আবাদ, ওপারে আবাদ। রাঙাবেলিয়া, সুখচরা, তিন নম্বর লাট, করের আবাদ—আরো কত নামের কত গ্রাম, আবাদ। এ-সব গাঙ দেশের নাড়ীনক্ষত্র ধনপতির জানা। বছরের পর বছর ধরে এই সব গ্রামের ঘাটে ঘাটে ধনপতি সওয়ারি নিয়ে ফিরেছে।

—অ ধনপতি, নটবর বলে, দাঁড় দুটো জলে নামা, একটু টেনে যাই চল।

জলে দাঁড় নামায় ধনপতি। বারুণীবালার মুখোমুখি হয়ে বসতে ধনপতি কেমন যেন জড়তা বোধ করে। তবু না বসে উপায় নেই। দাঁড় টানতে গেলে ওকে এখানে এমনি করে বসে থাকতে হবে।

—তোমার শরীরটা যেন শুকিয়ে গেছে। কথাটা ধনপতিকে উদ্দেশ্য করেই বলে বারুণী।

—এঁ্যা ! যেন চমকে ওঠে ধনপতি ।

কথাটা আরো একবার শোনালো বারুণী । শুধু কথাটা শোনার অপেক্ষা । তারপরেই হো হো করে হেসে উঠলো ধনপতি । ওর হাসির বহর দেখে কেষ্ট নস্কর বলে ওঠে, কী গো শালা আশ, হলো কি—অমন হাসি কেনে ?

—আর বলো কেন । বলে আরো একদফা হেসে নেয় ধনপতি । হাসতে হাসতে মুখ-চোখ লাল হয়ে যায় ।

ওর হাসির বহর দেখে বারুণী লজ্জা পেল । মুখটা নিচু করে বসে রইলো কোলের ঘুমন্ত ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে ।

—তুমি একটু জিরোও শালা আশ, কেষ্ট নস্কর বলে, আমি বরং খানিক দাঁড় টানি ।

—এসো । ধনপতি এক কথায় রাজী হয়ে যায় । বলে, এসো—দেখি বোনাই আমার কেমন দাঁড় টানতি পারে ।

ধনপতি সরে গেল । দাঁড় টানতে বসলো কেষ্ট নস্কর । কোন্ ছোট বেলায় শখ করে এক-আধবার রাজবংশীদের ডিঙি নিয়ে দাঁড় টেনে সাতজেলিয়ার গাঙের এপার-ওপার করেছে । তারপর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে শখ চলে গেছে । পারবে কেন ঠিক মতো দাঁড় টানতে । চেষ্টা করে যদিও-বা খানিক টানলো, কিন্তু হাঁপিয়ে পড়লো । ধনপতি একা নয়, স্বামীর রকম-সকম দেখে বারুণীও হাসছে ঘোমটা আড়াল দিয়ে । মাঝে মাঝে চোরা নজরে দেখছে স্বামীর দিকে ।

—না, হলো না দাঁড় টানা, শেষটা কেষ্ট নস্কর নিজে থেকেই ধনপতিকে ডাকে, নেও—দাঁড় ধরো । আমি পারলাম না ।

—ও আমি জানতাম । ধনপতি বলে, দাঁড় টানা মরদের কাজ । তোমার মত কেষ্ঠাকুরের কাম নয় । যাও—সরো ।

কথায় কথায় গাঙের পথ ফুরিয়ে যায় । রুপমারি খালের মুখে এলো ডিঙি । এখান থেকে তপার চর ঘণ্টা তিনেকের পথ । এ খাল-পথে এর আগেও কয়েকবার এসেছে ধনপতি ।

খালের ভিতর ডিঙি ঢুকতে দাঁড়টানা বন্ধ করলে ধনপতি । ভাঁটার টান বেড়েছে । স্রোতের টানে এগিয়ে চলুক ডিঙি । সময় না হয় একটু বেশি লাগবে, কিন্তু পরিশ্রমটা বাঁচবে ।

বারুণীর কোলের ঘুমন্ত ছেলেটা জেগে উঠে কাঁদতে আরম্ভ করলো । মাইপোশ ভরে ছাগলের দুধ এনেছে বারুণী, সেটা মুখে দেওয়াতে ছেলেটা চুপ

করে। খানিক বাদে আবার ঘুমিয়ে পড়লো ছেলেটা। কেষ্ট নস্কর বসেছিল বারুণীর কাছে। ঘুমন্ত ছেলেটাকে তার কোলে দিয়ে বারুণী পা ছড়িয়ে বসলো। একভাবে সেই থেকে বসে আছে সে। পা-তুটো যেন সিঁটিয়ে উঠেছে।

ধনপতি খাল-পারের দিকে চোখ রেখেছে। খালের এপারে-ওপারে ভেড়ি। ভেড়ির ধারে ধারে গেঁয়ো কেওড়া আর নোনাঝাউ-এর গাছ। কোথাও হড়কচা আর শিয়ালকাঁটার ঝোপ। মাঝে মাঝে কিছু আগাছার বাদাড়।

ধনপতি চেয়ে আছে খাল-পারের দিকে। কিন্তু মনের মধ্যে তার আর এক ছবি। সে ছবিটা তার জীবনের কৈশোর থেকে প্রথম যৌবনের। যে সময়ে তার জীবনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল বারুণীবালা।

পুরনো কথা ভাবতে ধনপতি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ওর জীবনটা উজান বেয়ে পেছিয়ে পড়েছে তু'যুগ আগেকার দিনগুলিতে।

—কথা কওনা কেন? কেষ্ট নস্কর অন্যমনস্ক ধনপতিকে ডেকে শুধোয়, শালা আশের হলো কি?

—কিছু না। ধনপতি উত্তর দেয়।

কেষ্ট নস্কর না বুঝুক, বারুণী বোঝে ধনপতির কি হয়েছে আজ। নিজের মন দিয়ে সে বুঝতে পারছে। তার মনেও তো উথালি-পাথালি ঢেউ।

সাতজেলিয়ার কেষ্ট নস্করের ঘরণী বারুণী। চলতি কথায় 'গেরস্থ ঘরের বৌ'। কিন্তু মনের সঙ্গে বোঝাপড়ার হিসেব না মিলিয়ে শুধু গোঁজামিল দিয়েই সংসারের দিনগুলো কাটিয়ে যাচ্ছে সে। সহজ-সরল মানুষ কেষ্ট নস্কর, এই মানুষটিকেও বারুণীবালা কোনদিন ফাঁকি দিতে চায়নি। ফাঁকিটা তার নিজের কাছে। যেটুকু গোঁজামিল তাও ওর নিজের মনের ব্যাপারে। এর জন্যে যেটুকু তুঃখ, সেটুকু তার একান্ত নিজস্ব। ধনপতির সঙ্গে তার জীবনের সম্পর্কটা সে মিথ্যে মনে করতে পারেনি। তার সেই অনেক দিনের পুরোনো মনটা এখনও মরে যায়নি। আর হয়তো মরবেও না। কিন্তু একটা আক্ষেপ তার জীবনের অন্তিমেও রয়ে যাবে। ধনপতিও যদি তার মতো সংসার করতো, তাহলে হয়তো কিছুটা সুখী হতো বারুণী। কিন্তু সে সুখ ওর কপালে নেই। বাউণ্ডুলে হয়েই রইলো ধনপতি। হয়তো তারই জন্যে। সবচেয়ে তুঃখ যেন এইখানেই। যত যন্ত্রণা তার এই জন্যেই।

দাঁড় টানা বন্ধ করে ধনপতি বসে আছে ডিঙির মাথায়। শীতের সকালের রোদ পড়েছে তার মুখে চোখে—সারাদেহে। জলে জলে রোদ মাথায় নিয়ে

দাঁড় টেনে টেনে ধনপতির বলিষ্ঠ দেহটা যেন পাথরের মত হয়ে গেছে। হাতের, বুকের, কাঁধের পেশীগুলো ইস্পাতের গোলার মত। ওর শরীরের কোথাও এতটুকু বাড়তি মেদ নেই। পাথরে খোদাই করা মূর্তির মতো দীর্ঘ সুঠাম চেহারা।

নোনা হাওয়া আর রোদে পুড়ে ধনপতির গায়ের রং-টা তামাটে হয়ে আছে। মাথার চুলগুলো আগে কালো কুচকুচে ছিল, এখন কেমন যেন লালচে মনে হয়। ভ্রূ জোড়া তেমনি আছে। ভ্রূর নিচের চোখ দুটোও তেমনি ভরা-গাঙের মত। বাউণ্ডুলে মানুষের চোখ বোধহয় এমনি হয়।

বারুণীবালা বার বার ফিরে চাইছে ধনপতির দিকে। যত দেখছে, ততই দেখার আগ্রহটা বাড়ছে। কত দিন এমন করে এত সময় ধরে ওকে দেখতে পায়নি সে।

চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে বারুণীবালার বুক থেকে। হালকা বুকটা আরো হালকা হয়ে যাচ্ছে। ধনপতির ওই পাথরে কোঁদা দেহটার মধ্যে যে শান্ত মনটা রয়েছে, সে মনটা চোখে দেখা যায় না—কিন্তু বারুণী এইটুকু বোঝে, সে মনটা তার জন্যে কড়ির ঝাঁপিতে তুলে রেখেছে ধনপতি।

—ধনপতি, ধনপতিরে—

নটবরের ডাকে ধনপতির চিন্তাটা হোঁচট খায়। বারুণীবালাও একটু নড়ে চড়ে বসে। কিন্তু ধনপতির কানে যায় না সে ডাক। নটবর আরো একবার ধনপতিকে ডাকে, ধনপতি, অ ধনপতি।

—কী ?

—তুই একটু হালে এসে বোসরে। আমার হাতের শিরাগুলোয় টান ধরতিছে। আয়রে—আমি একটু জিরেন দেই।

নটবরের কথায় ধনপতি কেমন যেন লজ্জা পায়। এই বুড়ো মানুষটাকে হালে বসিয়ে রেখে নিজে নিশ্চিন্তে বসেছিল সে! কাজটা করেছে আহাম্মুকের মতো। তাড়াতাড়ি উঠে যায় ধনপতি। হাল ধরে। তারপর বলে, তুমি একটু শুয়ে থাকো খুড়ো।

নটবর ডিঙির পাটাতনের ওপর চটের দলা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ে। ডান হাতটা টানটান করে ছড়িয়ে দেয়। ডান হাতের কব্জির ওপরের শিরাগুলো কেমন যেন দলা পাকিয়ে গেছে।

রূপমারির খাল দিয়ে ভেসে চলেছে ধনপতির ডিঙি। একের পর এক গ্রাম পেছনে পড়ে থাকছে। মথুরাপুর, রায়ের আবাদ, বিশপুর, বায়লানি পার

হয়ে এসেছে। তপারচর আর দূরে নয়। ভাঁটার টান না ফুরোতেই পৌঁছে যাবে।

শীতের বেলা। চড়চড়ে রোদ উঠলেও রোদের তেমন জোর নেই। তারপর চলতি ডিঙি থেকে রোদের আঁচটা ঠিক মালুম হয় না। ধনপতির গা সওয়া হয়ে গেছে রোদ-জল। এ-সবে তার কিছু হয় না। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা—তার দিন তো কেটে যায় জলে-জলে ভেসে বেড়িয়ে। মাথার ওপর হয় সূর্য জ্বলে, না হয় মেঘ-ভাঙা বর্ষা চলে যায় মাথার ওপর দিয়ে।

সামান্য পথ। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে এলো। তপারচরের ঘাটে ডিঙি বাঁধলো ধনপতি। গেরাবি করলো না। ডিঙির মাথা ডাঙায় লাগিয়ে লগি মেরে দাঁড়ালো।

প্রথমে ছেলেমেয়েগুলোকে কোলে করে ডাঙায় নামায় কেষ্ট নস্কর। তারপর বারুণীবালা নামলো কোলের ছেলেটাকে স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে। নামতে গিয়ে বারুণীবালা একবার চোখ ফেরালো ধনপতির মুখের দিকে।

ধনপতিও সেই মুহূর্তে বারুণীকে দেখছিল। হঠাৎ চোখাচোখি হতে সে মুখ ফেরালো। আর ঠিক সেই সময় কেষ্ট নস্কর বলে ওঠে, কি গো শালা আশ. ডিঙি গেরাবি করো। লগি মেরে দাঁড়িয়ে থাকলে কেন? নামবা না!

—না বোনাই। তোমার কুটুমবাড়ি—তুমি যাও, আমি আবার কেনে।

—না, তা হয় না। আমার কুটুম্ব তো তোমারো পর নয়—এসো।

—না।

ধনপতি লগি তুলে রাখলো। জোয়ারের টানে ডিঙিটা অল্প একটু ঘুরে গেল। কেষ্ট নস্কর সেই জল কাদার মধ্যে এক রকম লাফিয়ে নিচে নেমে, ডিঙির মুখটা টেনে ধরলো। ধনপতি যেন এই মুহূর্তে তার সংকল্পে অটল হয়ে উঠেছে। কেষ্টকে বললে, ছেলেমান্‌সি কোরো না বোনাই—আমারে তুমি নামাতে পারবা না।

ধনপতির কথার সুরটা ঠিক ভালো লাগলো না কেষ্ট নস্করের। ধনপতিকে এত করে বলা সত্ত্বেও সে তার কথা রাখলো না! হঠাৎ তারও বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটলো। বলে বসে, ভাড়া নে যাও।

—কিসের ভাড়া? ধনপতি বলে, তেমন তো চুক্তি ছিল না।

—না, ভাড়া না নে যাতি পারবা না। দাঁড়াও—

বারুণীবালা এতসময় বুঝতে পারেনি, ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে।

যখন বুঝলো, তখন আর কিছু করার নেই। পকেট থেকে দশটা টাকা বার করে ডিঙির ওপর ছুঁড়ে দিল কেষ্ট নস্কর। সে টাকা কটা ধনপতি তুলে নিয়ে কেষ্ট নস্করের গায়ের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে কটমটিয়ে তাকালো।

কেষ্ট নস্কর ডিঙি ছেড়ে দিয়ে তেমনি জল কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে খানিক সময়। ধনপতিও কোনো দিকে ফিরে না চেয়ে ভাঁটার বিপরীতে উজান বেয়ে চলে, খাল পেরিয়ে গাঙের বুকে ভাসবে বলে।

বারুণীবালার চোখে জল টলমল করে ওঠে। ডিঙিতে বসে সে ভেবেছিল, আজকের দিনটির কথা। এ-দিনটি যেন কত শুভ—না চাইতে সে ধনপতির দেখা পেয়েছে, তারই ডিঙিতে চেপে তার মুখ দেখতে দেখতে সে এত পথ এসেছে—আর এখন মনে হয় আজকের এ দিনটি না এলেই ভাল হতো। এমন করে তা হলে কাঁদতে হতো না।

ধনপতির ডিঙি ততক্ষণে বেশ কিছু পথ চলে এসেছে। নটবর হাতের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তখনো শুয়েছিল। এতক্ষণে সে বলে, কাজটা কি ভালো করলি ধনপতি? বারুণীবালার মনে দাগা দিলি কেনে?

এত সময় গুম হয়ে বসেছিল ধনপতি। হঠাৎ সে চিৎকার করে বলে ওঠে, পাপ—আমার মনে পাপ ঢুকেছে খুড়ো।

তারপর নিজের খেয়ালে আকাশ-ফাটা হাসি হেসে ওঠে। সে হাসির আওয়াজটা উত্তরে বাতাসে ভেসে হয়তো-বা বারুণীবালার কানেও পৌছয়।

—ধনপতি, অ ধনপতি, কী হলো তোর! অমন বেমক্কা হাসছিস কেনে? নটবর শুধোয়।

—বললাম তো খুড়ো, আমার মনে পাপ ঢুকেছে। পাপ—মহাপাপ।

—তুই কি পাগল হলি নাকি? কী যে কস—বুঝিনে।

—জানো খুড়ো, আমার চোখে পাপ, মনে পাপ—আমি ফুরিয়ে গ্যালাম খুড়ো। বলে আরো একদফা তেমান করে বেপরোয়া ভাঙ্গতে হেসে ওঠে ধনপতি।

নটবর চুপ করে যায়। এরপর আর কথা বাড়াতে ইচ্ছে হয় না তার।

ধনপতির ডিঙি চলেছে রূপমারির খাল দিয়ে। ভাঁটার টানে নয়, উজানে।

॥ পাঁচ ॥

শীতের দিন ফুরিয়ে গেল দেখতে দেখতে। ফাল্গুনের যে কটা দিন বাকি ছিল, সে কটা দিনও কেটে গেল। দিনগুলো যেন কিছুই না—এই আছে, এই নেই। দিন মিলিয়ে মাস, মাস মিলিয়ে বছর—তাও কিছু নয়। বছরগুলো কত সহজে হারিয়ে যায়।

বছরের হিসেব মিলিয়ে দেখেছে বারুণীবালা, হিসেব করলে আঠারো বছর। কিন্তু আঠারো বছরের হিসেবটা কি এমন বেশি। চোখ বুজলে মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। বছরগুলো চলে গেছে এই যা, আসলে বছরের সঙ্গে আর যা কিছু তা তো চলে যায়নি। সবই তো জমা হয়ে রয়েছে মনের পরতে পরতে। সে জমার ঘরে খরচের অঙ্ক লেখা হয়নি। যেমন ছিল তেমনি আছে।

বারুণীবালা তার আঠারো বছর আগের জীবনের ছবিটা দেখছে। আঠারো বছর কেন, তার আরো কয়েক বছর আগের দিনগুলোকেও মনে করছে। যে জীবনের ছবি দেখছে, সেই জীবনটা হারিয়ে গিয়েছিল আঠারো বছর আগে।

আজ সকাল থেকে কি যেন হয়েছে বারুণীর। কাজেও মন নেই, আবার স্থির হয়ে বসতেও পারছে না। পুরোনো দিনের চিন্তাটাকে কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছে না।

ভোর চারটের লঞ্চে কেষ্ট নস্কর হাটখোলার দোকানদার চরণদাসের সঙ্গে হাসনাবাদ গেছে। ওখান থেকে যাবে বসিরহাটে। চরণদাসের মামলার সাক্ষ্য দিয়ে ফিরবে পরশু দিন। হয়তো আরো একদিন দেরি হতে পারে।

স্বামী চলে যেতে বারুণী আর বিছানায় ফিরে আসেনি। গোরু-বাছুরগুলো বার করেছে গোয়াল থেকে, গোবর ছড়া দিয়ে উঠোন ঝাঁট দিয়েছে, তারপর খিড়কির দিকে গেছে মাটির পাঁচিলের গায়ে ঘুঁটে দিতে।

ঘুঁটে দিতে গিয়েই মনে পড়ে ধনপতির কথা। তখনো দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে ফোটেনি। সেই তখন থেকে এখনো, থেকে থেকে ধনপতির চিন্তা ওর মনের আনাচে কানাচে ঘুরছে।

কত দিনের পুরনো কাঁটা—সে কাঁটায় এত যন্ত্রণা, তা যেন এতদিন বারুণীর অনুভবের বাইরে ছিল। কিছুতেই ও মন থেকে ধনপতির চিন্তা মুছে ফেলতে

পারছে না। তপারচরের ঘটনাটা কেন ঘটলো? সাধারণ কথার মধ্যে স্বামীর সঙ্গে ধনপতির কেন যে মন-কষাকষি হলো, তার বিচার বারুণী আজও করতে পারেনি। অনেক ভেবেছে সে, কিন্তু সব ভাবনাই মিথ্যে হয়ে গেছে। ঘটনাটা যদি কিছু না হবে, তা হলে ধনপতি সেই থেকে আর আসে না কেন? যে মানুষ মাসের মধ্যে দু-তিনবার আসতো, সে মানুষ আজ দু'মাস হলো আসে না। এতো গেল ধনপতির কথা, তার স্বামীও তো একবার তার শালা আশ ধনপতির নাম করে না। বরং কথাপ্রসঙ্গে বারুণী যদি কোনদিন ধনপতির কথা তোলে, কেষ্ট বিরক্ত হয়। আজকাল বারুণী তার স্বামীর কাছে ধনপতির কথা বলে না।

চোর-কাঁটার মত ধনপতি বিঁধে আছে বারুণীর মনের মধ্যে। সে কাঁটায় এত ব্যথা, এত জ্বালা, তা যেন আগে ওর অনুভবে আসেনি। এ যন্ত্রণা যেন সর্বশরীর শীতল করে দেয়।

এক-আধ দিন নয়, আঠারো বছর হলো বারুণী এক জীবন থেকে আর এক জীবনে এসেছে। কই, এই আঠারো বছরের মধ্যে তো আজকের মতো একটা দিনও আসেনি। ধনপতির কথা সে ভেবেছে, যে ভাবনার সঙ্গে ওর মনের কান্না মিশে গেছে, কিন্তু আজ আর কান্না নয়, একটা দারুণ ব্যথা থেকে থেকে ওর বুকটাকে মুষড়ে দিয়ে যাচ্ছে।

বারুণীর বুকটা যেন একটা ব্যথার দরিয়া। ঝড় উঠেছে সে দরিয়ায়—তবু সেই ব্যথার দরিয়ায় ভাসছে ধনপতি মাঝির ডিঙি।

কচি ছেলেটা দাওয়ায় কাঠ-বেড়ার মধ্যে সেই কখন থেকে কাঁদছে, তবু সেদিকে হুঁশ নেই বারুণীর। আর ছেলেমেয়েগুলোকে অন্য দিন সামলে রাখে, আজ তাদের দিকেও নজর দিতে ভুলে গেছে। আজ যেন সব-কিছুর খেই হারিয়ে ফেলেছে সে। কোন কিছুতেই মন নেই—কেমন যেন শিথিলতা ওকে পেয়ে বসেছে। এই আঠারো বছরের সংসার জীবনে এর আগে এমন একটা দিনও তো আসেনি।

সকাল থেকে দুপুর। দুপুর গড়িয়ে বিকেল।

বদন মিস্ত্রির বৌ আসে বিকেল বেলা গাঁতার দুধ নিতে। দু'দণ্ড সময় হাতে করেই সে আসে। গল্পগাছা করে, উঠোনে ছায়া জড়ানো কোণে খেজুর পাতার চাটাই বিছিয়ে বসে বারুণীর চুল বেঁধে দেয়। সিঁথিতে সিঁদুর রেখা তো রোজই টেনে দেয়, কোনদিন বা সযত্নে আলতা রেখা টেনে দেয় বারুণীর পায়ে। এর

মধ্যে কত গল্প করে যায় বদন মিস্ত্রীর বৌ। গল্পের মাঝে মাঝে থাকে বারুণীর প্রশস্তি। আত্ম-প্রশস্তি শুনতে মন চায় না বারুণীর। তবুও শোনে।

শুধু সাতজেলিয়ায় কেন, এ তল্লাটে বারুণীর মতো মেয়ে কোনো ঘরের বৌ হয়ে আসেনি। বৌ নয় তো, বদন মিস্ত্রীর বৌ-এর ভাষায় 'লক্ষ্মী পিরতিমে'।

লক্ষ্মী প্রতিমাই বটে বারুণীবালা। ও যখন পরিপাটি করে সেজেগুজে দাঁড়ায়, তখন কে বলবে ও প্রতিমা নয়। লক্ষ্মীর পটের সঙ্গে কতদিন বদনের বৌ তার দেখা-সাক্ষাৎ তুলনা করে দেখেছে। না, মিথ্যে নয় তার কথা।

এ-সব কথা শুনতে পান্‌সে লাগে বারুণীর। তবু শুনতে হয় প্রতিদিন। বলে আনন্দ পায় বদনের বৌ—বলুক। তবে শুনতে শুনতে অধৈর্য হয়ে পড়লে বারুণী বলে, চলো—গাঙ ধারে বেড়িয়ে আসি।

এই গাঙ ধারে বেড়ানো নিয়ে আগে কত কথা শুনতে হতো বারুণীর। শুনেও শুনতো না সে। তবে স্বামী এ-নিয়ে কোনো কথা বলেনি। তাই বলে কি যখন তখন গাঙ-ধারে গেছে বারুণী—তা নয়। মাঝে মাঝে গেছে। দু'দণ্ড বসারও অবসর পায়নি, খানিক বসে-দাঁড়িয়ে চলে এসেছে বাড়ি।

বদনের বৌ-এর লোকভয় নেই। নামে সে বদনের বৌ, আসলে তার বিবাহিত জীবনটা ছিল দু'দিন, দু'রাতের। ফুলশয্যার রাতেই বদনের বৌ হাতের নোয়া খুলেছিল। বদন সেই রাত্রেই মারা যায় সাপের কামড়ে। বদন মারা গেল, কিন্তু বেহুলা সতী হতে পারলো না তার বৌ। বরং হয়ে রইলো 'অনামুখো বৌ'। সকাল সন্ধ্যেয় কেউ মুখ দেখতে চায় না বদনের বৌ-এর। বলে, সে নাকি 'অপয়া'। বদনের বৌ কিন্তু হাসি মুখেই হজম করেছে এ-সব কথা। এখনও করে। কিন্তু কি জানি কেন, এই 'অপয়া' বদনের বৌ-কে ভালোবেসে ফেলেছিল বারুণী।

বিয়ের বছরই হবে, বারুণী একদিন দাঁড়িয়েছিল খিড়কির পুকুরের পাড়ে। হঠাৎ তার নজরে পড়ে, পুকুরের পারে একজন বিধবা-বৌ ছাগল ধরার জন্যে ছুটোছুটি করছে। দুরন্ত ছাগল ছুটে ছুটে এপারে চলে এলো। কি খেয়ালে বারুণী ধরে ফেলে ছাগলটাকে। বিধবা এ-পারে এলো। হাতের দড়ি দিয়ে ছাগলটাকে বাঁধলো। তারপর বারুণীর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি বুঝি এ-বাড়ির নতুন বৌ?

বারুণী সলজ্জ হেসে মাথা নাড়লো।

বিধবা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো বারুণীকে। তারপর আলতোভাবে

দুটো আঙুল দিয়ে বারুণীর চিবুক স্পর্শ করলো। চুপি স্বরে বললে, এমন না হলে বৌ—যেন লক্ষ্মী পিরতিমে।

—তুমিও তো সোন্দর। বললে বারুণী।

—না না, আমি অপয়া, আমার মুখ দেখলি লোকের অমঙ্গল হয়, তুমি যাও। বিধবা আঁচলে মুখ ঢাকলো।

—মিছে কথা। তুমি রোজ আসবা, আমি তোমার মুখ ভাখবো।

তারপর থেকে বারুণীর কাছে আসা-যাওয়া আরম্ভ হলো বদনের বৌ-এর।

কিন্তু আজ সে এখনো আসে না কেন?

বিকেল থেকে বারুণী প্রতীক্ষা করছে বদনের বৌ-এর। সন্ধ্যে হয়ে এলো, কিন্তু এখনো সে এলো না।

বড় ছেলেকে খোঁজ নিতে পাঠালো বারুণী। বদনের বৌকে বারুণীর ছেলেরা মাসি বলে ডাকে। ফিরে এসে জানায়, মাসি বাড়ি নেই। ঘরে তালা দেওয়া।

—কেউ নেই বাড়ি? বারুণী জিজ্ঞাসা করে।

—না। ছেলেটা ছুটে চলে গেল।

সন্ধ্যে হয়ে গেল, তবু বদনের বৌ এলো না। সারাদিন গেছে নানান চিন্তায়, সন্ধ্যে হতে বারুণী নিজেকে সহজ করার চেষ্টা করে। সন্ধ্যের প্রদীপ জেলে, ঘর-দরজায় জল ছিটে দিলে। তারপর গেল গোয়াল ঘরে গোরুর জাবনা মেখে দিতে। গোরুর কাজ সারা হলে, এলো রান্নাঘরে।

রাঁধতে বসেও নিশ্চিন্ত হতে পারে না বারুণী। মনের মধ্যে যে জলুনিটা আজ ওকে সকাল থেকে অস্থির করেছে, সে অস্থিরতা এখনো। নিজের মধ্যে যে ফাঁকিটা ছিল আজ যেন তার সামগ্রিক যোগফল ওকে উত্যক্ত করতে চায়। আজ ও নিজের কাছেই ধরা পড়ে গেছে।

কিন্তু ওর এই যে চিন্তা, তা কি ধনপতির জন্যে, না নিজের জন্যে? হিসেব করে দেখেছে আজ আর কোনো চিন্তা তার শোভা পায় না। আঠারো বছর আগে যে জীবনটা হারিয়ে গেছে, আঠারো বছর পরে মাথা খুঁড়ে মরলেও সে জীবন ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তবে কেন মিছে ভাবনা।

মনের মধ্যেকার চিন্তার বোঝাটাকে ঝেড়ে-ঝুড়ে হালকা হতে চায় বারুণী। ছেলে-মেয়েরা বড় ঘরে ছিল, তাদেরকে ডেকে রান্না ঘরে নিয়ে আসে। রান্না

রুগ্না আর তার মাঝে ছেলে-মেয়েদের ভূতের গল্প শোনানো—দুয়ের মধ্যেও মনটা থেকে থেকে পুরনো চিন্তা ছুঁয়ে আসছে।

রান্না-বাড়া চুকতে হাঁড়ি-হেঁসেল গুছিয়ে শোবার ঘরে এলো বারুণী। ছেলে-মেয়েদের ঘুম পাড়ালো। তারপর নিজেও একটা পাতলা কাঁথা গায়ের ওপর দিয়ে শুয়ে পড়লো।

ঘরের মধ্যে একটা টিকটিকি ডাকতে ডাকতে থেমে গেল। বাড়ির পেছনের শিরীষ গাছটার ফোকরে একটা বুড়ো তক্ষক থাকে, সেটাও ডেকে উঠলো তারস্বরে।

পূব দিকের জানালাটা সাধারণত বন্ধই থাকে। কখনো কখনো খুলে দেয়। পূবের জানালাটার ওপর দিয়ে দেখলে, সেখান থেকে নদী দেখা যায়। নদীতে জোয়ার থাকলে জল দেখা যায় স্পষ্ট। কেষ্ট নস্করের বাড়ি পুকুরের পাড়ে টাঁ্যকা জমিতে, তাইতো গাঙ-পাড়ের ভেড়ি বাঁধের আড়াল থেকেও জোয়ারের নদী ঘরের জানালা দিয়েও দেখা যায়।

বাড়ির পূব দিকে খানিকটা ফাঁকা জমি। জমির একদিক থেকে হাটখোলায় যাবার রাস্তা। রাস্তাটার পরেই ভেড়ি বাঁধ। তারপরই নদী।

শুয়ে থেকেও ঘুম এলো না বারুণীর। মনের মধ্যে অস্বস্তি জড়িয়ে। খানিক সময় বসে রইলো। তারপর কি মনে করে পূবদিকের জানালাটা খুলে দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়।

ক্ষীণায়ু চাঁদ বাইরের আকাশে। সে চাঁদের আলোয় বাইরের রূপটা স্পষ্ট-চোখে পড়ে না। যদিও চৈত্র মাস, তবু এখনো ধোঁয়াটে কুয়াশা নামে।

গাঙে কি এখন জোয়ার এসেছে! অনেক সময় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে চোখ টেনে টেনে দেখলো বারুণী, কিন্তু গাঙের জল নজরে পড়লো না। হয়তো ভাঁটার টানে জল নেমে গেছে নিচে।

গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বারুণী ফিরে এলো জানালার কাছ থেকে। জানালাটা তেমনি খোলাই রইলো। খোলা জানালার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বারুণী ঘুমিয়ে পড়ে এক সময়।

যে খবরের জন্যে বারুণী মনে মনে উতলা হয়ে উঠেছিল, ওর স্বামী দু'দিন বাদে বাড়ি ফিরেই সে খবর শোনালো। সন্ন্যাসী হয়েছে ধনপতি এক মাসের 'ফিরের'। গাজনের সময় যাবে বাবা তারকনাথের ঠাঁই। মোল্লাখালির

পঞ্চঘাটায় ধনপতির সঙ্গে দেখা হয় কেষ্ট নস্করের। ধনপতিই ডেকে কথা বলে। বলে, বোনাই—সন্ন্যেস করলাম। বাবার ওখানে যাবার ইচ্ছে আছে।

কেষ্ট নস্কর বলে, বেশ, বেশ—বাবার ঠাঁই যাবার আগে পারো তো একবার আমার ওখানে যেও। কেমন? তোমার হাতে বাবার পূজো দে দেবানে।

ধনপতি বলেছে, এ-মাসের বিশ তারিখ নাগাদ আসবে। ধনপতি আসবে শুনে মনে মনে খুশীই হয় বারুণী। সেই পিঠে একটা চিন্তাও করে রাখে, বাবা তারকনাথের পূজোর জন্যে কিছু গুছিয়ে রাখবে সে। ধনপতি আসবে, এ খবরটায় মনটা যেমন খুশীতে ভরে ওঠে, তেমন সে 'সন্ন্যেস করেছে' এ খবরটায় মনের মধ্যে কেমন যেন একটু ধোঁকা লাগে। ধনপতির স্বভাব তার অজানা নয়। এই এক মাসের ব্যাপারটা না তার সারাজীবনের মতো করে তোলে। এ বয়স পর্যন্ত সে সংসার-ধর্ম করলো না, শেষটা না গেরুয়া পরে চির-জীবনের মতো সন্ন্যাসী হয়ে যায়।

ধনপতির জন্যে বাবা তারকনাথের চরণে প্রণাম রাখে বারুণী। 'বাবা—দেখো ওই বাউণ্ডুলে মানুষটা যেন বেবাগী না হয়ে যায়।'

এ মাসের বিশ তারিখে আসবে ধনপতি। বারুণী দিন গুনতে থাকে। কথা দিয়েছে যখন, সে ঠিকই আসবে। এবারে সে এলে, নিশ্চয়ই তাকে একটা দিন আটকে রাখতে পারবে বাড়িতে। কখনো সে থাকেনি। সে নিজেও কতবার বলেছে, তার স্বামীও বলেছে, কিন্তু কখনো একটা দিন দূরে থাক, একটা বেলার জন্যেও ধরে রাখতে পারেনি ধনপতিকে। আসে, কিন্তু দুদণ্ড স্থির হয়ে বসে না। এবারে হয়তো তার সে দুঃখটা ঘুচবে।

কিন্তু সন্ন্যাসীর বেশে আসবে ধনপতি। পরনে থাকবে গেরুয়া কাপড়, উত্তরীয়—না জানি, কেমন দেখতে হবে তাকে। সে কি অন্য সন্ন্যাসীদের মত বাড়ির পাঁচিল পেরিয়ে বলবে, 'বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে, বাবা ভাণ্ড়ড় ভোলার চরণে··· !'

ঠিকই ভেবেছিল বারুণী।

ধনপতি যে এই সাত-সকালে এসে পৌছবে বারুণীবালা তা ভাবতে পারেনি।

ভোরে যেমন ওঠে, তেমনই উঠেছে বারুণী। গোয়াল পরিষ্কার করে, গোরুগুলো বাইরের উঠানে বেঁধে রেখে বারুণী খিড়কির পুকুর থেকে এঁটো-বাসন মেজে সবে ঘরে ফিরেছে, এমন সময় চমকে ওঠে ধনপতির কণ্ঠস্বর শুনে। মাটির

পাঁচিল পেরিয়ে ধনপতি সুর করে বলছে, 'বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে —বাবা ভাঙড় ভোলার চরণে সেবা লাগে—মহাদেব।'

—তুমি!

বারুণীবালা চকিত বিস্ময়ে ফিরে চায় ধনপতির মুখের দিকে। মুহূর্তের আনন্দে মনটা ভরে ওঠে। তারপরই মনের মধ্যেকার বাসি-ব্যথাটা মোচড় দিয়ে উঠতে, তার মুহূর্তের আনন্দ ধুনোর আগুনের মত নিবে যায়।

ধনপতির দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বারুণী। ধনপতির পরনে গেরুয়া থান, গলায় উত্তরীয়, হাতে বেতের ছড়ি, কাঁধে ঝোলানো ঝুলি। এলোমেলো রুক্ষ তার মাথার চুল, সারা মুখ ভরে গেছে গোঁফ দাড়িতে। বারুণীবালার দু'চোখ জলে ভরে ওঠে ধনপতিকে দেখতে দেখতে।

—কী ভাখো অমন করে? ধনপতির মুখে মৃদু হাসি। বলে, বাবার ঠাঁই যাবো, কিছু ভিক্ষে দেও।

বারুণী অচঞ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। স্থির মূর্তির মতো।

—কই, দেও।

—ভিক্ষে চাচ্ছো!

—হাঁ। যা দেবা, দেও।

—বোসো স্থির হয়ে।

—না। এখনো কত ঘরে যাবো—

বারুণীবালার চোখের জল গড়িয়ে পড়ে গণ্ড বেয়ে। পাছে ওর এই চোখের জলে ধনপতির ব্রত ভেঙে যায়, তাই তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে আঁচলে চোখ মুছে ছুটে যায় ঘরের মধ্যে। ঘর থেকে একটা পিঁড়ি বার করে দাওয়ায় পেতে দিয়ে বলে, বোসো—চট করে একটা ডুব দে আসি।

যেমন যাওয়া তেমন আসা। কোনমতে দুটো ডুব দিয়ে ভিজে কাপড়ে হনহন করে উঠে এসেছে বারুণী। ভিজে চুল মোছাও হয়নি।

ধনপতির সামনে দিয়ে সে চলে যায় ঘরের মধ্যে। ভিজে কাপড় ছেড়ে, ভিজে চুল গামছা দিয়ে ঝেড়ে বাইরে আসে। বলে, একটু বসবা না?

—না।

—সে কি? তোমার বোনাই ও-পাড়ায় গেছে, সে আসুক, তারপর যেও নে।

ধনপতির মুখোমুখি নয়, পিছনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে বারুণী। সে আসবে বলে, বারুণী কত দিন ধরে কত রকম জিনিস গুছিয়ে রেখেছে। ডাব, বেল,

কলা কিনে রেখেছে সাতজেলের হাট থেকে। ঠাকুরবাড়ি থেকে সেদ্ধ চাল বদলিয়ে আলো চাল এনেছে। নতুন 'বেদাগ-বেরং' মালসা কিনে রেখেছে হবিষ্যি রান্নার জন্যে। জল খাবার জন্যে পিতলের ঘটি আনিয়েছে মোল্লাখালির হাট থেকে। তারপর মনে মনে আরো কত কি ভেবেছিল বারুণী।

বারুণীর কথা শোনার পরেও ধনপতির ভাবান্তর হয় না। সে শুধু একবার ফিরে চায় বারুণীর মুখের দিকে। তারপর বলে, কি দেবা—দেও।

—রোসো, আনছি।

নতুন ধামায় করে চাল, কাঁচকলা, বেল, ডাব—যা যা সংগ্রহ করা ছিল, তা সব কিছুই এনে দেয় ধনপতিকে। সিধের বহর দেখে ধনপতি বলে ওঠে, এত কি হবে?

—নে যাও, আরো সন্নিসি তো আছে, দে দিওনে।

বারুণীবালার কণ্ঠস্বরে আর এতটুকু উত্তাপ নেই। যা-যা দিয়েছে বারুণী, ঝোলা ভরে সবই নিয়ে নিলে ধনপতি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সুর করে বলে ওঠে, 'বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে—মহাদেব, বাবা ভাঙড় ভোলার চরণে—'

একবার ফিরেও চায় না সে বারুণীর মুখের দিকে। লম্বা লম্বা পা ফেলে দুপ-দাপ করে এগিয়ে যায় ধনপতি। কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে বারুণী, ধনপতির চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে। দেখতে দেখতে ধনপতি চলে যায়। তখনো শুনতে পায় ধনপতির কণ্ঠস্বর। এক নাগাড়ে বাবা তারকনাথের নাম নিতে নিতে চলেছে সে।

তেমনি অচঞ্চল দাঁড়িয়ে বারুণী। তার দু'চোখে জল টলমল করছে। বুকের মধ্যে একটা তীব্র হাহাকার আর বেদনা। কিন্তু একটা জিজ্ঞাসা তার মনে, ধনপতি কি সত্যিই সন্ন্যাসী হয়ে যাবে?

—দাঁড়িয়ে কি করো?

কেষ্ট নস্কর বাড়ি এসেছে হাতে একটা মস্ত বড় শোল মাছ ঝুলিয়ে। পুকুর ছেঁচে ধরা জ্যান্ত শোল; কানকোর সঙ্গে কলার ছটা দিয়ে বাঁধা, এখনো ছটফট করছে। মাছটা উঠোনে ধড়াস করে ফেলেই কেষ্ট জিজ্ঞাসা করে, ওখানে দাঁড়িয়ে কি করো? পিঁড়ি পাতা কেন, কেডা এইছিল?

—তোমার শালা আশ এইছিল, চলে গেল এই মাত্তর। এলো আর গেল, দু'দণ্ড থির হয়ে বসলো না।

ধনপতির খবর শুনে কেষ্ট নস্কর কিছুমাত্র ভালো-মন্দ কথা না তুলে, ফিরে চায় বৌ-এর মুখের দিকে। থমথম করছে বৌ-এর মুখ, জল ঝরছে তার দু'চোখে।

—কাঁদো কেনে?

উত্তর দিতে পারে না বারুণী। স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়াতে না পেরে আড়ালে সরে যায়। চোখের জল মুছে ফেলে আঁচল দিয়ে।

কেষ্ট ডাকে, শোনো, ইদিকে এসো।

বারুণী আড়ালে থেকেই বলে, বলো কি বলবা?

কেষ্ট বলে, থাক, পরে বলবো। এখন মাছটা কুটে ফ্যালো দিকিন। আর শোনো, একটা মানুসের ভাত বেশি রান্না কোরো। মদন কলুর এ বেলা এখানে খাবার কথা আছে। বলেছে আসবে—তবে ঠিক কিছু নেই।

বারুণীর বড় দুটি ছেলে-মেয়ে সকালে উঠে পড়তে যায় নারান মাস্টারের বাড়ি। সেজ মেয়েটা অন্যদিন যায় না, তার এখনো পড়ার বয়েস হয়নি, তবু আজ কি খেয়ালে গিয়েছিল বড় ভাই-বোনের সঙ্গে।

বেলা নটার আগে মাস্টারের বাড়ি থেকে আসে না ওরা। যাওয়ার কিছুক্ষণ বাদেই আজ চলে এলো হৈ-হৈ করতে করতে। নারান মাস্টার কুটুম বাড়ি গেছে, তাই পড়াশুনো হয়নি আজ।

বাড়ির উঠোনে পা দিয়েই ছেলে-মেয়ে তিনটে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মাছের ওপরে। শোলটা উঠোনে খানিকটা জায়গা জুড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। বড় ছেলেটা মাছটা ধরতে গেল, কিন্তু ধরে রাখতে পারে না। যতবার ধরে ততবার হাত থেকে পিছলে যায়।

কেষ্ট নস্কর ধমকে ওঠে, মাছ ঘাঁটছিস কেন, যা মাটি দে হাত ধুয়ে ফেলগে। যত সব আকালকেঁড়ে খেলা। যা—

বাবার কাছে কোনো ছেলে-মেয়ে ধমক খায় না। যা কিছু বকাঝকা সবই মা করে। বাপের কাছে ধমক খেয়ে ছেলেটা হকচকিয়ে যায়। মাছটাকে ফেলে রেখে নিঃশব্দে সরে যায় সেখান থেকে।

কেষ্ট নস্করের এখন অনেক কাজ পড়ে আছে। নাড়া-পালগুলো বাইরে ছড়ানো রয়েছে, গাদা দিতে লোক আসবে আজ। লোকজনের সঙ্গে থাকতে হয়, নইলে ঠিক মতো কাজ করে না।

—দেও, পাত্তা থাকে তো দেও, কেষ্ট নস্কর বলে, তোমার ধনপতি ভাই-এর জন্যে আমার ভাবলে চলবে না। ভারি আমার ভাই।

কথার পিঠে এভাবে ধনপতির কথা উঠতে থতমত খেয়ে গেল বারুণী। আজ পর্যন্ত ধনপতিকে নিয়ে তার স্বামী কোনদিন এভাবে কোনো কথা শোনায় নি। বরং ধনপতিকে নিয়ে বরাবর অন্য সুরে কথা বলেছে। আজ হঠাৎ কি হলো ওর স্বামীর? কিন্তু এই জিজ্ঞাসা ওর মনে জাগলেও, অনুযোগের সুরে কিছু বলা সম্ভব নয়। সত্যিই তো, ধনপতিকে নিয়ে যেটুকু গোপন কথা, সে তো স্বামীর কাছে প্রকাশ করতে পারবে না ও। তবে কি ওর স্বামী সব জানে?

এক থালা পান্তা ভাত, আর খানিকটা কলমি শাক চিংড়ি মাছের মজা তরকারি, সেই সঙ্গে এক বাটি গুড়—এই দিয়ে স্বামীকে খেতে ডাকলো বারুণী।

খেতে বসে কোনো কথা বললো না কেষ্ট। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে ঢক ঢক করে খানিক জল খেয়ে কাজে বেরিয়ে গেল।

বারুণী কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে বসে রইলো। কোলের ছেলেটা হেঁদলায় ঘুমিয়েছিল, কেঁদে উঠলো ককিয়ে।

ঠিক সময়ে কেঁদে উঠেছে ছেলেটা, নয়তো মন থেকে সহজে ধনপতির চিন্তাটা দূরে সরাতে পারতো না বারুণী।

সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সংসারের চাকার সঙ্গে ঘুরপাক খেল বারুণী। সন্ধ্যের পর পুকুর থেকে কাপড়-চোপড় কেচে রান্না ঘরে এলো। কোলের ছেলেটা বসতে শিখেছে, একটা খেলনা দিয়ে তাকে ঘরের কোণে বসিয়ে রাখলো।

রাতের রান্না এমন কিছু নয়। শুধু ভাত ফুটিয়ে নেওয়া। ও-বেলার মাছের ঝোল ঢালা আছে। ওই এক তরকারি আর ভাত। রাতে বেশি কিছুর দরকার হয় না। তারপর গোরুটার দুধও আছে কিছুটা।

ভাত রান্না হতে আর কতটুকু সময়। এরপর আর কাজ কি। ছেলে-মেয়েদের খাইয়েদাইয়ে ঘুম পাড়ানো। কেষ্ট নস্কর গেছে যাত্রার আখড়ায়। ফিরতে অনেক রাত হবে। এই মাস ভোর এমনি রাত করে আসবে। হালখাতার দিনে হাটখোলায় যাত্রার আসর বসবে। কেষ্ট নস্কর নাকি রাজার মন্ত্রী সাজবে। বাড়ি ফিরেও স্থির হয়ে ঘুমোয় না কেষ্ট। এসে শুয়ে পড়ে বিছানায়; নিজের মনে মুখস্ত করা কথা বলতে থাকে। বলতে বলতে তারপর ঘুমিয়ে পড়ে।

দু' একদিন রাতে বারুণী বলেছে, তোমার কথাগুলো আমার মুখস্ত হয়ে গেল। সবই যদি শুনে ফ্যাললাম, আসরে গে কি শোনবো।

কেষ্ট নস্কর হেসে বলেছে, আসরে গে শুধু দেখবা কি রকম মানায় আমারে।

শুনে বারুণী না হেসে পারেনি। হাসতে হাসতে বলেছে, হবা তো রাজার মন্ত্রী। রাজা হলে না হয় কথা ছিল। যেখানে রাজা সেখানে মন্ত্রীরে কেউ ভাখে নাকি?

রাজা আর মন্ত্রী।

কেষ্ট নস্কর মন্ত্রী হলেও বারুণীর স্বামী। মুখে যাই বলুক, সে তাকেই দেখবে। আর কাউকে নয়।

রান্নাঘরের কোণে ছেলে কোলে নিয়ে বসে বারুণীবালা। ধনপতি নয়, সন্ধ্যের পর থেকে সে স্বামীর কথাই ভাবছে। জোর করে সে মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছে, স্বামী ছাড়া আর কারো কথা ভাববে না সে। স্বামী আর নিজের ছেলে-মেয়ে নিয়েই তো তার জীবন—সেখানে আর একজনকে দাঁড় করানো মিছে।

যতই বোঝাপড়া করুক মনের সঙ্গে, তবু থেকে থেকে বারুণীর মনের মধ্যে আর একটা মানুষ এসে দাঁড়াতে চাইছে—সে ধনপতি।

॥ ছয় ॥

জোয়ারের জলে মোল্লাখালির গাঙ টলমল করছে।

ঘাটের কাছে নয়, আঘাটায় কেওড়া গাছের সঙ্গে কাছি দিয়ে বাঁধা ধনপতির ডিঙি। গলুই-র ওপর দু'-হাঁটুর মাঝে চিবুক দিয়ে বসে ধনপতি।

মাঝরাতে ভাঁটা লাগতে ধনপতি একা ডিঙি নিয়ে গিয়েছিল সাতজেলিয়ায়। বারুণীবালার কাছ থেকে সিধে নিয়ে সেই মুখেই আবার ফিরে এসেছে জোয়ারের টানে। একা হাতে হাল ধরে শরীরটা কেমন যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। দুপুরে গাঙের জলে ডুব দিয়ে ফলার চুকিয়েছে ডিঙিতে বসেই। দুপুরের পর নটবর এসেছিল, সন্ধ্যের আগ পর্যন্ত বসে থেকে চলে গেছে।

সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। একটা ভাঁটার অবসর ফুরিয়ে গেছে। কখন জোয়ার লেগেছে, মোল্লাখালির গাঙ ভরে গেছে কানায় কানায় সেদিকে হুঁশ নেই ধনপতির। রাতের ফলার করতে হবে সেজন্যেও যেন মনের মধ্যে কোনো তাগিদ নেই। যদিও আজ দুপুরে হবিষ্যিও করেনি। সময় হয়ে ওঠেনি বলেই।

বারুণীর দেওয়া ফলগুলো এখনো রয়েছে আজ আর কাল, দুদিনের ফলার ওতে হয়ে যাবে।

চুপচাপ বসে ধনপতি। মনের মধ্যে কোনো ভাবনা তার নেই। কেমন যেন একটা শূন্যতা ওর মনের ভিতরে। বাইরের কোনো কিছুতেও মন নেই। আশপাশে আরো কত ডিঙি ঘাট থেকে দূরে গেরাবি করে রেখেছে। একটু পরেই ভাঁটা লাগলে ছেড়ে যাবে কেউ কেউ। আবার রাত-বিরেতে এ-পথে ডিঙি নিয়ে যেতে ভয় যাদের, তারা আজ রাতটা কাটিয়ে দেবে মোল্লাখালিতে। কাল দিনের ভাঁটায় তারা নিচের দিকে যাবে। বস্তি ডিঙির মাঝিরা কথা বলছে, গল্প করছে, তার মধ্যে ধনপতি তার ডিঙির গলুইতে একা বসে।

প্রথম প্রহরের শিয়ালের ডাক শুনতে পেল ধনপতি। হাঁটুর ওপর থেকে চিবুক তুলে মাথা উঁচু করলে। এবারে স্নান সেরে ফলারটা সেরে নিতে হবে। এরপর রাত বারোটা বেজে গেলে আর খাওয়া-দাওয়া চলবে না।

দিনের বেলাতেই এ-সব গাঙে তেমন গরজে ভিন্ন কেউ জলে নামে না। হাঙর, কামটের এত উৎপাত। ধনপতিও সব সময় গাঙের জলে নামতে চায় না অকারণে। স্নান করার দরকার হলে জল তুলে মাথায় দেয়, কিন্তু 'সন্ন্যেস' করার পর থেকে ও দুপুরে-রাতে গাঙে ডুব দিয়ে স্নান করে। কতজনে মানা করেছে, কিন্তু ধনপতি সে মানা শোনে নি। বাবা তারকনাথের নামে নোনা গাঙে ডুব দিতে ভয় কি।

'বাবা তারকনাথের চরণে—ও বাবা ভাঙড় ভোলার চরণে এ…এ…' বলে ডিঙির গলুই থেকে আচমকা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধনপতি। আশেপাশের ডিঙির মাঝিরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। অন্ধকারে ঠিক মতো হদিশ করতে পারে না ধনপতিকে।

পর পর তিন চারটে ডুব দিয়ে ডিঙির মাথা ধরে জল থেকে উঠে আসে ধনপতি। আরো বার কয়েক বাবা তারকনাথের নাম নিয়ে ভিজে কাপড় ছেড়ে রাখে। তারপর গলুই-এর ওপর বসে ডাব-কলা-বেল আখের গুড় দিয়ে ফলার সারে।

সারাদিন কেটেছে এক রকম। কিন্তু রাতে কম্বলের শয্যায় শুয়ে বাবা তারকনাথের নাম জপ করতে করতে কখন যেন বারুণীর নামটা মনে এলো।

বারুণীর নামটা মনে আসতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ধনপতি। 'বাবার নামে' থেকে একি চিন্তা তার! না না, কোনমতে সে এ-চিন্তাকে প্রশ্রয়

দেবে না মনের মধ্যে। হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে ধনপতি, 'ও বাবা শ্মশানচারীর চরণে—সেবা লাগে মহাদেব, ও বাবা ত্রিশূলধারীর চরণে……'

আশপাশে ডিঙির মাঝিদের ঘুম ভেঙে যায় ধনপতির উচ্চ কণ্ঠস্বরে। থামে না ধনপতি, এক নাগাড়ে সে কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলে বাবা তারকনাথের নাম নিয়ে চলেছে।

—কে গো—দুপুর রাতে চেল্লাও, দুপোর রাতে বাবা চাগিয়ে উঠলো কেন? পাশে গেরাবি করা কাঠের কিস্তি থেকে কে একজন খিঁচিয়ে ওঠে।

লোকটির কথার পিঠে আর একজন টিপ্পনি জুড়ে দেয়, ও বাবার চেলারে গাঁজায় পেয়েছে—বোঝো না। বাবার নামে থাকা নয়তো, জ্যান্ত বাবার পিণ্ডি চটকানো।

ধনপতির কানে যায় এদের কথাবার্তা। সত্যি, ওরা অন্যায় কিছু বলেনি। এই রাতে অমন করে চিৎকার করে বাবার নাম নেওয়াটা ঠিক হয়নি। সারাদিনের পরিশ্রমের পর আর-আর মাঝিরা ঘুমিয়ে পড়েছে, এই রাতে ওদের ঘুম ভাঙানোটাও পাপ। ধনপতি আর উচ্চবাচ্য না করে নীরবে শুয়ে পড়ে ছই-এর বাইরে।

ঘুম আসে না ধনপতির। রাতের আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। নক্ষত্রগুলোকে গুনতে চেষ্টা করে, কিন্তু খানিকটা গোনার পরেই চোখ কেমন ধাঁধিয়ে যায়। মাথাটাও ঝিমঝিম করতে থাকে। ভাঁজ করা হাতের ওপর মাথা রেখে এতক্ষণ চিৎ হয়ে শুয়েছিল, এবারে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে ধনপতি। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে একসময়।

পরদিন।

ঘুম থেকে উঠে সূর্যোদয় দেখা হয়নি ধনপতির। যখন ওর ঘুম ভাঙলো তখন রূপালী রোদে ভরে গেছে গাঙের এপার ওপার। আশপাশে একটা ডিঙিও নেই। ভাঁটার টানে সবাই চলে গেছে নিচের দিকে। শুধু কাঠ বোঝাই কিস্তিটি তখনো গেরাবি ফেলে অপেক্ষা করছে জোয়ারের জন্যে। এ কাঠ বোঝাই কিস্তি যাবে ন্যাজাট বয়ারমারির দিকে।

—অ ধনপতি, ধনপতি। পাড়ে দাঁড়িয়ে ডাক দিল নটবর।

—আরে, এসো খুড়ো।

ধনপতি লগি মেরে ডিঙির মুখটা পারের কাছ ধরে। নটবর উঠে আসে

ডিঙিতে। এসেই ধনপতির থমথমে মুখের দিকে চায়। ধনপতির চোখ দুটো লাল, মুখটা ভারি ভারি। জিজ্ঞাসা করে, কি—রাত ভোর ঘুমোসনি নাকি? না কি বাইরে শুয়েছিলি?

—বাইরে শুয়েছিলাম।

—তা তো শুবি। শরীরটার বেহাল না করে তুই ছাড়বি নে ধনপতি। নটবর মৃদু তিরস্কারের সুরে বলে, তোর ওপর বড় ঠাকুরের দৃষ্টি আছে। সহজ পথে চলতি তুই পারবি নে।

নটবরের কথাগুলো তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে ধনপতি। একনাগাড়ে অনেক কথা বলে যায় নটবর। শুনে ধনপতি মুখ টিপে হাসে। তারপর নটবরের কথা শেষ হতে ধনপতির হাসিটা ফেটে পড়ে। হো-হো করে হাসতে হাসতে চোখ মুখ লাল হয়ে যায়।

নটবর ধমক দেয়, ছিঃ, চুপ কর।

ধনপতি বলে, কাণ্ডজ্ঞান আমার হবে না খুড়ো। তুমি যতই জ্ঞান দেও।

—তুই একটা মুষল।

—তা বলতি পারো। মাল-কাঠ-ঝাঁকা ধনপতি যে মুষল হবে সে আর বড় কথা কি।

—তোরে আঁটতে পারে যে, সে এখনো মায়ের প্যাটে। বাবার নামে আছিস, এবারে তোর চরিত্তিরটা বদলে ফ্যাল। নইলে তোর অনেক হেনস্তা।

—এ চরিত্তির আর বদলাবে না খুড়ো। তুমি যতই বলো।

নটবর আর কথা বাড়ায় না। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ধনপতিকে বোঝানোর শক্তি ওর ঘটে নেই।

ধনপতিও খুড়োকে পেলে কথার দিক থেকে বেসামাল হয়ে পড়ে। রঙ্গ-রসে মেতে ওঠে। মুখে ও যাই বলুক, আসলে খুড়োর ওপর ওর একটা আলাদা টান আছে। সে টানটা প্রাণের টান।

বেশ কিছুসময় চুপচাপ বসে রইলো দু'জনে। নটবর বসে বসে তিন-তিনটে বিড়ি শেষ করে। ফুলটুসি মরে যাবার পর থেকে ওর বিড়ি খাওয়ার মাত্রাটা বেড়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বেড়ে গেছে ওর ছটফটানিও। দু'দণ্ড কোথাও স্থির হয়ে থাকতে পারে না। কদিন তো ধনপতির সঙ্গে ডিঙিতেই ছিল, তারপর ঘরে থাকতে আরম্ভ করেছে। তবে কাজ থাকলে ধনপতির ডিঙির হাল ধরা ওর আছে। যে কদিন কব্জিতে জোর আছে সে কদিন ও

হালের মুঠি ধরে কাটিয়ে দেবে। আর কোনো কাজের কথা ওর চিন্তাতেই আসে না। কিন্তু ধনপতি মাঝে মাঝে যে রকম ভাব দেখায়, তাতে ওর ভয় হয়। কিন্তু ভরসা পায় একটা কথা ভেবে, ধনপতির হাড়ে-মজ্জায় মিশে রয়েছে নোনা গাঙ আর বাদাবনের টান। দাঁড় টানা তার বন্ধ হবে না। ডিঙি তাকে বেয়ে বেড়াতে হবে। ধনপতি নিজেই তো বলে, 'ডিঙি বাওয়া আমার পেশা না, নেশা, এ নেশাটা যেদিন যাবে সেদিন আমার মরণ।'

কিন্তু ধনপতির স্বভাবটা হঠাৎ যেন বদলাতে শুরু করেছে। নটবর লক্ষ্য করেছে, ধনপতির মধ্যে আগে যে বাউণ্ডুলে দিলখোলা মানুষটা ছিল, সে মানুষটার যেন রকমফের হচ্ছে। এত'র মধ্যে ধনপতি যখন প্রাণ খুলে হাসে, তার সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গে পুরনো মানুষটা যেন ওর মধ্যে ফিরে আসে। আর নটবর তখনই তার পুরনো চোখ দুটি খুলে ধনপতিকে দেখে। না—ঠিক তেমনি আছে ধনপতি। এতটুকু রকমফের তার হয় নি। মাল-কাঠ-ঝাঁকা বাউণ্ডুলে ধনপতির রূপ যেন একটাই। সে রূপ বদলাবার নয়।

একসময় নটবর জিজ্ঞাসা করে, তুই বাবার ঠাঁই যাবি কাদের সঙ্গে? ভণ্ডুর দলেরা তো কাল রওনা হচ্ছে। তুই কি ওদের সঙ্গে যাবি নাকি?

—না, ও সব গাঁজাগুলির দলে আমি নই। বাবার নামে থাকাটায় মানে বুঝি, কিন্তু ওই সব নেশা ভাঙের মানে টের পাইনে। ধনপতি বেশ খানিক বিরক্তির ভাব উগরে দিয়ে বলে ওঠে, ওরা সব কাদা-খোঁচা পাখির দল, কাদায় পোকা খুঁজেই বেড়ায়। তুমি তো জানো খুড়ো—ওরা হলো গে এক-একটা জ্যান্ত বাবা—ওদের সঙ্গে আমি যাতি পারি? ওদের দলের ভূষণরে তো জানতে, ব্যাটা রক্ত আমাশয় ভুগে মরেই গেল আর বছরে। অত গাঁজা পোড়ালে না মরে আর যায় কোথায়। ও সব দলে-টলে আমি নেই, আমি একাই যাবো বাবার ঠাঁই।

—যাবি কবে?

—মনে করে আছি তো পরশু'কার দিন রাত পো'লেই বেরিয়ে পড়বো। তুমি যাবা?

—যাতি মন চায়, কিন্তু যাবো কি করে?

—যাবা কি করে মানে?

—মনের দিকটা বেঠিক হয়ে গেছে। এ মনে কি যাওয়া চলে? নটবর একটু ভেবেচিন্তে বলে, দেখি, মন যদি চায় যাবো।

—তোমার মন না স্মৃতি।

কথার পিঠেই ধনপতি কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে চড়িয়ে বলে ওঠে, 'বল বাবা ভাঙড় ভোলার চরণে সেবা লাগে—'

শেষ পর্যন্ত ধনপতির সঙ্গে নটবর ঘরামির 'বাবার ঠাঁই' যাওয়া হয়ে উঠলো না। কারণ আর কিছু নয়, নটবরের অনিচ্ছা। ধনপতিও তার যাওয়া নিয়ে বেশি 'পেড়াপেড়ি' করেনি। বরং একটা দিক থেকে ভালোই হলো—এই গাজনের মেলার মুখে নটবরখুড়ো যদি ডিঙিটা থেকে কিছু রোজগার করে নিতে পারে। হাতে-গাঁটে যা কিছু আছে এই উদ্যোগে ধনপতির সবই হয়তো খরচ হয়ে যাবে। এদিকে ফিরে এসে ডিঙিটার মেরামতি কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। সামনে ঝড় বাদলের দিন আসছে, এমন শুকা দিন আর তখন পাওয়া যাবে না।

দুপুরের 'হবিষ্যি' সেরে মোল্লাখালির ঘাট থেকে হাসনাবাদের লঞ্চে উঠলো ধনপতি। হাসনাবাদ পৌছতে রাত হয়ে যাবে, রাতটা ওখানে কাটিয়ে একেবারে ভোরের ট্রেনে বারাসাত চলে যাবে।

বারাসাত থেকে বাসে বারাকপুর হয়ে মনিরামপুর। ওখান থেকে গঙ্গা পেরিয়ে শেওড়াফুলি।

শেওড়াফুলির আর নাম নিমাইতীর্থ। নিমাইতীর্থের ঘাট থেকে ঘট কিংবা কলসি ভরে গঙ্গা জল নিয়ে বাঁকে করে পায়ে হেঁটে একেবারে বাবার ঠাঁই।

যেমন মনে ভেবেছিল তাই করলো ধনপতি। অজস্রের ভিড়ের মধ্যে থেকেও সে একা এসে পৌছলো শেওড়াফুলির গঙ্গার ঘাটে।

ঘাটের কাছে ঝোলাঝুলি রেখে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়লো ধনপতি। সাঁতার কাটলো খানিক। তারপর ঘাটের ওপরে একটা ফাঁকা জায়গায় বসে ফলারের পাট চুকিয়ে নিলে।

ঘণ্টা-বাঁধা বাঁক বিক্রি হচ্ছে ঘাটের কাছে। দেখে শুনে একটা বাঁক আর দুটি ছোট ছোট মাটির কলসি কিনলে। এই কলসি ভরা জল নিয়ে যেতে হবে 'বাবার' ওখানে। এই জল দিতে হবে 'বাবার' মাথায়।

শেওড়াফুলি থেকে রওনা হতে বেলা তিনটে বেজে গেল। যাক। চলতে আরম্ভ করে ধনপতি একবার ফুকরে উঠলো, 'বল বাবা ত্রিশূলধারীর চরণে সেবা লাগে,…মহাদেব।'

অগণিত নর-নারীর ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল ধনপতি মাঝি। আগের যাত্রীকে পিছনে রেখে সে এগিয়ে চললো ঝড়ের বেগে। সহযাত্রীরা অবাক হয়ে ফিরে চাইলো এই দীর্ঘকায় মানুষটির দিকে।

কিন্তু ধনপতির কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে ঝড়ের বেগে হেঁটে চলেছে শেষ চৈত্রের রোদ মাথায় নিয়ে। তার পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বাঁকের ঘণ্টা বাজছে টুং-টাং। মাঝে মাঝে 'বল বাবা ভাঙড় ভোলার চরণে সেবা লাগে—মহাদেব' বলে চলার গতিটা যেন আরো বাড়িয়ে দিতে চাইছে।

সামনের পথ পিছনে রেখে, ধনপতি ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলে।

তারকেশ্বরে পৌঁছে কোনো ডেরা খুঁজে পেল না ধনপতি। দরকার নেই ডেরার। বাবার গদিতে গঙ্গা জলের কলসি জমা দিয়ে ধনপতি একটা গাছ-তলা খুঁজে বার করলো। সেখানে আরো কিছু সন্ন্যাসী ইতিমধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

হাজার হাজার মানুষের ভিড় দেখে ধনপতির মনে বিস্ময় জাগে। এতো লোক 'সন্ন্যেস' নিয়ে কেন আসে! তারপর মনের মধ্যে একটা প্রশ্নও উঁকিঝুঁকি দেয়। প্রশ্নটা আর কিছু নয়—এতো লোক আসে কোন্ 'পুণ্যি'র জন্যে? আর সে 'পুণ্যি' নিয়ে কি-বা হয়! কে দেয় সে 'পুণ্যি'? বাবা তারকনাথ!

কিন্তু এই বিস্ময়, এই প্রশ্ন ধনপতির মন থেকে হারিয়ে যায় এক সময়। তখন সে একটা কথা সহজ ভাবে স্বীকার করে নেয়। 'বিশ্বেস' থাকলে সবই পাওয়া যায়।

উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার আবাদ অঞ্চলের বহু লোক এসেছে তারকেশ্বরে। ধনপতির সঙ্গে অনেকেরই দেখা হলো। মোল্লাখালির দল খুঁজে বার করলো ধনপতিকে। তারা জানে 'সন্ন্যেস' করেছে ধনপতি। কিন্তু এখানে এসে কোথায় উঠেছে তা তারা জানতো না। মোল্লাখালির দলের সবাই উঠেছে দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে। ধনপতি গাছতলায় আছে দেখে তারা তাকে ঘরে যাওয়ার জন্যে অনেক করে বললে। কিন্তু ধনপতি রাজী হলো না। এই গাছ-তলা তার কাছে অনেক ভালো। একটা বদ্ধঘরে বিশটা লোক হাঁস-ফাঁস করার চেয়ে, এই খোলা আকাশের নিচে মাটির ওপর থাকা অনেক সুখের।

শুধু মোল্লাখালির দল নয়, আরো কতজনকে দেখতে পেল ধনপতি। ধনপতি

'সন্ন্যেস' করেছে দেখে কেউ কেউ দস্তরমত বিস্ময় প্রকাশ করলে। মাল-কাঠ-ঝাঁকা ধনপতির একটা পরিচয়ই এতদিন ছিল—সে জনম বাউণ্ডুলে। সে যে গেরুয়া পরে 'ধম্ম-কম্ম' করবে এ যেন তাদের ধারণার বাইরে।

ধনপতি সবাইকে একটা কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শোনালো। 'তাঁর কিরপা থাকলি শুকনো ডালেও পাতা গজায়'। সে 'সন্ন্যেস' করবে এ আশ্চর্য কথা কি।

প্রথম রাতটা সেই গাছতলাতেই কাটালো ধনপতি। সকালে সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে উঠে দূরে মাঠের দিকে গেল। সেখানেই একটা কাঁটা ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে দেখলো সূর্যোদয়।

অনেকদিন পর আজ ওর মনটা ভরে গেল। যেন অনেকদিন এমন করে সূর্য ওঠেনি ওর পৃথিবীতে।

কি এক ছেলেমানুষী পেয়ে বসলো ধনপতিকে। ফাঁকা মাঠের মধ্যে খানিক সময় ছুটোছুটি করলে। তারপর খেজুর পাতা ভেঙে নিলে দাঁতন করার জন্যে। মাঠের মধ্যে একটা এঁদো পুকুর, সেখানে মুখ হাত ধুয়ে ফিরে এলো গাছতলায়।

বসে থাকতে মন চাইলো না। মন্দিরের দিকে গেল ধনপতি। অজস্র দোকান পসার বসেছে মন্দিরের চারদিকে। দোকানে দোকানে নানা পণ্যসম্ভার। মনোহারী জিনিসের ঘটা বেশি। দেশ-দেশান্তর থেকে এসেছে যাত্রীরা। যাবার সময় ঘরে রাখবার মতো জিনিস কিছু-না-কিছু নিয়ে যাবে।

ঘুরে ঘুরে দেখলো ধনপতি। মন্দিরের কাছে গেল। আবার ফিরে এলো বাবার দুধপুকুরের কাছে।

একটা লোক ঘাটের ওপরে চত্বরের কোণে দাঁড়িয়ে তারকনাথের মাহাত্ম্য কথা শুনিয়ে বই বিক্রি করছে। বইগুলো তারকনাথের 'মাহিত্য' কথা নিয়ে। কি মনে হলো ধনপতির, একটা বই কিনে ফেললে।

হঠাৎ কানে এলো কে যেন বলছে 'বাবা—ওই সেই মাঝি না ?'

কথাটা কানে যেতেই ফিরে তাকায় ধনপতি। দুধপুকুরের ঘাটের ওপর দাঁড়িয়ে রাখাল মৃধা আর সেঁজুতি। বাবা মেয়ে দুজনেই 'সন্ন্যেস' করেছে।

রাখাল মৃধা এগিয়ে আসে। ধনপতির দুটি হাত চেপে ধরে বলে, আমরা কেউ তোমার কথা ভুলিনি। হেন দিন নেই ও-মেয়ে তোমার নাম করে না।

সেঁজুতি দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। রাখাল ডাক দেয়, দাঁড়িয়ে থাকলি কেন, শোন—তুই তো দেখালি আমাদের ধনপতিকে। তুই তো জিজ্ঞেস

করলি, বাবা—ওই সেই মাঝি না? আরে সেই মাঝিই তো বটে। এ মাঝি হলো তোর পারের কাণ্ডারী।

মাথায় ঘোমটা টেনে সেঁজুতি এগিয়ে আসে। লাল পেড়ে গেরুয়া রঙের শাড়ি পরনে, মাথায় আ-তেলা রুক্ষ চুলের গোছা, গলায় উত্তরীয়—যোগিনীর মতো মনে হয় সেঁজুতিকে।

ধনপতির কাছে এসে মুখ তুলে চায় সেঁজুতি। করুণ মিনতি মাথানো দৃষ্টি। ধনপতি এক নজরে সেঁজুতিকে দেখেই বলে ওঠে, ভালো আছো তো তুমি?

—হ্যাঁ।

—সন্ন্যেস করলে কেন?

এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না সেঁজুতি। ধনপতিও মনে মনে বিব্রত বোধ করে। এ-প্রশ্নটা তার না করাই উচিত ছিল যেন।

রাখাল বলে, তুমি কোথায় উঠেছ ধনপতি?

—গাছতলায় আছি।

ধনপতি গাছতলায় আছে শুনে রাখাল আর সেঁজুতি দুজনেই কিছুটা ব্যথা পায়। কিন্তু তাদের এ ব্যথায় ধনপতির কিছু যায় আসে না। সে অনর্গল বলে যায় তার মনের কথা। ঘরের চেয়ে বাইরের টানটাই তার কাছে বেশি। ঘরে তার মন টেঁকে না। সেই কৈশোর থেকে আরম্ভ করে আজকের জীবন পর্যন্ত, কদিনই বা ঘরে থেকেছে সে। এমনিতেই ঘরে তার মন নেই, আর এখন তো গেরুয়া পরে 'সন্ন্যেসি' হয়েছে। হয়তো এ-ব্রতটা এক মাসের, কিন্তু ব্রতের প্রয়োজনটা কেবল এক মাসেই শেষ হয়ে যায় না। এর প্রয়োজন সারা জীবন। বাবা তারকনাথের কাছে মাথা কুটে প্রার্থনা জানাবে ধনপতি, বাবা যেন তাকে কখনো কুমতি না দেন। ধনপতির ভাষায় 'সন্ন্যেস করেচি—এই সন্ন্যেস করাটার মানে হলো নিজেকে শোধন করে নেওয়া। এই উপোস-কাপাস, এই কড়াকড়ি, এটা শুধু এক-মাসের জন্যি নয়—ঘরে ফিরে মাছ-ভাত মুখে দে আবার যা-নয় তাই করে বেড়ালাম, তাতে বাবার দয়া পাওয়া যায় না। বাবার নামে আছি, বাবার কাছে মাথা কুটে বলবো, তিনি যেন আমারে কখনো কুমতি না দেন।'

ধনপতির কথা শুনে অবাক হয় সেঁজুতি। নতুন করে ফিরে চায় সে এই বিচিত্র মানুষটির দিকে। এই মানুষের আকারটাই কেবল বড় নয়, তার মনটাও বড়। অনেক বড়।

রাখাল জিজ্ঞাসা করে, তুমি ঘরে ফেরবা কবে ?

ধনপতি উত্তর দেয় কিছু সময় চিন্তা করে। বলে, কবে ফেরবো ঠিক নেই। তবে ফেরবো নিশ্চয়। মন আমার ডাঙায় ঠিক থাকে না। জলে জলে ডিঙি নে ভেসে বেড়াতে হবেই। নইলে মন আমার শান্তি পাবে না। তোমরা ফেরবা কবে ?

রাখাল বলে, ভাবছি পরশুদিন চলে যাবো। মেয়ের ইচ্ছে কলকাতার কালীঘাটে যাবে।

কালীঘাট! ধনপতির মনে হয় কালীঘাটের কথা। গুরুপদ হাউলির বিধবার সঙ্গে সে একবার কালীঘাটে এসেছিল। সে অনেকদিন আগের কথা। সেই কালীঘাট দেখার স্মৃতি-চিহ্ন এখনো ডিঙিতে আছে। একটা কালীর পট কিনেছিল তিন আনা দিয়ে, সে পটটা ডিঙিতে ডোরার কাছে রেখেছে ছই-এর বাতার গায়ে ঝুলিয়ে।

—তুমি যাতি চাও তো আমাদের সঙ্গে যাতি পারো। রাখাল বলে।

—ভেবে দেখি কথাটা। যাই তো যাবো।

—তা, আমাদের ঘরটা দেখে যাও।

—চলো।

মন্দিরের কাছে পাণ্ডার একটা ঘরে উঠেছে রাখাল মৃধা আর সেঁজুতি। ঘর নামে, আসলে একটা খুপরি। কোনমতে দুটো লোক থাকতে পারে। ঘরটা বাইরে থেকে দেখে চলে গেল ধনপতি। যাওয়ার আগে চিৎকার করে বলে গেল, 'বলো বাবা জটাধারীর চরণে সেবা লাগে—মহাদেব।'

বাবা তারকনাথের নাম নিতে নিতে ধনপতি ফিরে এলো তার গাছতলার আস্তানায়। সারাদিন কাটালো গাছতলাতেই। দুপুরে বাবা তারকনাথের পূজো হয়ে গেলে ও গিয়েছিল দুধ-পুকুরে স্নান করতে। তারপর গাছতলাতে এসেই ফলার সেরেছে।

সন্ধ্যের দিকে ধনপতি গাছতলার কাছেই একটা ঝোপের পাশে বসে আরো কজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। এদের কথার মধ্যে কখন যেন রাখাল মৃধা এসে হাজির হয়েছে মেয়েকে নিয়ে।

ফিকে অন্ধকার হলেও ধনপতিকে চিনে নিতে রাখালের অসুবিধে হয়নি। গলার স্বরেই চেনা যায় ধনপতিকে। ওর গলার স্বরটা অদ্ভুত রকমের গম্ভীর শোনায়।

ধনপতি কতকটা বিস্ময়ের সঙ্গেই বলে ওঠে, তুমি এখানে খোঁজ পেলে কেমনে ?

—তোমার খোঁজ পাতি দেরি হয় নাকি ? তোমারে না চিনেও সবাই চিনে নেয় ।

—তার মানে ?

—মানে আর কি ? তোমার মতো দশাসই মানুষ এই লাখো মানুষের ভিড়ে আর একটি নেই ।

রাখাল মৃধার কথার পিঠে হো হো করে হেসে ওঠে ধনপতি ।

—তোমার হাসিটা বেশ, হালের মানুষ এমন করে হাসতে জানে না । রাখাল মৃধা মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বলে, ও মেয়ে তো তোমার হাসির কথা নে প্রায় দিন হাসাহাসি করে ।

—বাবা ! সেঁজুতি লজ্জা পেয়েছে বোধহয় । বলে, তুমি যেন কি বাবা । আমি আবার কবে হাসলাম ওনার হাসির কথা নে ।

—যাক গে ওসব কথা । ধনপতি বলে, বাবার ঠাঁই এসে ওসব তক্য-বিতক্য ভালো না । এখানে মিথ্যে বলতে নেই । এ যে বাবা তারকনাথের ঠাঁই ।

আরো সে-সব সন্ন্যাসীরা ছিল, ধনপতির কথার শেষে তারা বাবার নামে আসর মাতিয়ে তোলে । দলের মধ্যে একজনের হাতে ছিল পিতলের সরা, সেটা বাজিয়ে সে বাবার মাহাত্ম্য কথা নিয়ে গান ধরে । আর ক'জন সেই সুরে সুর মেলায়—

ও বাবা শ্মশানবাসী, ক্ষ্যাপা বাবা,
জটাধারী বাবার চরণ
নিলাম শরণ
ও বাবা ভাঙড় ভোলা, ভোলাবাবা—
ত্রিশূলধারী বাবার চরণ,
নিলাম শরণ—
ও বাবা ন্যাংটা বাবা, ন্যাংটা কালীর স্বামী
লোকে বলে পতিতপাবন, তুমি অন্তর্যামী,
ও বাবা—পতিতপাবন
তোমার চরণ
নিলাম শরণ

ও বাবা—কৃপা করে

ভক্ত জনে

দাও গো দরশন।

ও বাবা……

গান গেয়ে যায় একজন। অন্যেরা হাততালি দিয়ে তালে তালে ঠিক সুর মিলিয়ে যায়। ধনপতি সুর মেলাতে চেষ্টা করেও পারে না। তার গলার সুর যে অসম্ভব রকমের ভারী। অন্যের কণ্ঠের সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর বেসুরো শোনায়। তাছাড়া গানটান তার আসে না।

রাখাল আর সেঁজুতি বসেছে একান্তে। এই গানের আসরে বাবার নাম-গানের রসে তারাও যেন মেতে ওঠে।

সুরেলা-কণ্ঠ রাখালের, সেই সঙ্গে সেঁজুতির মিহি-গলার সুর—সকলের শেষে বাবা-মেয়েতে সুর করে গেয়ে ওঠে—

ও বাবা শ্মশানবাসী, ক্ষ্যাপা বাবা

জটাধারী বাবার চরণ

নিলাম শরণ…

গান শুনে সেই গান মুখস্ত করেছে বাবা-মেয়ে। সেই গান গাইছে দু'জনে। সবাই অবাক হয়ে যায় তাদের এ-গান শুনে।

ধনপতি বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে ফিরে চায় সেঁজুতির মুখের দিকে। গানের মধ্যে ডুবে গেছে সেঁজুতি। গানের মধ্যে নিজেকে নিবেদন করেছে। তাই তো তার দু'চোখ ভরে উঠেছে জলে।

ধনপতির মনটা ভিজে ওঠে, যার কণ্ঠে এমন মধুর সুর, তার জীবনে এত জ্বালা কেন?

পরক্ষণে ধনপতির মনের মধ্যেকার আর একটা মানুষ জেগে ওঠে। সে মানুষটা যেন বিদ্রোহ করে ওঠে অকস্মাৎ। মাল-কাঠ-ঝাঁকা ধনপতির মন বলে ওঠে, সব মিথ্যে, বাবা তারকনাথ মিথ্যে, মিথ্যে সব। তা যদি না হবে সেঁজুতিকে এমন করে কাঁদতে হবে কেন?

আচমকা হেসে ওঠে ধনপতি। সেঁজুতির গান থেমে যায়। অবাক হয় ধনপতির উচ্চকণ্ঠের হাসি শুনে। তারপর আরো দেখলো, পাগলের মতো হাসতে হাসতে লম্বা লম্বা পা ফেলে ধনপতি আসর ছেড়ে উঠে গেল।

নিমেষের মধ্যে সে হারিয়ে যায় দৃষ্টির অন্তরালে।

॥ সাত ॥

সন্ধ্যার পর।

নটবর ঘরামি সারাদিন ডিঙি বেয়ে সন্ধ্যের পর ডিঙির গলুই-এর ওপর বসে একটু আরাম করছে।

ধনপতি নেই, দু'টাকা রোজ ফুরোনে মালোপাড়ায় একজন ছোঁড়াকে রেখেছে নটবর।

কটা দিন ভালোই গেছে। আরো কদিন এমনধারাই চলবে। নীল পুজো, গাজনের মেলা, চড়কপুজো তারপর আছে হালখাতার মরশুম। কদিন ধরে ভাড়া বয়ে উঠতে পারেনি নটবর। কদিনের ভাড়ার টাকার অঙ্কটা খরচ-খরচা বাদ দিয়েও সত্তরে দাঁড়িয়েছে। হালখাতার এখনো চারদিন বাকি, এ-কদিনে আরো সত্তর পঁচাত্তর টাকা কামিয়ে নেবে সে। একসঙ্গে এতগুলো টাকা ধনপতির হাতে দিলে নিশ্চয়ই খুশি হবে। কিন্তু—সংক্রান্তির আগে সে পৌঁছবে বলে মনে হয় না।

বিড়ি টেনে আরাম করছে নটবর। মালোপাড়ার ছোঁড়াটা গেছে হাটে। কিছু বেসাতি করতে। চাল, ডাল, মশলা সবই কিনতে হবে। আজ না কিনলে আবার সেই তিনদিন পরে হাট। ছোঁড়াটাও কদিন ওর ডিঙিতেই আছে। ধনপতি না আসা পর্যন্ত থাকবে।

হঠাৎ ফুলটুসির কথা মনে এলো নটবরের। বিড়ির ধোঁয়াটা গিলতে গিয়ে কাশি লাগলো। দমকা কাশি। কাশিটা লাগলো বোধহয় ফুলটুসির কথা মনের মধ্যে পাক দিয়ে উঠতে।

ফুলটুসির কথা মনে পড়তে, মনের মধ্যেকার চাপা-পড়া দুঃখটা আবার মোচড় দিয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে একটা বোবা কান্নার আবেগ ওকে উতলা করে তোলে।

আপনমনে গেয়ে উঠলো নটবর—

হরিরে,

গুরুর নামে ভাসলো তরী

পার করো কাণ্ডারী।

এ গান ভালো লাগলো না। আর একটা গানের কলি গুনগুনিয়ে উঠলো

ওর কণ্ঠে। অনেকদিনের পুরনো দেহতত্ত্বের গান। যে গান গাইতো জরিনার দলের বাগান অধিকারী।

মনের, তোর দেহলতায় ঘুণ ধরেছে।
কেনরে আর ভাঙা তরী বাওয়া
মাঝিরে—মিছে দাঁড় টানিস কেনে
ছেঁড়া পালে বাদ্ধ্যে না রে হাওয়া।

আপন মনে গেয়ে চলে নটবর। গানের ভাষার মধ্যে ভাবের মধ্যে জীবনের অর্থ বাঁধা আছে।

নটবরের পোড়-খাওয়া জীবনের সত্যি-অর্থটা আজ যেন এই। এর চেয়ে সত্যি আর কিছু নেই।

অথচ যৌবনকালে এই জীবনটার আরো কত রকমে অর্থ করা যেত। করতোও। জীবনের ঝুলি ভরে নেবার জন্যে কত রকমের চাতুরী বৃত্তি মনের মধ্যে আসতো। সে জীবন ছিল নানা রঙে নানা রসে ভরা। কালে সে রঙ ফিকে হয়ে গেল, সে রস হারিয়ে গেল দিনে দিনে। সব রঙ গিয়ে একটা রঙ রইলো, সে রঙ পোড়-খাওয়া জীবনের রঙ। আর রসের সমুদ্র মজে গেল পলিমাটি জমা হয়ে। একদিন যেখানে ঢেউ খেলতো, এখন সেখানে ধু ধু বালুচর।

—খুড়ো আছো নাকি, ও খুড়ো—

ধনপতির কণ্ঠস্বরে নটবর সচকিত হয়ে ওঠে। আজই ধনপতি ফিরলো কেমন করে! তবে কি বাবার মাথায় জল না চড়িয়েই সে ফিরে এসেছে। ওর তো সবই 'আকালকেঁড়ে' কাজ—হয়তো তাই এসেছে। ওর মন না তো ক্ষ্যাপা হাতি। কখন কি ভাবে, কখন কি করে ঠিক-ঠিকানা নেই।

ধনপতি হনহন করে এগিয়ে আসছে ভেড়ির ওপর দিয়ে। অন্ধকারে তার ছায়া-ছায়া দীর্ঘ মূর্তি দেখতে পায় নটবর।

এবারে সাড়া দেয় নটবর।

ধনপতি বলে ওঠে, ফিরে এ্যালাম খুড়ো। ভালো লাগলো না ও-সব সন্ন্যেস-ফন্ন্যেস। যার যা কাজ তাই করা ভালো। তুমি সেই কি একটা গান গাইতে না, 'মাটি কাটা ভয়ে, পাঁচ সিকে দিয়ে হালে হইচি বৈরাগী'। আমার হয়েছিল তাই, সন্ন্যেসী হবার শখ হ'ল।

নটবর শুধু শুনে গেল, ধনপতির কথার পিঠে কোনো মন্তব্য করলো না। এখন কোন্ কথাটা ধনপতির মনের মতো হবে, তা দেবতাও জানে না। মনের মতো

কথা না হলে রক্ষে নেই। রেগে উঠবে। দশ কথা শোনাবে। তার চেয়ে চুপ করে থাকা ভালো।

ডিঙিতে উঠলো ধনপতি। উঠেই ডোরা থেকে সাদা কাপড় বার করে পরলো। গেরুয়া কাপড়, উত্তরীয় সব ছুঁড়ে ফেলে দিলে নদীর জলে। তারপর শান্ত হয়ে এসে বসলো নটবরের মুখোমুখি।

এত সময় বাদে কথা বলে নটবর। বলে, কাজটা কি ভালো করলি ধনপতি। বাবার নামে থেকে এ-সব পাগলামি মানায় না :

—দুত্তোর ছাই, মনে যদি ভালো না লাগে তা কি করবো। আমি ওসব বাবাটাবার নাম নে ধোঁকাবাজি দিতে চাইনে। সহজ কথায় বুঝি আমার মন যা চায় না, তা করতি পারিনে।

—কিন্তু কী হয়েছে তোর! নিশ্চয়ই একটা কোনো কাণ্ড ঘটেছে, নয়তো—

—খুড়ো, মনে পাপ ঢুকলে ভেক নে সে-পাপ নষ্ট করা যায় না। আগে মনটারে চাব্‌কে শায়েস্তা করে নিতে হয়। তারপর অন্য কথা। সেদিনে তোমারে বলেছিলাম না, আমার মনে পাপ শিকড় গেড়েছে। আগে সে পাপটারে উচ্ছেদ করি, তারপর যার নাম নিতে বলো, তার নাম নেবো। যাক গে, বাদ দেও ওসব কথা। এখন কি করা যায় বলো তো?

—কি আবার করা যাবে, নটবর বলে, দাঁড়ে বোস—চল্ এক চক্কর ঘুরে আসি—এক ঝুল দাঁড় টানলে তোর মনটা আবার ঠিক হয়ে যাবে। নে চল্—

—না খুড়ো, ডিঙি এখন বাইবো না। তার চেয়ে তুমি গান গাও, আমি বসে শুনি।

ধনপতির কথায় নটবর হাসে। বলে, ডোরা থেকে আমার একতারাটা দে। একতারাটা বার করে নটবরের হাতে দেয় ধনপতি।

—জুৎ করে বোস—নটবর বলে, তোরে একটা রসের গান শোনাই।

সে নাগর আসবে বলে
রাই আমার সেজেছে ভালো,
স্বর্ণলতায় বেন্ধেছে বেণী,
অঙ্গে দেছে রাঙ্গা চেলী,
পায়ে দেছে রুপোর নূপুর,
চোখে দেছে কাজল কালো।
সে নাগর আসবে বলে—

একতারা বাজিয়ে মনের আনন্দে গান গেয়ে যায় নটবর। অনেকদিন পর আজ রসের গান ওর কণ্ঠে। এ গান গাইতে নটবরের মনটা হু হু করে ওঠে। তবুও গায়। গাইতে গাইতে হয়তো জীর্ণ মনটা আবার সজীব হয়ে ওঠে ক্ষণিকের জন্যে।

গান শেষ হলো। একতারাটা কোলের কাছে রেখে নটবর ধনপতির মুখের দিকে ফিরে চায়। ধনপতিও কেমন যেন উন্মনা হয়ে পড়েছে।

নটবরের গানের সুর শুধু নয়, আর একজনের গানের সুর যেন অলক্ষ্য থেকে ওর কানের কাছে এসে বাজে। সে গান সেঁজুতির।

সেদিন তারকেশ্বরে মাঠের ধারে বসে সেঁজুতির গান শোনার পরই ওর ভাবান্তর হয়। এত সুর যার কণ্ঠে, তার প্রাণে এত দুঃখ কেন? ভগবানের রাজ্যে একি অবিচার! সহজ-সরল মেয়ে সেঁজুতি, জীবনে হয়তো কোনো পাপ সে করেনি, অথচ তারই কপাল-জুড়ে দুঃখের লেখা।

সেঁজুতির গান শুনে ধনপতির মনের মধ্যেকার আর একটা মন বিদ্রোহ করেছিল—সেই রাতেই ও তারকেশ্বর ছেড়ে চলে আসে। পায়ে হেঁটে নিমাই-তীর্থে পৌঁছেছিল শেষ রাতে। তারপর সেখান থেকে একেবারে সিধে মোল্লাখালির ঘাটে। এই আসার পথটা সে ভেবেছে সেঁজুতির কথা। ভেবে কোনো কূলকিনারা পায়নি। থেকে থেকে একটা জিজ্ঞাসা ওর মনের মধ্যে জেগেছে—ভগবানের রাজ্যে ভালো মানুষের কপালে এত দুঃখ কেন?

বাবা তারকনাথের ঠাঁই থেকে চলে এসেছে ধনপতি, সেকি শুধু সেঁজুতির জন্যে। না এর পেছনে আরো কিছুর তাড়নার অঙ্কুর ছিল ওর মনের গোপনে! ধনপতি নিজেই মাঝে মাঝে নিজের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। সেই তের বছর বয়েস থেকে আজকের জীবন—এর মধ্যে কত ঘটনা ঘটেছে, যে-সব ঘটনা অঘটনের নামান্তর। অথচ ধনপতি সে-সব ঘটনার বাইরে রাখতে পারেনি নিজেকে। ওর মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণি আছে, যে ঘূর্ণিটা ওকে অনেক সময় আলোড়িত করে নানাভাবে।

—ধনপতি, অ ধনপতি, নটবর একতারার তারে মৃদু আওয়াজ তোলে। বলে, এবারে তুই শান্ত হ।

ধনপতি চুপ করে থাকে।

নটবরও খানিক সময় নীরবে বসে থেকে শুধু একতারাটা টুং-টাং করে

বাজিয়ে চলে। তারপর বলে, তোর স্বভাবটা দামাল গাঙের মতো। কখন যে তোর কি ধরন হয়, কেউ বলতি কইতে পারে না।

এবারে ধনপতি চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে, খুড়ো আমার জন্মের কালে 'কুগ্রহ' ছিল, নয়তো আর দশটা মানুষের মতো হতি পারলাম না কেন? আমার কথা তুমি ভেবো না—দেখবা আমার জীবনটাও আর দশটা মানুষের জীবনের মতো একদিন শেষ হয়ে যাবে। মাঝেপড়ে খানিক লাফা ঝাঁপা সার।

নটবর তখনো তার একতারাটা সমানে বাজিয়ে চলেছে। সুরটা এবারে যেন ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে।

ধনপতি থামকা বলে ওঠে, আজ আমি বাড়ি যাই—অনেকদিন ঘরে রাত কাটাইনি।

—বাড়ি যাবি!

—হ্যাঁ। রাত পো'লেই ফেরবো!

—যা মন চায় তাই কর। কথা তো কানে নিবি না।

ধনপতি নেমে যায় ডিঙি থেকে। নদীর পারের আল-পথ দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে।

কতদিন ঘরে আসে না ধনপতি। প্রায় একমাস হতে চললো। বাড়ির উঠোনে এসেই ধনপতি থমকে দাঁড়ায়। বুকের ভিতরে একটা ব্যথা আচমকা জেগে ওঠে। সে ব্যথাটা বড় তীব্র।

কী ছিল তার এই ঘরখানার চেহারা আর কি হয়েছে। দু' বছর আগেও যে এসেছে ওর বাড়ি, সে-ই ওর এই গোলপাতা আর খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘরের তারিফ করেছে। বলেছে, ঘর নয়তো ছবি। আর আজ! ঘরের দিকে তাকাতে মন চায় না।

উঠোন পেরিয়ে ধনপতি ঘরের দাওয়ায় ওঠে। একরাশ চামচিকে ছিল কোথায়, মানুষের সাড়া পেয়ে উড়তে আরম্ভ করে। দু'একটা ধনপতির মাথায় ঠোকর দিয়ে যায়।

নিঃশব্দে বন্ধ ঘরের দরজা খোলে ধনপতি। ঘরের ভিতর থেকে একটা চামসা গন্ধ ওকে উত্যক্ত করে তোলে। ঘরের ভিতরেও চামচিকের বাসা—অন্ধকারে তারা ঘরের মধ্যে উড়তে আরম্ভ করে। দেয়ালে ঠোকর খায়, কয়েকটা ধনপতির গায়ে এসে পড়ে।

অন্ধকার ঘর। ধনপতির কাছে একটা দেশলাইও নেই যে আলো জ্বালবে। একটা পুরনো হারিকেন আছে ঘরের কোণে—দেশলাই থাকলে সেটা জ্বালতে পারতো। কিন্তু হারিকেনটার তেল হয়তো শুকিয়ে গেছে। একটা দেশলাই কিংবা আলো সংগ্রহ করে আনার আগ্রহও নেই তার। আলো জ্বেলে কী দেখবে সে। শুধু চামচিকে, আরশোলার দঙ্গল, খড়-কুটো, ঝুল, আর মাকড়সার জাল—এ ছাড়া আর কি দেখবার আছে।

যেমন নিঃশব্দে দরজা খুলেছিল ধনপতি, তেমনি নিঃশব্দে দরজায় কুলুপ এঁটে ঘরের বাইরে এলো। বাইরে এসে উঠোনের মাঝখানে স্থির দাঁড়িয়ে রইলো। বুকের ব্যথাটা কান্না হয়ে গলে যেতে চায়। কিন্তু মাল-কাঠ-ঝাঁকা ধনপতির চোখে অত সহজে জল ঝরে না। মুহূর্তের মধ্যে তার মাথায় এক বিচিত্র খেয়াল জাগে। কর্ম বাউলির মালকাঠ পড়ে আছে এখনো ধাঁই-পুকুরের পাড়ে। কর্ম বাউলি নেই, কিন্তু রোদে-জলে পুড়ে-ভিজেও মালকাঠগুলো তেমনি পড়ে আছে। ধনপতির মনে হয়, একবার মালকাঠগুলো তুলে এসে দেখে, সে এখনো ঠিক তেমনি আছে কি না।

আধো-অন্ধকারে আল পথ দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করে ধনপতি। ছুটে একেবারে ধাঁই-পুকুরের ধারে এসে দাঁড়ায়।

অন্ধকার হলেও মালকাঠগুলো খুঁজে নিতে অসুবিধে হয় না। খুঁজে খুঁজে সবচেয়ে বড় মালকাঠটার কাছে যায়। হাত বুলিয়ে দেখে—গোড়ার দিকটা মাটিতে বসে আছে, আর একদিকে খানিকটা 'খোঁদল' হয়ে গেছে।

কর্ম বাউলিকে মনে মনে স্মরণ করলে ধনপতি। সেই নিকষ-কালো চেহারার মানুষ—ধনপতির ওস্তাদ। ওস্তাদের মতো ওস্তাদ।

মনে আছে ধনপতির, এই বড় মালকাঠটা ওস্তাদ কর্ম বাউলি হাঁটু পর্যন্ত তুলতে পারতো। ঝাঁকা দূরে থাক, কোনদিন বেশিক্ষণ তুলে ধরে রাখতে পারেনি। যেদিন ধনপতি এই মালকাঠটা দুহাতে ধরে ঝেঁকেছিল, কর্ম-বাউলি সেদিন সত্যিই খুশি হয়েছিল। বলেছিল, সাবাস ধনপতি, তুই তোর ওস্তাদরে ঘায়েল করেছিস। এখন থেকে মালকাঠ ঝাঁকার ওস্তাদ তুই।

ধনপতি সেদিন কর্ম বাউলির পায়ের ধুলো মাথায় নিয়েছিল।

বড় মালকাঠটার পাশে দাঁড়িয়ে পুরনো দিনের কথা ভাবছে ধনপতি। মালকাঠ ঝাঁকার পর সেদিন মোল্লাখালির জোয়ানেরা তাকে আড়কোলা করে

নিয়ে গিয়েছিল হাটখোলায়। ধনপতিকে নিয়ে সেদিন নাচানাচির অন্ত ছিল না। তারই মধ্যে কারা যেন সেদিন সোল্লাসে চিৎকার করেছিল 'মাল-কাঠ-ঝাঁকা ধনপতির জয়'।

সেদিন সন্ধ্যায় ধনপতি গিয়েছিল বারুণীবালার কাছে। বারুণী ওরই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল খিড়কির দরজার পাশে। ধনপতিকে আসতে দেখে সে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে ছিল। ধনপতি বলেছিল, করো কি—কেউ দেখে ফ্যালবে।

—ফেলুকগে—তুমি আজ যা করে এলে, আমি সব শুনিচি। পাড়ার ছেলেরা তোমারে পাঁজাকোলা করে হাটখোলায় নে গেল, তাও দূর থেকে দেখিচি। সেই থেকে দাঁড়িয়ে রইছি, কখন তুমি আসবা।

বারুণী সেদিন দুচোখে অফুরন্ত বিস্ময় নিয়ে তাকিয়েছিল বলিষ্ঠ জোয়ান ধনপতির দিকে। ধনপতিও সেদিন বারুণীর দিকে বারবার ফিরে দেখেছিল মুগ্ধ দৃষ্টিতে। দুজনেই যেন দুজনকে বলতে চেয়েছিল—সুন্দর।

কুকুর ডেকে উঠতে ধনপতির চমক ভাঙে। আলের ওপর থেকে একটা কুকুর ডাকছে ধনপতির দিকে তাকিয়ে। বোধহয় অন্ধকারে ধনপতিকে দেখে অমন করে ডাকছে।

কুকুরের ডাকে সচকিত হয়ে ধনপতি মালকাঠটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাটিতে বসে গেছে মালকাঠটা। কত বছর হলো একভাবে পড়ে আছে এটা। কেউই হাত দেয় না। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে দুহাতে ঠেলে মালকাঠটা সরাতেই হাঁপিয়ে পড়ে ধনপতি। সর্বাঙ্গে দরদর করে ঘাম ঝরে। গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছে ধনপতি মালকাঠটা ঝাঁকবার উদ্দেশ্যে গুরুর নাম স্মরণ করে।

এক-দুই-তিন—মালকাঠটা দু'হাতের শক্তিতে তুলতে পারে না ধনপতি। একবার নয় বারবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

শেষ পর্যন্ত কেমন যেন একটা রোখ চেপে যায়। বিপুল বিক্রমে মালকাঠটা তুলে ধরতে চেষ্টা করে। কিন্তু এবারেও ব্যর্থতা। নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসতে থাকে ধনপতি।

কুকুরটা তখনো ডেকে চলেছে। কুকুরের ডাকটা ধনপতির কানে বিদ্রূপের মতো মনে হয়। পায়ের কাছে একটা ঢিল পড়েছিল, কুকুরটাকে লক্ষ্য করে

ঢিলটা ছুঁড়ে দেয়। আলের আড়ালে চলে যায় কুকুরটা, কিন্তু তার ঘেউ ঘেউ বন্ধ হবার নয়।

একটা কুকুরের ডাকে আরো কয়েকটা কুকুর এসে জুটেছে। সারি বেঁধে আলের ওপর দাঁড়িয়ে ডাকছে। ধনপতি তখনো মালকাঠটার পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে। কুকুরগুলোর ডাকেও আর বিরক্তি আসছে না তার। ওরা ডাকছে ডাকুক। সত্যিই আজ সে হেরে গেছে। আজ সবাই তাকে উপহাস করতে পারে। ওর নামের আগে থেকে 'মাল-কাঠ ঝাঁকা' কথাটা একেবারে উঠে যাক এবারে।

কিছুক্ষণ সেই ধাঁই-পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে থেকে আবার নদীপারে ফিরে এসেছে ধনপতি।

নটবর তখন সেই মালোপাড়ার ছোঁড়ার সঙ্গে খোশগল্প আরম্ভ করেছে ডিঙির পাটাতনে বসে।

—অ খুড়ো। ধনপতি ডাক দেয়, ডিঙিটা পারে লাগাও।

ডিঙির মুখটা পারে লাগাতেই তড়াক করে লাফিয়ে ডিঙিতে উঠতে যায় ধনপতি। লাফাতে গিয়ে মাথাটা যেন কেমন ঘুরে গিয়েছিল আচমকা, ডিঙিতে একটা পা আর একটা পা জলে—টাল সামলাতে না পেরে জলে পড়ে যায় ধনপতি।

—কী হলো, হলো কিরে! নটবর এগিয়ে আসে গলুই মুখে।

—ডিঙির 'মলম' ধরে ধনপতি ওপরে ওঠে। জলে একেবারে ডুবে গিয়েছে সে। ডান পায়ের হাঁটুর নিচে খানিকটা জায়গা ছড়ে গেছে ডিঙিতে 'ঘ্যাঁসোড়' লেগে। জ্বালা করছে নোনা জলে। সেই ভাবে না কাপড় ছাড়া, না কিছু—পাটাতনের ওপর জাবড়ে বসে পড়ে ধনপতি। গলা চড়িয়ে বলে ওঠে, আমি হেরে গ্যালাম খুড়ো।

নটবর কিছু বুঝে উঠতে পারে না। কিছুদিন থেকেই সে লক্ষ্য করছে ধনপতির ভাবান্তর। সে প্রসঙ্গে এক-আধবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, কিন্তু ধনপতি খোলা মনে উত্তর দিতে পারেনি।

ধনপতি তার কথার পুনরাবৃত্তি করতে নটবর বলে, তোর মাথায় পোকা আছে। মাঝে মাঝে তোর কি হয় বলতো! তোর সবই 'আকালকেঁড়ে'। সন্ন্যেস করলি, প্রায় মাস ভোর মালসা পুড়িয়ে বাবার ঠাঁই গেলি—কিন্তু ফিরে এলি বাবার মাথায় জল না দে—এসে আবার গেরুয়া কাপড়, উত্তরী খুলে গাঙের

জলে ফেলে দিলি—বাবার নামে ছেলে-খেলা করতিও তোর আটকায় না। এসব কি আরম্ভ করলি বল তো?

ধনপতি শান্ত মনে শুনে যায় নটবরের কথা। নটবরও যেন আজ দু'কথা শোনানোর সুযোগ পেয়েছে। শোনাতে ছাড়ে না। একনাগাড়ে বলে যায়।

নটবরের কথা শেষ হলে ধনপতি বলে, তোমারে আমি সব কথা বলবো খুড়ো। তবে আজ না।

নটবর বুঝতে পারে মালো ছোঁড়াটা আছে বলেই ধনপতি কিছু বলতে চাইছে না এখন।

ধনপতির হাঁটুর নিচের ছড়ে যাওয়া জায়গাটা বেশ জ্বালা করছে। নটবর ডোয়া থেকে কুপী জেলে নিয়ে আসে। দেখে ধনপতির ক্ষতস্থান। বেশ খানিকটা জায়গায় ছাল-চামড়া উঠে গেছে। রক্তও ঝরছে। চুনের পাত্তর থেকে খানিকটা চুন তুলে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেয় নটবর। বলে, ভিজে কাপড় ছেড়ে ফ্যাল্। আর শোন, কদিন অনিয়ম হয়েছে, এখন দু'একটা দিন একটু জিরেন দে। আমি যেমন ডিঙি নে বেড়াচ্ছি, বেড়াই—তুই ঘরে শুয়ে থাকগে। খুড়ো খুড়ো করিস, কিন্তু খুড়োর একটা কথা শুনিস নে।

—তোমার কথা শোনবো খুড়ো। তুমি যা বলছো তাই করবো, ঘরে গে শুয়ে থাকবো, ধনপতি গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে, জীবনটা আমার শেষ হয়ে গেছে খুড়ো।

তারপর নিজে থেকেই নটবরকে কাছে ডাকে। শোনায় নিজের ব্যর্থতার কথা। মাল-কাঠ ঝাঁকা দূরের কথা, মাটি থেকে ওপরে তুলতে পারেনি। একি ওর কম দুঃখ। কোথায় গেল শরীরের সে শক্তি। তারপর মনের সে জোরও আর নেই। মনের মধ্যে কোথায় যেন পাপের পোকা বাসা বেঁধেছে। নয়তো তার সেই পুরনো মনটা আর আগের মতো তাজা নেই কেন!

নটবর বলে, ধনপতি তুই কি একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেছিস. বয়েসটা যে অনেক দূর হেঁটে এসেছে—তুই কি আর সেই বিশ-পঁচিশ বছরের জোয়ান মরদ?

সমস্যাটা কত সহজে পরিষ্কার হয়ে গেল জলের মতো। নটবরের কথার শেষে ধনপতি খানিক সময় চুপ করে বসে রইলো নোনা-গাঙের বুকের দিকে চেয়ে।

ভাঁটার টানে নদীর জল অনেকখানি নিচে নেমে গেছে। এখনো শেষ হয়নি

ভাঁটার টান। নদীতে ভাঁটা ফুরোলে আবার জোয়ারের জল আসে, কিন্তু জীবনের ভাঁটা একবার শুরু হয়ে গেলে আর সে জীবনে জোয়ার আসে না।

হো হো করে আকাশফাটা হাসি হেসে ওঠে ধনপতি। হাসতে হাসতে সে গেরাবির কাছি ধরে টানতে আরম্ভ করে।

নটবর বলে, করিস কি?

ধনপতি পাগলের মত চিৎকার করে ওঠে, বাদায় যাবো খুড়ো—বাদা পেরিয়ে সাগরে যাবো।

॥ আট ॥

পুঁইজালির বড় গাঙের মুখে গেরাবি করা ধনপতির ডিঙি।

আকাশে কাঠ-ফাটা রোদ। সেই রোদের মধ্যে ধনপতি ছই-এর বাইরে বসেছিল। রোদের মধ্যে ডিঙি বেয়ে চলা, আর বাঁধা ডিঙিতে রোদ মাথায় নিয়ে বসে থাকা এক কথা নয়। তবু অনেক সময় রোদের মধ্যে বসে ছিল ধনপতি।

নটবর ডোরায় বসে রান্না করছিল। ডাল ভাত রান্না করেছে এতক্ষণে। কড়াইতে তরকারি চাপিয়ে বাইরে এলো। ধনপতি তখনো রোদের মধ্যে বাইরে বসে। রোদে পুড়ে মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে ধনপতির। ঘামে ভেজা দেহটা শুকিয়ে তামাটে হয়ে গেছে। ধনপতি পাথরে কোঁদা মূর্তির মতো ডিঙির গলুই-এর ওপর বসে।

নটবর বলে, নে চান করে নে। তুই চান করলে আমি চান করবো। রোদের মধ্যে আর বসে থাকিস নে। সর্দিগর্মি হয়ে যাবে।

ধনপতি বলে, শরীরটারে রোদ পোড়া করে নিচ্ছি খুড়ো। রোদের তেজে দেহের শক্তি বাড়ে।

নটবর বলে, তোর মাথা। নে ছায়ায় বসে তেল মেখে তারপর চান করগে। যা, আর বসে থাকিস নে।

—আমারে অত ভালোবেসো না খুড়ো, ঠকে যাবা, বলে ধনপতি উঠে ছই-এর ভিতর যায়।

নাওয়া-খাওয়া শেষ হতে দুপুর গড়িয়ে যায়। খাওয়া-দাওয়ার পর নটবর শুয়ে পড়লো, আর ধনপতি বসে রইলো ভাঁটার অপেক্ষায়। ভাঁটা লাগলো বিকেলের দিকে।

ভাঁটার টানে ডিঙির গেরাবি তুললো ধনপতি।

হালে বসে নটবর শুধোয়, কোন দিকে যাবি রে?

ধনপতি উত্তর দেয়, বড় গাঙ দে বিত্তেয় চলো খুড়ো।

পুঁইজালি পেরিয়ে বড় গাঙ চলে গেছে দক্ষিণমুখো। বাঘনায় বড় গাঙের সঙ্গে মিশেছে বিদ্যানদী। এ অঞ্চলের লোক বলে বিত্তে, আরো সহজ করে 'বিদে'। বিদ্যা নদী মরিচঝাঁপি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে দক্ষিণে। সাগরমুখো। মোহনায় পৌঁছনোর আগেই বিত্তে নামটা হারিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত বিত্তের ধারা গিয়ে মিশেছে হরিণভাঙা বা হাঁড়িভাঙায়। হাঁড়িভাঙা সরাসরি গেছে সাগরে।

বড় গাঙের মাঝদরিয়া বরাবর ধনপতির ডিঙি চলেছে। 'মুখোট' বাতাসে ডিঙিটা যেন ঠিকমতো এগোচ্ছে না। তাছাড়া ভাঁটার টান এখনো তেমন জোরালো হয়ে ওঠেনি।

পুঁইজালি গ্রাম পেছনে পড়ে রইলো। পেছনে পড়ে রইলো কুমিরমারি, পেছনে রইলো আরো কত গ্রাম। কুমিরমারির বাঁকের কাছ থেকে রায়মঙ্গলের মুখ দেখা যায়। ওখান থেকে আরো কটা শাখানদী বিভিন্ন নাম নিয়ে চলে গেছে দক্ষিণে বাদার দিকে।

এসব গাঙ দেশের নাড়ীনক্ষত্র ধনপতির জানা। এমন নদী নেই যেখানে তার ডিঙি ভাসেনি। বাদার মধ্যে 'খাড়ি' ছড়িয়ে আছে মাকড়সার জালের মতো। ওসব খাড়ির মধ্যেও বারবার ডিঙি নিয়ে গেছে ধনপতি। কত সময় একাই গেছে ডিঙি ভাসিয়ে। গহন অরণ্যের মধ্যে খাড়ির মাঝে ডিঙি বেঁধে রেখে সারা রাত কাটিয়েছে ছই-এর ওপর বসে।

ধনপতির কাছে বাদাবনের রাত্রির তুলনা নেই। ওর ভাষায় 'বাদার মধ্যে খাড়িতে ডিঙি রেখে রাত কাটানো আমার একটা নেশা। এ নেশায় যারে পেয়েছে তার আর 'ছাড়ান' নেই। তারপর যদি 'চান্নি' রাত হয়, সে রাতে হুরীপরীরা নেমে আসে বাদাবনের রাজ্যে। আমার কাছে সে এক সগ্য। সবাই বলে বাদায় যম লুকিয়ে থাকে। জলে কুমির, হাঙর, কামট আর ডাঙায় বাঘ বাবা, বুনো শুয়োর, সাপ—একবার তেনাদের মুখে পড়লে

আর রক্ষে নেই।' আমি বলি ওসব বাজে কথা—মনটারে ঠিক রেখে ওদের ভালোবাসতে জানলে ওরা কোনো ক্ষেতি করে না। ও রাজ্যিটা যাদের, সেখানে গেলে তাদের মান রেখে চলতি হয়। বাদায় গে বাঘ বাবারে মারবো মনে করলে বাঘ বাবা কি আমারে সুনজরে ছাখবে। ছাখবে না। বাঘের রাজ্যিতে গেলে, সেখানে তেমন করে থাকতি হয়। তাতে তারা কোনো ক্ষেতি করে না। বাদাবনে গেলে আমি ভয় পাই নে, সুখ পাই। তাইতো আমি বাদাবনে যাতি ভালোবাসি'।

নটবরকে যেবার প্রথম বাদায় নিয়ে আসে, সেবারে নটবরকে এসব কথা শুনিয়ে তবে তাকে রাজী করিয়েছিল ধনপতি। যদিও শেষপর্যন্ত তাকে একথাও বলতে হয়েছিল, 'আমার জান থাকতে তোমারে কেউ খতম করতি পারবে না খুড়ো। মালকাঠ-ঝাঁকা' ধনপতির কথা বিশ্বাস করো না করো, তার হাত দুটোরে বিশ্বাস করতি পারো। সে হাতে একটা বল্লম কিংবা গরানের কোঁড়া থাকলে বাদাবন জয় করতি না পারলেও একটা কিছু করতি পারে।'

এসব কথার পরে নটবর আর আপত্তি করেনি। ধনপতির সঙ্গে এসেছিল দক্ষিণে সুন্দরবনে।

শেষ রাতে ভাঁটার টানে ধনপতির ডিঙি এসে পৌঁছলো বিন্থা পেরিয়ে বাঘনা-রায়মঙ্গলের মুখে।

বাঘনার এপারে আবাদ, জঙ্গলের অফিস, ওপারে কসাড় জঙ্গল। দক্ষিণ-পূব কোণ ঘেঁষে রায়মঙ্গলের মুখ। কালিন্দীর মূল স্রোত বেরিয়ে গেছে উত্তরে। আর আড়াআড়ি ভাবে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে বাঘনা নামে গাঙ।

বাঘনা অফিসের সামনে ডিঙি গেরাবি করে রাখলো ধনপতি।' 'রেতে ভাঁটায়' স্রোতে ডিঙি ভাসিয়ে হাল ধরে বসেছিল ধনপতি। নটবর ঘুমিয়ে পড়েছিল ভাঁটা লাগার আগেই। ধনপতিকে বলেছিল ভাঁটা লাগলে তাকে ডাকতে। কিন্তু ঘুমন্ত মানুষকে ডাকেনি ধনপতি। স্রোতের টানে ডিঙি ভাসিয়ে সে একাই হাল ধরে এসেছে এই পর্যন্ত।

ডিঙি গেরাবি করে গলুই-এর ওপর মাদুর বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়ে ধনপতি। পরিশ্রমে অবসন্ন দেহ, মাদুরের ওপর দেহ এলিয়ে দিতেই ঘুম-ঘুম তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ঘুম আসতে যেটুকু দেরি—ধনপতি অবসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাতের আকাশের দিকে। চাঁদ ডুবে গেছে অনেক আগে, আকাশে এখন শুধু

অগুনতি নক্ষত্র। সেই নক্ষত্র রাশির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ধনপতির চোখে ঘুম নামে। গাঢ় ঘুম। বাকি রাতটুকু শেষ হয়ে যায় গাঢ় ঘুমের মধ্যেই।

আজানের সুরে ঘুম ভেঙে যায় ধনপতির।

পাশেই ধান বোঝাই কিস্তির মাঝি আজান দিচ্ছে। আজানের সুর বাতাসের তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে যায় গাঙের এপার ওপার।

ঘুম-ভাঙা চোখ মেলে ধনপতি ফিরে চায় আকাশের দিকে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। এখনো দু'চারটে নক্ষত্র ফুটে রয়েছে। তার মধ্যে পশ্চিম দিগন্তের কোণে একটা নক্ষত্র এখনো জ্বলজ্বল করছে।

পূবদিকে রায়মঙ্গলের মুখ। পূব-আকাশে রক্তিম স্পর্শ। ধনপতি ফিরে চায় পূব আকাশের দিকে। কতদিন পর আজ আবার বাদা-বনের দেশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখবে।

সূর্য উঠছে। ধনপতি উঠে দাঁড়ায় ডিঙির মাথায়। ভোরের বাতাসে ওর মাথার বাবরি চুলগুলো উড়ছে।

ধনপতির দৃষ্টি গভীর—উদাস। এই সূর্যোদয়ের মুহূর্তে ও আজ আবার নতুন করে জীবনের শপথ গ্রহণ করবে।

সূর্য উঠলো। কিন্তু পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে সূর্য দেখা দিল না। দিগন্তের কোণে টুকরো মেঘের আড়ালে সূর্যকে ভাঙা-ভাঙা মনে হলো। তবু তার আলোর রথ ছুটে এলো পৃথিবীতে। সে আলো এসে পড়লো ধনপতির চোখে-মুখে। সে আলোয় ঝলমল করে উঠলো নোনা গাঙের টলমল বুক, সে আলোয় হেসে উঠলো নদী পারের বাদাবন।

জোয়ারের জল এখনো ফুলে ফুলে উঠছে নদীর বুকে। নদীর এপার-ওপার জোয়ারের জলে ভরে গেছে। জোয়ারের জল ঢুকছে নদী-পারের বাদাবনের মধ্যে।

—খুড়ো, খুড়ো—অ খুড়ো, গলাফাটা চিৎকার করে নটবরকে ডাক দেয় ধনপতি।

নটবর ঘুমোচ্ছিল, ধড়মড় করে উঠে বসে। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি হলো রে, চেল্লাস কেন?

—আরে ওঠো, সকাল হয়ে গেছে। এত ঘুম তোমার?

বাঘনার গাঙ সোজা চলে গেছে বাদাবনের মধ্যে।

আঙুলের নিশানায় গাঙ দেখিয়ে ধনপতি বলতে থাকে, ওই গাঙ দে আমরা যাবো খুড়ো—অনেক দূর যাবো।

ভাঁটার টানের অপেক্ষায় রইলো না ধনপতি। ভরা জোয়ারেই ডিঙির গেরাবি তুলে উজান বেয়ে চললো বাঘনা গাঙের বুকের ওপর দিয়ে।

গাঙের এপারে জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে অজস্র খাড়ি রয়েছে মাকড়সার জালের মত ছড়িয়ে।

ধনপতি ওই সব খাড়ি দিয়ে কতবার কসাড় জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছে। সেখানে ডাঙায় বাঘ আর জলে হাঙর, কুম্বির, কামট। জোয়ারের জলে খাড়িগুলো ছাপিয়ে যায়, সে জল জঙ্গলের কতক অংশের মাটি ডুবিয়ে দেয়। জোয়ারে খাড়িগুলোকে অনেক চওড়া মনে নয়। তীরের গাছপালার ডালগুলো ছুঁয়ে থাকে খাড়ির জল। আবার ভাঁটার টানে সে জল নেমে যায় অনেক নিচে। জঙ্গলের ভিজে মাটি স্যাঁতস্যাঁত করে—আর সেই স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপর কিলবিলিয়ে বেড়ায় নোনাপোকা, কাঁকড়া। কাদা-খোঁচা পাখি, বক সেই কাদার ওপর নোনাপোকাগুলো ধরে ধরে খায়। মাছমারারা হামেশাই জঙ্গলের খাড়িতে আসে মাছ মারতে। তবে কসাড় জঙ্গলের মধ্যে তারা বড় একটা যায় না। ভরা জোয়ারে ছোট ছোট খাড়ির মুখে জাল পেতে রাখে জেলেরা। তারপর ভাঁটার টানে জল নেমে গেলে ছোট ছোট খাড়িগুলোর একেবারে তলা পর্যন্ত বেরিয়ে যায়, তখন জালের মুখে আটকেপড়া জোয়ারে ওঠা নোনা-মাছ ডিঙির খোলে ভরে রাখে। তবে জঙ্গলের খাড়িতে মাছমারার মতো সাহসী জেলে-মালো সংখ্যায় খুবই কম। এ সব জায়গায় মাছ মারতে আসা জীবন হাতে করে। বড়-দেবতা অর্থাৎ বাঘের হাতে পড়লে আর রক্ষে নেই। মা-বাপের নাম স্মরণ করার আগেই সব শেষ।

অনেকদিন আগে একবার মাছমারার দলের সঙ্গে মরশুম-চুক্তিতে ডিঙি নিয়ে দক্ষিণে সমুদ্রের কাছে মেছুয়াগাঙে গিয়েছিল ধনপতি। সেবারে যেন মাছের মরশুম। এক জোয়ারে খাড়ির মুখে জাল পাতা মানে দশ-বিশ মণ মাছ। যত মাছ উঠতো, সে পরিমাণ বরফ জোগান দিতে পারতো না মহাজন। পঁচিশ-তিরিশটা মাছমারা ডিঙি, আর একটা লঞ্চে সেই মাছের চালান। লঞ্চ বোঝাই বরফ আসতো, সেই বরফ চাপা দিয়ে মাছ চালান যেত কলকাতায়। চিংড়ি, চাঁদা, খয়রা, গুলে থেকে কত রকমের মাছ। আকারে তেমন বড় না হলেও

সবচেয়ে সুন্দর দেখতে ছিল রংকুলি মাছগুলো। সোনা রঙের মাছ, আর পালকগুলো লালচে। জাল থেকে তোলার আগেই সে মাছগুলো মরে যেত। বড় ঠুনকো প্রাণ সেই রংকুলি মাছের।

বাদাবনের দেশে এলে পুরনো কথা মনে পড়ে ধনপতির। এই বাদাবন নিয়ে অজস্র কথা-গল্প জমা হয়ে আছে তার জীবনে। অলস-অবসরে সেইসব কথা স্মরণ করে সে।

একটানা উজানে দাঁড় টেনে বাঘনার বাদার পারে এলো ধনপতি। এপারে কসাড় জঙ্গল। গরান, গর্জন, গেঁয়ো, কেওড়া, কাকড়া গাছের বিচিত্র বিন্যাস। মাঝে মাঝে হেতালের ঝোপ, নোনা ঘাস জন্মে আছে কোথাও। নোনা ঘাস ডুবে গেছে জোয়ারের জলে। কোথাও কোথাও কচি ডগাগুলো জেগে আছে।

আশ্চর্য। নিত্য জোয়ারের জলে ডুবে যায় ওই নোনা ঘাস। ভাঁটার টানে জল নেমে গেলে আবার জেগে ওঠে। শুধু ওদের সবুজ অঙ্গে লেগে থাকে আলগা পলির প্রলেপ। এরই মধ্যে ওরা রোদের আঁচ থেকে সংগ্রহ করে নেয় প্রাণশক্তি। তারই মধ্যে ওদের শিকড়ের গিঁট থেকে নতুন শিশু-ঘাস জন্মায়। দুদিনের মধ্যে সে ঘাসগুলো আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

ওই কচি ঘাসের ডগাগুলো খেতে ভালোবাসে হরিণেরা। ওই কচি ঘাসের লোভেই ওরা ছুটে আসে দল বেঁধে। এই গহন অরণ্যের মধ্যে ওই ঘাসগুলো নদীপারের দিকেই বেশি জন্মায়। গহন অরণ্যের মধ্যে অমন ঘাস দুর্লভ।

বাদার পারে আসতে না আসতেই ভাঁটার টানে জল নামতে আরম্ভ করেছে। দাঁড়-টানা বন্ধ করে ধনপতি বসে আছে বাদার দিকে চেয়ে। নটবর হাল ধরে ডিঙির গতিটা ঠিক রেখেছে। বাদার পাড় থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত ব্যবধান বজায় রেখে ডিঙি চলেছে। কিন্তু ধনপতির হাতে হাল থাকলে ও চলতো বাদার পাড় ঘেঁষে। বাদাবনে ঢুকলে ও সব হিসেব হারিয়ে ফেলে। ও ভুলে যায়, বাদার পাড়ে হেতাল ঝোপ কিংবা গোলবনের আড়ালে আড়ালে বাঘেরা ওৎ পেতে থাকে। ও ভুলে যায়, নদীপারের গাছের শাখায় শাখায় জড়িয়ে থাকে নির্মম সরীসৃপ, যাদের একটি ছোবল একটি মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট।

ভয় যে কী, ধনপতি তা জানে না। তবে যখন সওয়ারী থাকে তখন ওর যত চিন্তা ডিঙির সওয়ারীদের জন্যে। নিজের জন্যে কখনো কিছু ভাবে না। ভাবতে জানে না।

মৃত্যুর কথা উঠলে বলে, 'মরণ, ও তো হবেই। সবার পথ আটকানো যায়, কিন্তু যমের পথ বন্ধ করা যায় না। যম বড় তুরন্ত দেবতা।'

বছর তিনেক আগের একটা ঘটনা। শীতের দিনে পাখিরালায় এসেছিল ধনপতি। একা। উদ্দেশ্য ছিল 'চান্নি' রাতে জঙ্গল দেখার।

সুন্দরবনের মধ্যে পাখিরালার জঙ্গলটাই যেন সবচেয়ে সুন্দর। পাখিরালায় সরকারী জেটির ওপর দাঁড়ালে এক নজরে পুরো পাখিরালা কেন, সুন্দরবনের একটা অংশ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। লোকে বলে, পাখিরালা নাকি শিকারীর স্বর্গ। কিন্তু ধনপতি বলে, 'শিকার করতি যারা আসে তারা শুধু পাখি আর হরিণ খুঁজেই মরে। পাখিরালার জঙ্গলের রূপ তারা দেখতি পায় না। তা যদি পেতো তাহলে শিকার করার কথা ভুলেই যেত তারা। পাখিরালার রূপে মজলে শিকার করা যায় না।' শুধু তাই নয়, সুন্দরবনের শিকারীদের কথা নিয়ে সে বলে 'সোন্দরবন যদি দেখতি চাও, তা হলি শিকার করতি যেও না।'

যতবারই সুন্দরবনে এসেছে ধনপতি, যাওয়া-আসার পথে একবার না একবার ঘুরে গেছে এই পাখিরালা। সেবারে শুধু পাখিরালায় বেড়াতে এসেছিল ধনপতি। সজনেখালির জঙ্গলের অফিসের কাছে পৌঁছেছিল সন্ধ্যেবেলা। জঙ্গলের অফিসের লোকেরা তাকে মানা করেছিল রাতের বেলায় পাখিরালায় যেতে—কিন্তু তাদের কথায় কান দেয়নি ধনপতি। অফিসের অনেকেই চিনতো ধনপতিকে, তাই তার ভালো চেয়েই তারা নিষেধ করেছিল। একগুঁয়ে ধনপতি, কোনো কথায় কান না দিয়ে দাঁড় টেনে ডিঙি নিয়ে চলা শুরু করেছিল পাখিরালার দিকে।

সে রাত ছিল রাসপূর্ণিমার।

গাঙ-দেশের আকাশের প্রান্তে সন্ধ্যা লগ্নেই সোনালা চাঁদ দেখা দিয়েছিল সে চাঁদের আলোয় ঝলমল করছিল গোটা গাঙদেশ, বাদাবন—সব কিছু।

নদীতে তখন ভরা জোয়ার, তারপর পূর্ণিমার টান। গাঙের একুল ওকুল ভেসে গিয়েছিল ভরা-জোয়ারের জলে। আর খাড়িগুলোর তু-কুল ছাপিয়ে জোয়ারের জল ঢুকেছিল বাদাবনের ভিতরেও।

পাখিরালার সরকারী জেটির মুখে ডিঙি বেঁধে ধনপতি একবার একনজরে

চেয়েছিল চারদিকে। তারপর কাঠের জেটির ওপরে উঠে ছু'চোখে অফুরন্ত বিস্ময় নিয়ে 'চান্নি' রাতের পাখিরালার সৌন্দর্য দেখেছিল।

হেমন্তের শিশির-ধোয়া পাখিরালার সবুজ বন। তার ওপর পড়েছে চাঁদের আলো। শিশির-ভেজা পাতায় পাতায় জ্যোৎস্নার মাখামাখি। ধনপতির ভাষায় 'সে রূপের তুলনা নেই। পাখিরালার দিকে সে চান্নি রাতে তাকিয়ে ত্থাখলাম—মনে ভাবলাম, কোন্ ভোজবাজীর খেলোয়াড় এই বনের রাজ্যে সাত-রাজার ধন মণিমুক্তো ছড়িয়ে দেছে! সে খেলোয়াড় পাকা খোলায়াড়। নয়তো অমন খেলা খেলতি পারে!'

সে রাত ধনপতির জীবনে অবিস্মরণীয়। কথনো ভুলবে না সে। প্রায় সারা রাত সে ঠায় দাড়িয়েছিল পাখিরালায় সরকারি জেটি ওপরে। দেখেছিল তার কল্পনার পাকা খেলোয়াড়ের যাত্নকরী-খেলা। শুনেছিল, রাতজাগা পাখির কাকলি, হরিণের ডাক, বুনো শূয়োরের ঘোঁতঘোঁত, বানরের কিচির-মিচির। তারপর শুনতে পেয়েছিল এই জঙ্গলের রাজ্যের রাজা বাঘের ডাক।

জেটির অদূরেই হরিণ চরার ক্ষেত্র। ছুটো খাড়ির মুখে ত্রিভুজের মত খানিকটা জায়গা সবুজ ঘাসে ঢাকা। গভীর রাতে একদল হরিণ এসেছিল সেই ফাঁকা জায়গায়, জ্যোৎস্না-ধোয়া রাতে তারা খেলায় মেতেছিল।

জেটির ওপর থেকে ধনপতি অবাক হয়ে দেখছিল সেই হরিণ-হরিণীর খেলা। দেখতে দেখতে হঠাৎ শুনতে পেল বানরের কিচির-মিচির। বানর-ডাকার সঙ্গে পাখিরাও জেগে উঠলো। পাখিরালার নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল। খেলা বন্ধ হলো হরিণ-হরিণীর। ফিরে তাকালো এদিক-ওদিক। তারপর ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে জঙ্গলের দিকে তাকালো। ঠিক সেই মুহূর্তে নিঃশব্দ চরণে রাজা বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়লো হরিণদলের ওপর। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাঘের ঝাঁপিয়ে পড়ার মুহূর্তে পলকের মধ্যে গভীর বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল সেই হরিণ-হরিণীর দল। নিষ্ফল আক্রোশে গর্জন করে উঠলো রাজা বাঘ। তারপরেই গাছের মগডালে-বসা বানরের দল একসঙ্গে কিচির-মিচির শুরু করে দিলে।

সেই গভীর রাত্রে ধনপতি সে-দৃশ্য দেখে হো হো করে হেসে উঠেছিল।

অরণ্য-রাজ্যে গভীর রাত্রে মানুষের উচ্চকণ্ঠের হাসিতে সেই রাজাবাঘও কেমন বিস্মিত হয়েছিল। সে-ও তার গোলার মত ছুটি চোখে বিস্ময় মিশিয়ে ফিরে দেখেছিল সরকারী জেটির ওপরের দিকে। যেখানে দাঁড়িয়ে হো হো করে হাসছে মোল্লাখালির মাল-কাঠ-ঝাঁকা ধনপতি মাঝি।

নিজের হাসিতে নিজেই যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিল ধনপতি। তারপর জেটির নিচের দিকে তাকাতেই তার চোখে কেমন যেন ধাঁধা লেগে যায়। ডিঙি বাঁধা ছিল জেটির একটা খুঁটিতে। অথচ ডিঙিটা সেখানে দেখতে পেল না।

পূর্ণিমার চাঁদ তখন পশ্চিম দিগন্তে। তার অস্ত যাওয়ার সময় হয়ে এলো। জেটির নিচের দিকে নেমে এলো ধনপতি। দেখতে পেল কাছির খানিকটা অংশ তখনো তেমনি বাঁধা রয়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ধনপতি বুঝতে পারে আসল ঘটনা। ভরা জোয়ারে জেটির ওপরে জল উঠেছিল। কাছি টান করে বাঁধা ছিল ওপরের খুঁটিতে। তারপর ভাঁটায় জল নেমে যেতে ডিঙিটা সেই সঙ্গে নামতে থাকে। টানাকাছি···শেষ পর্যন্ত ডিঙিটা জলের স্পর্শ না পেয়ে ঝুলে পড়ে। কিন্তু ডিঙির ভার সইতে পারবে কেমন করে এই পাকানো পাটের দড়ির কাছি, ছিঁড়ে গেছে।

কিন্তু ডিঙিটা কোথায়! এদিক-ওদিক ফিরে তাকায় ধনপতি। শেষটা তার নজরে পড়ে অনেক দূরে—একটা বড় খাড়ির মুখের কাছে ডিঙির মতো কি যেন একটা আটকে আছে। কিন্তু ওখানে যাবে কেমন করে!

যা হয় হবে, জেটির পাটাতন থেকে টেনে হিঁচড়ে একটা গরানের কোঁড়া খুলে জেটির ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে ডাঙায়। ওপর থেকে নিচে নরম পলিমাটির কাদার ওপর লাফিয়ে পড়েই চলতে আরম্ভ করে ধনপতি। কিন্তু ডাঙা দিয়ে দ্রুত চলার উপায় নেই। মাটির ওপর সূঁচের ধার নিয়ে মাথা তুলে আছে শূলো। দেখে দেখে চলতে হয়, নয়তো পায়ে বিঁধে গেলে একেবারে রক্তারক্তি ব্যাপার। শূলো আর কিছু নয়, এই বাদাবনের গাছের শিকড়। ওগুলো মাটির নিচে যায় না। মাটির ওপর জেগে থাকে খানিকটা উঁচু হয়ে। শূলোর মুখগুলো এমন ছুঁচলো, বনের জন্তু-জানোয়াররাও এর ওপর দিয়ে দ্রুত চলতে পারে না।

ভাঁটার টানে জল নেমে গেছে নিচে। নদীর পাড় অনেকখানি বেরিয়ে পড়েছে। নদীর একেবারে কিনারা ঘেঁষে চলতে আরম্ভ করে ধনপতি। কিনারার দিকে শূলো অনেক কম।

অবশেষে খাড়ি-পারে পৌঁছলো ধনপতি। পারে দাঁড়িয়ে দেখতে পায়, খাড়ির পারে নদীর মুখের কাছে গাছের শিকড়ে আটকে আছে তার ডিঙি। কিন্তু এ-খাড়ি পার হবে কেমন করে?

বিপদকে ডরায় না ধনপতি, মৃত্যুকে পরোয়া করে না। তারপর চিন্তা করেও যার কূল পাওয়া যাবে না তেমন চিন্তায় লাভ কি ?

সেই শীতের মধ্যে খাড়িতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধনপতি। যদি হাঙর কুমিরে খায়—খাবে, তবু নীরবে ভয়ে জুজুবুড়ির মতো দাঁড়িয়ে থাকার লোক সে নয়।

অনায়াসে সাঁতরে খাড়ি পেরিয়ে ধনপতি তার ডিঙিতে চেপে বসলো। শিকড়ে হাত নিয়ে ডিঙি ঠেলে দিতেই, টাল খেয়ে ডিঙিটা গাঙের বুকে ভেসে গেল। তারপর ভাসা-ডিঙির গলুই-এর কাছে দাঁড়িয়ে ধনপতি নিজের খেয়ালে আরো একবার হেসে উঠলো।

সেদিন যেমন নিজের খেয়ালে হেসে উঠেছিল ধনপতি, আজ বাঘনা গাঙে চলতি ডিঙিতে বসে ঠিক তেমনি উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে সে।

ওর হাসি শুনে নটবর শুধায়, অমন করে হাসছিস কেনে ?

—একটা পুরনো কথা মনে পড়লো খুড়ো।

—তোর মনও বুঝিনে, মনে পড়াও বুঝিনে !

—তা বোঝবা কেন। আর আমার মন বুঝেই বা তোমার কি হবে। ক্ষ্যাপা ঘোড়া দেখেছো ? আমার মনটা হলো ঠিক তেমনি। আমার মনের খবর আমিই সব সময় জানতি পারিনে। বুঝলে খুড়ো, আমার ভূমিষ্টি হবার ক্ষণে বোধ হয় এক কুগ্রেহ'র নজর ছিল। নয়তো এমন বেহুদো মানুষ হয়ে জন্মালাম কেন। আমি কি যে করি, কি যে না করি তার কিছুরই ঠিক পাইনে।

—অ্যাখ ধনপতি, নটবর বলে, জ্ঞানপাপী বলে একটা কথা আছে জানিস তো, তুই হলি গে তাই।

—এবারে একটা কথার মতো কথা বলেছো খুড়ো। সত্যি, আমি হলাম গে আস্ত জ্ঞানপাপী।

বলেই আবার হো হো করে হেসে ওঠে ধনপতি। হাসতে হাসতে ফিরে চায় বাদার দিকে।

নদী পারে হেতালের বন। বন নয় কুঞ্জ। মাঝে দু'একটা কাকড়া গাছ। কাকড়া গাছগুলোর পাতা ভারি সুন্দর। রঙ-টা ঠিক সবুজ নয়, কিছু হলদে ধাঁচের। পাতার কিনারে লাল রঙ-এর শিরা। পাতার গড়ন দুর্গা প্রতিমার চোখের মতন।

দেখতে দেখতে হেতালের বন ফুরিয়ে এলো। আবার সেই গেঁয়ো, কাকড়া,

গর্জন, গরান ইত্যাদি গাছের জঙ্গল। মাঝে মাঝে শিয়ালকাঁটার ঝোপ। দু'এক জায়গায় খানিক জায়গা জুড়ে গোল-গাছ। এই গোলবন যেখানে ঘন—এ বনের রাজা বাঘেরা সেইখানে বেশি থাকে। গোলপাতা কাটতে এসে প্রতি বছর কিছু লোক মারা পড়ে বাঘের হাতে! মধু সংগ্রহকারী, কাঠুরে আর গোলপাতার কারবারী—সুন্দরবনে এরাই তো আসে মরশুমে মরশুমে। আর আসে মাছমারার দল। যত লোক আসে সবাই ফিরে যায় না। বাবা দক্ষিণ রায়, কিংবা বনবিবির ডোর সবার হাতেই থাকে, কিন্তু এ বনের রাজার কর দিতে হয়। দক্ষিন রায় বা বনবিবির ডোর সবার রক্ষা কবচ হয় না। যার ওপর কোপ থাকে, এ বনের রাজ্যে তার প্রাণটা থেকে যায়।

বাউলিরা গুণ জানে, মন্ত্র-তন্ত্র দিয়ে তারা চোখের দৃষ্টিতে যাদু আনতে পারে। আর যাদুর শক্তিতেই তারা পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় মধুর ব্যাপারী, কাঠুরে, কিংবা গোলপাতার কারবারীদের। দক্ষিণ রায় আর বনবিবির পুজো দিয়ে, মানত করে বাউলিরা দলের সঙ্গে বাদায় আসে। আশ্চর্য তাদের সাহস—সামনে রাজা বাঘকে দেখেও তারা পিছু হটে না। বাঘ নাকি ফিরে যায় তাদের চোখের সামনে দাঁড়াতে না পেরে। বনবিবি নাকি স্বয়ং ভর করে থাকেন এই সব বাউলির শরীরে। বাদাবনের দেশে বাউলদের নিয়ে কত না অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত।

এই সব লোক-চলতি ধারণার সঙ্গে ধনপতি কোনদিন মিলতে পারে না। সে বলে, 'ওসব মন্তর-তন্তর কিছু না। একটা কিছুতে বিশ্বেস আর ইচ্ছেশক্তিটা হলো গে আসল কথা।' তারপর সে আরো বলে, 'আমি তো ওসব মন্তর-তন্তর জানিনে। দক্ষিণ রায় বনবিবিরে আমি বুঝতি পারিনে, গুরু-ফুরুর বলও আমার নেই—আমি তো বাদাবনে বেড়াই নিজের মনের জোরে। মনে যদি পাপ না থাকে, সে মনের জোর অনেকখানি। কিন্তু পাপে ঘুণ-ধরা মনের কোনো জোর নেই, সে মন নে বৌরে শাসানো যায়, বনের বাঘ-শুয়োরের সামনে দাঁড়ানো যায় না।'

বাদাবনের দেশে ধনপতি তার মনের জোর নিয়ে চলাফেরা করে।

—অ ধনপতি, ধনপতিরে, নটবর বলে, এই বেগনে পুরো উজোন বেয়ে যাবি নাকি?

—তাই চলো খুড়ো। একটু বেয়ে গিয়ে কোনো খাড়ির মুখে ডিঙি বাঁধিগে

চলো। এ-বেলাটা না হয় কষ্ট করা গেল, তারপর দুপুর-বিকেল পুরো জিরেন দে রেতে ভাঁটায় ডিঙি ছাড়বানে—তুমি কি বলো ?

—তুই যা বলবি তাই হবে। নটবর একটু ইতস্তত করে বলে, কিন্তু যাবার উদ্দিশ কোথায় ? আর কি জন্যে বা যাচ্ছি ?

—ওসব উদ্দিশ-ফদ্দিশ নেই। যে কদিন ভালো লাগে থাকবো—তারপর ফিরে যাবো। বলে ধনপতি জিজ্ঞাসা করে, কেন তোমার ভয়-ডর লাগছে নাকি ?

—না, ভয়ের কথা না। বলি, যাচ্ছি তো যমের ঘরে। চাল ডাল-এর যোগাড়টা কি আছে হিসেব করতি হবে। জলের দুটো কোলা ভরা আছে—ও জল আর কদ্দিন যাবে ?

—সমশেরনগরে গেলে তো জল মিলবে। কালিচকের বাদা হয়ে ওদিকেই তো যাবো। কালকের দিনটা বাদ দে পরশুতক আমরা কালিচকে পৌছবো নিঘ্যাৎ। নেও, ওসব হিসেবকিতেব পরে হবে। এখন তড়িৎ-ঘড়িৎ বেয়ে যাই—বলে ধনপতি পুরোদমে দাঁড় টানতে আরম্ভ করে।

বাঘনার গাঙ-এর পশ্চিমের তীর ঘেঁষে ডিঙি চলেছে। এক মনে দাঁড় টেনে চলেছে ধনপতি। কাঠ-ফাটা রোদে তার মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে। গাঙের বাতাসে তার মাথার এলোমেলো বাবরি চুলের গোছা উড়ছে। সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে দরদর ধারায়। মাঝে মাঝে হাঁপ ধরে যাচ্ছে যখন, দাঁড় দুটো তুলে রেখে হাপর টানার মতো গাল দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে বুকটা ভরে নিচ্ছে। এরই মধ্যে ধনপতি ফিরে ফিরে দেখছে পারের জঙ্গলের দিকে। নিবিড় জঙ্গল। জঙ্গলের নিচে নিবিড় অন্ধকার। বন এখানে এত নিবিড়, সূর্যের আলোর একটা রেখাও সব সময়ে সর্বত্র পৌছয় না।

কিন্তু জঙ্গলের নিচেকার মাটি পরিষ্কার। জোয়ারের জল প্রতিবারই নেমে যাবার আগে পলিমাটির প্রলেপ রেখে আসে। যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সবুজ অরণ্যের প্রাণ ধারণের সত্তা। অপরিমেয় প্রাণসত্তা ওই উর্বর পলিমাটিতে। তাই তো এ-অরণ্য এত সবুজ, এত সজীব।

ধনপতি এই নিবিড় অরণ্যের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে দাঁড় ফেলতে ভুলে যাচ্ছে। পলকহীন দৃষ্টিতে দেখছে এই মনোরম অরণ্য-দেশের রূপ।

জোয়ারের কাল শেষ, এখন ভাঁটার টানে ডিঙি ভেসে চলেছে। শেষটা দাঁড়-টানা বন্ধ করেছে ধনপতি। নটবর ডিঙির হাল ধরে বসে। মাথায় জড়িয়ে রেখেছে ভিজে গামছা। এই আগুন-জ্বলা রোদের মধ্যে সেই সকাল থেকে বসে আছে সে। থেকে থেকে ভাবছে, কখন কোন্ খাড়ির মুখে ধনপতি ডিঙি গেরাবি করবে।

প্রায় মাথার ওপর উঠে এসেছে সূর্য। ঘন বাদার মধ্যে চলে গেছে বিস্তৃত-খাড়ি। খাড়ির দুপারে ঘন জঙ্গল। পারের গাছপালাগুলো খাড়ির দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

ভাঁটার টান ফুরিয়ে এলো। জোয়ারের জল আসছে খাড়িতে। আর নয়, এবারে ডিঙি বাঁধতে হবে।

খাড়ির মুখে একটা হেলে-যাওয়া কেওড়া গাছের নিচে ডিঙি বাঁধলো ধনপতি। গাছটার গোড়ার মাটি আলগা হয়ে গেছে, একেবারে হেলে পড়েছে, কোনদিন হয়তো উপড়ে পড়বে খাড়ির বুকে।

ডিঙি থেকে খাড়ির পার, পনের বিশ হাত তফাত। এই জঙ্গলের মধ্যে এ তফাতটুকু কিছু নয়। যে কোনো মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। পনেরো কুড়ি হাত অনায়াসে লাফ দিতে পারে বাঘেরা। শুধু তাই নয়, এ সব খাড়িগুলো প্রায়ই তারা সাঁতরে পারাপার করে। বড় বড় গাঙও কত সময় পেরিয়ে তারা এপারের জঙ্গল থেকে ওপারের জঙ্গলে চলে যায়। কত সময় বসতি-এলাকায় ঢুকে পড়ে।

নটবরের কেমন যেন গা ছমছম করে। ভয়ে ভয়ে সে পারের দিকে ফিরে চায়। সামনেই খানিকটা জায়গা জুড়ে গেঁয়ো, কেওড়া, গর্জন গাছের মধ্যে হেতালের ঝোপ। ঝোপের মধ্যে দিয়ে পাশাপাশি দুটি সমান্তরাল রেখার মতো সুড়ঙ্গ পথ। সুড়ঙ্গ পথের কিছু দূর পর্যন্ত দেখা যায়। তারপর অন্ধকার। জোয়ারের জল ঢোকে ওই সুড়ঙ্গ পথে। ভাঁটার টানে সে জল নেমে যায়।

নটবর ফিরে ফিরে দেখছে হেতাল ঝোপের মধ্যেকার সুড়ঙ্গপথের দিকে। যতবার দেখছে, ততবারই সে অজানা শঙ্কায় শিউরে উঠছে। ধনপতি লক্ষ্য করে তার নটবর খুড়োর কাণ্ড। হঠাৎ হো হো করে বন কাঁপানো হাসি হেসে ওঠে।

জঙ্গলের রাজ্যে এই নিস্তব্ধ দুপুরে ধনপতির হাসি অরণ্য-অঙ্গে ধ্বনি-

প্রতিধ্বনি তোলে। শান্ত-দুপুরের ধ্যান ভেঙে যায়। গাছের ডালে-বসা পাখিরা ডানা ঝটপট করে উড়তে আরম্ভ করে। অদূরে একদল বানর গাছের ডাল থেকে কিচিরমিচির করে ওঠে।

হাসতে হাসতে ধনপতি লাফিয়ে পড়ে খাড়ির জলে। সাঁতার কাটতে কাটতে কয়েকটা ডুব দেয়। তারপর ডিঙির মলম ধরে উঠে আসে পাটাতনের ওপর।

নটবর রুদ্ধ-বিস্ময়ে দেখলো ধনপতির কাণ্ড। এতটুকু ভয় নেই তার প্রাণে। এ-সব খাড়িতে যে হাঙর, কুমির, কামটের দল কিলবিল করছে।

—চান করে নেলাম। গা জুড়োলো। গামছা দিয়ে মাথা মুছে ধনপতি বলে, খুড়ো—ইচ্ছেশক্তি থাকলি কি না করা যায়। নেও—তোমার ভয় দেখে আর বাঁচিনে। তুমি রান্না চাপাও দিকিন—যা করবা এক-ঢালা করো। ন্যাকড়া বেঁধে দুচার মুঠো মুসুরির ডাল, দুটো আলু, আর খানিকটা কুমড়ো ভাতে দে দেও। প্যাজ লঙ্কা দে মাখলে তাই বেশ হবে।

—তা তো বোঝলাম। কিন্তু তোরে বলি ধনপতি, একটু সামলে চলিস। কথায় বলে, পাহাড়ের চুড়ো ভাঙে, আর তুই তো একটা মনিষ্যি-জীব ছাড়া আর কিছু নস। তোর খেয়ালের সঙ্গে আর চলতি পারিনে।

—তা আমি ভালোই জানি খুড়ো। বলে কেওড়া গাছের কচি পল্লব ভাঙতে আরম্ভ করে দেয় ধনপতি।

খানিকটা কচি পল্লব ছই-এর নিচে পেতে তার ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে ধনপতি। বলে, তোমার একতারাটা ছাও খুড়ো—শুয়ে শুয়ে বাজাই।

—তুই বাজাবি একতারা? এবারে তুই অবাক করলি আমারে, বলে একতারাটা ছই-এর বাতা থেকে নিয়ে ধনপতির হাতে দেয়।

নটবরের এক তারায় বেসুরো আওয়াজ তুলতে থাকে ধনপতি।

॥ নয় ॥

কেষ্ট নস্কর কদিন হলো শহরে গেছে জমিজমার ব্যাপারে। নতুন কেনা বিলেন জমি নিয়ে কি একটা গণ্ডগোল পাকিয়েছে, তাই কাগজপত্তর নিয়ে গেছে বসিরহাটে তারক উকিলের বাড়ি। ওখান থেকে কাজ মিটিয়ে হাসনাবাদ, হাটগাছা হয়ে ফিরবে। ফিরতে হয়তো আরো দু'এক দিন দেরি হবে।

কদিন বারুণী একা থাকতে চায়নি বলে বদনের বৌকে সঙ্গে নিয়ে থেকেছে। রোজ সন্ধ্যের পর বদনের বৌ আসে। রাত কাটিয়ে আবার ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়।

একা থাকতে ভয় নেই বারুণীর। কিন্তু একা থাকলে ভাবনা বাড়ে। রাতে ঘুমোতে পারে না। একটা যন্ত্রণা ওকে অস্থির করে তোলে। ওর যত ভাবনা, যত যন্ত্রণা সবই ধনপতিকে নিয়ে। দিনের বেলা যাহোক কাজে-কর্মে কেটে যায়, কিন্তু রাতটুকু যেন কাটতে চায় না। কেউ একজন কাছে থাকলে খানিকটা নিশ্চিন্ত, অন্য কথার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আজ চিন্তাটা এখন থেকেই শুরু হয়েছে। বদনের বৌ বলে গেছে, আজ সে আসতে পারবে না।

দুপুরে দক্ষিণের দাওয়ায় চাটাই বিছিয়ে শুয়েছিল বারুণী। ছেলেমেয়েরা ঘরের মধ্যে। দেহে অবসাদ আছে, কিন্তু ঘুম নেই বারুণীর চোখে। খাঁ খাঁ দুপুরে উঠোনের ওধারে তালগাছটার মাথার দিকে তাকিয়ে শূন্য মনে শুয়ে আছে সে। কোনো চিন্তা নেই ওর মনে—এই গ্রীষ্মের দুপুরের শূন্যতা ওর মনের চৌহদ্দি জুড়ে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল।

বারুণী উঠে বসলো। ঘর থেকে আয়না-চিরুনি বার করে চুল বাঁধতে বসলো। চুল বাঁধতে বেলা গেল। এখনো ঘর-দরজা ঝাঁট দিতে হবে, তার আগে গাঙ-চরে বাঁধা গোরু কটাকে না আনলে নয়।

গাঙ-চরে এলো বারুণী। সঙ্গে বড় ছেলে সুবল।

সুবলের ওই এক স্বভাব, গাঙপারে এলে ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়। কখনো ছুটোছুটি শুরু করে দেয় গাঙ পারে, কখনো বাঁধের নিচে দাঁড়িয়ে ঢিল ছোঁড়ে গাঙের জলে। নয়তো ভাঁটার টানে জল নেমে গেলে কাদায় নেমে মেকো আর নোনাপোকা ধরতে শুরু করে দেয়। সুবলকে তাই সব সময়ে সঙ্গে নিতে চায় না বারুণী। গাঙ পারে দাঁড়িয়ে অত ছোটাছুটি ঠিক নয়। নোনা-গাঙের পাড়ের মাটির বাঁধুনি নেই, যখন তখন ঝুপ-ঝাপ ভেঙে পড়ে মাটির চাঙ।

গোরুগুলোর খোঁটা-দড়ি তুলে দেয় বারুণী। ওদের এখন ঘরমুখো টান। নিজেরাই ঘরে ফিরবে। উঠোনের পাশে একটা জায়গা নির্দিষ্ট আছে ওদের, সেখানে গিয়ে 'ম্যাচলা' থেকে জল খাবে চুমুকে চুমুকে।

গোরুগুলো চলে যেতে বারুণী চর ছেড়ে গাঙ-পারে আলবাঁধের ওপর এসে দাঁড়ালো।

গাঙে এখন ভরা জোয়ার। টলমল করছে গাঙ। গাঙের পারে ঘুঙ্‌রুনির ওধারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকাতে বারুণীর মনে পড়ে গেল ধনপতির কথা। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দেখার ঝোঁকটা ধনপতির অনেক পুরনো।

একদিন মোল্লাখালির গাঙের ধারে দাঁড়িয়ে সূর্য-ডোবা দেখতে দেখতে ধনপতি বলেছিল বারুণীকে, বারুণী—কি রকম রঙের বাহার দেখেছো, এই রঙের বাহার বুকে ভরে নেও—দেখবে পেরাণটা এরকম রঙ-বাহার হয়ে যাবে। আমরা যত রঙ যেখানে দেখি, সব রঙ ওই সূর্যিঠাকুরের মধ্যে।'

—তাই নাকি? বিস্ময়ে বারুণী জিজ্ঞাসা করেছিল, এসব কথা তোমারে কে শেখালে?

—এসব কথা শিখতি হয় না, জানা যায়। ধনপতি বলেছিল, চোখ থাকলে তুমিও দেখতে পাবে, মন থাকলি তুমিও জানতি পারবা। এই দেখা আর জানাটা হলো—তবু, সে তোমারে বোঝাতি পারবো না।

এরপর বারুণী হেসে উঠেছিল। ধনপতি জিজ্ঞাসা করেছিল, হাসলে যে?

—ওই যে তুমি বললে, সে তোমারে বোঝাতি পারবো না।

—তুমি বিশ্বেস করো বারুণী, সব কথা সবসময় বুঝিয়ে বলা যায় না—মনে বোঝা যায়, কিন্তু কথা দে তা পেরকাশ করা যায় না। তুমি পারো তোমার মনের সব কথা পেরকাশ করতি?

—না।

—তবে? বলে হো হো করে হেসে উঠে বারুণীর দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়েছিল ধনপতি।

সেই পুরনো কথাগুলো নতুন করে বারুণীর কানের কাছে বাজে। ধনপতির সেই উচ্চকণ্ঠের হাসিও।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে বারুণী। নয়তো সূর্য ডোবার পরেও গাঙ-পারে আলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে কেন!

—মা, ঘরে যাবা না? এক-হাঁটু জলকাদা মেখে সুবল এসে দাঁড়ায় মায়ের কাছে।

বারুণী যেন চমকে ওঠে।

—ওদিকে কি দেখছিলে মা ?

—কিছু না রে। বারুণী তবুও আর একবার ফিরে চায় পশ্চিম আকাশের দিকে। তারপর সুবলের একটা হাত ধরে বলে, চল্—ঘরে যাই।

—মা, সন্ধ্যেবেলা রোজ এখানে আসবা ? গাঙের বুকের দিকে চোখ রেখে সুবল বলে, এই গাঙের ধারে বসে থাকতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। ধনপতি মামা কি বলে জানো ?

—কি !

—একদিন গাঙ-ধারে এসে আমারে বললে, ভাগনা—এই নোনা-গাঙ আমারে পাগল করে দেছে। এই গাঙ আমার মাথা খেয়েছে।

অশান্ত আবেগে সুবলকে বুকে জড়িয়ে ধরে বারুণী। চোখ দিয়ে তার দু'চারবিন্দু জলও ঝরে পড়ে।

তারপর মা-ছেলে দু'জনে গাঙ-চর পার হয়ে বাড়ির পথ ধরে।

সে রাত গেল। তারপর আরো কয়েকটা রাত আর দিন। বারুণীবালার মন থেকে ধনপতির চিন্তাটা সরে গেছে। স্বামীর চিন্তাটা ওর মন জুড়ে আজ তের দিন হলো যে-মানুষ গেছে, এখনো সে-মানুষ ফিরলো না কেন ? অসুখ বিসুখ করে নি তো! তারপর গাঙপথে রাহাজানি লেগেই আছে। যদিও যাবার সময় বলে গেছে, ফিরবার পথে হাসনাবাদ, হাটগাছা হয়ে ফিরবে আত্মীয়-কুটুম্বদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে। এমনিতে তো আত্মীয়-কুটুম্বদের ঘরে তেমন যাওয়া-আসা নেই। এই কালেভদ্রে যাওয়া। এই গরমের সময়টায় যা একটু অবসর, বৃষ্টি নামলেই কাজের চাপ। জমিতে চাষ, বীজ ধানের ব্যবস্থা, বাঁধ-ভেড়ি ঠিক রাখা—এসব করে আর অবসর মেলে না। বছরের এই সময়েই দু-দশ দিনের জন্যে আত্মীয়-কুটুম্বদের বাড়ি ঘর ঘোরা—কেষ্ট নস্কর এ রেওয়াজটা বজায় রেখেছে। কিন্তু আট দশ দিনের মধ্যে আসবো বলে তের দিন—এমন তো বড় হয় না। বারুণীর ভাবনাটা এই জন্যে।

আজ মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিল বারুণী, স্বামী সন্ধ্যের লঞ্চে ঠিক ফিরে আসবে। সন্ধ্যের লঞ্চ আসার সময় পর্যন্ত স্বামীর আশায় ছিল বারুণী, কিন্তু আজও এলো না।

সন্ধ্যের পর রান্নাঘরে ঢুকেছে বারুণী। উনুন জেলে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে

তরকারি কুটতে বসেছে। তরকারি কুটতে কুটতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল— আচমকা কেটে গেল হাতের আঙুল।

—উঃ! আপন মনে অস্ফুট আওয়াজ করে বারুণী।

—কই রে, অ বৌ!

বদনের বৌ-এর সাড়া পেয়ে বারুণী যেন হাতে চাঁদ পায়। অন্যদিনের চেয়ে আজ যেন একটু আগেই এসেছে সে।

বদনের বৌ ঘরে ঢুকলো। বারুণী তাড়াতাড়ি চালের বাতায় গোঁজা চাটাই পেতে বসতে দিয়ে বলে, বোসো।

—ও কথা বলে 'আপ্যায়িং' নাই-বা করলি রে বৌ, আমি তো তোর অপয়া সই। মনে আছে, সেই যেদিনে তোর সঙ্গে দেখা হলো!

—মনে আছে বৈকি। সেকথা কোনদিন ভোলবো না।

কাটা আঙুলের রক্ত বারুণীর কাপড়ে লেগেছে। কাপড়ে রক্তের দাগ দেখে বদনের বৌ বলে ও.ঠ, রক্ত কেন্‌রে?

—ও কিছু না—ডাঁটা কুটতে আঙুলটা কেটে গেছে।

—কেটে গেছে! তা জলে ধুয়ে একটু চুন লাগিয়ে ন্যাকড়ার ফালি দে বেঁধে ফ্যাল। কই দেখি কতটা কেটেছে?

বারুণীর কাটা আঙুল দেখে বদনের বৌ বলে, ও মা—এ যে একেবারে চাক্‌লে উঠে গেছে—তুই কি রে, চুপ করে বসে রইছিস!

কাটা আঙুল নুন জলে ধুয়ে, চুন দিয়ে বেঁধে দিলে বদনের বৌ। বারুণী ফের এসে বসলো উনুনের পাশে। বদনের বৌ আরম্ভ করে তরকারি কুটতে। তারপর রান্নাঘরে বসে দুজনে গল্প শুরু করে দিলে। নানা রকমের গল্প।

কথা আর গল্পের মধ্যে ভাত তরকারি রান্না শেষ করলে বারুণী। কোলের ছেলেটা 'হেঁদলা'য় ঘুমোচ্ছিল, উঠে পড়েছে এর মধ্যে। ন'মাস বয়স ছেলেটার, ভাত খাবার জন্যে 'হামাইঝোড়ে'। বদনের বৌ ছেলেটাকে নাড়াচাড়া করে প্রায়ই বলে ছেলেটা চোখলোমোখলো হবে'।

গরমভাত নুন, ফেন মেখে কোলের ছেলেটারে খাওয়ালো বারুণী। তারপর কোলের ওপর ঘুম পাড়িয়ে ছেলেটারে আবার শুইয়ে দিয়ে এলো 'হেঁদলায়'। এরপর আর ছেলে-মেয়েদের খাওয়ার পালা।

বারুণীর ছেলে-মেয়েরা সবাই শান্ত। খেয়েদেয়ে যে যার মতো পাতা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

বারুণীর তেমন রুচি ছিল না আহারে, তবু পাত পেতে দুটো ভাত বেড়ে নিয়ে খেলে। বদনের বৌ দু' একদিন রাত্রে শখ করে এখানে খায়, আজও খেল।

খাওয়ার পর দক্ষিণের দাওয়ায় মাদুর পেতে বসলো দুজনে। সুখ-দুঃখের কথা বলতে বলতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলেও, ওরা কেউ শুতে যাবার নাম করে না।

কথা বলতে বলতে বারবার হাই তুলছে বারুণী, তবুও কথায় ছেদ টানার নাম নেই। আর বদনের বৌও পা ছড়িয়ে দেয়াল ঠেস দিয়ে শুনছে বারুণীর কথা, আর মাঝে মাঝে নিজেও এক-আধটা কথা বলছে।

রাত বাড়ছে, সেদিকে হুঁশ নেই কারো। কথা, গল্প যেন লতায় পাতায় ছড়িয়ে যাচ্ছে। এক কথা থেকে আর এক কথা। কথার শেষ নেই।

আজকের সব কথাই বারুণীর কথা। তেরদিন হলো তার স্বামী বাইরে গেছে, এতদিন দেরি হবার কথা নয়, অথচ দেরি হচ্ছে কেন—এই নিয়েই তার যত কথা। বদনের বৌ বলে, নিশ্চয়ই সে কাজে কর্মে আটকে পড়েছে, তাই ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে। তবু বারুণীর মন থেকে থেকে কল্পিত দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে। ভাবে, নাইবা এলো একটা চিঠিতো দিতে পারতো।

গরমের রাত। সন্ধ্যের দিকটা যাও-বা ফুরফুরে বাতাস বইছিল, একটু রাত হতেই বাতাস বন্ধ হয়ে গেল। এই গুমোটে ঘরের তিষ্ঠোনো দায়, তাই ঘরে না গিয়ে বাইরের দাওয়ার মাদুরের ওপর শুয়ে রইলো বারুণী আর বদনের বৌ।

বদনের বৌ কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েছে। একসময় বারুণীও ঘুমিয়ে পড়ে। ঘরে যাবার কথাটা মনেও আসে না কারো।

মাঝরাতে বারুণীর ঘুম ভেঙে যায়। কোলের ছেলেটা কাঁদছে ককিয়ে। তাড়াতাড়ি উঠে যায় বারুণী। দোলা থেকে ছেলেটাকে কোলে তুলে মাই দিতে তবে চুপ করে। খানিক বাদে ছেলেটা আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এবারে আর দোলায় নয়, বিছানা পেতে ছেলেটাকে শুইয়ে দেয়। তারপর বাইরে গিয়ে বদনের বৌকে ডেকে তোলে।

রাতভোর বাইরে থাকা ঠিক নয়, দু'জনে ঘরের মধ্যে এসে পাশাপাশি শীতলপাটির শয্যায় শুয়ে পড়ে। বদনের বৌ-এর যেমন শোয়া তেমন ঘুম। কিন্তু বারুণীর মনে তখনো দুশ্চিন্তার জের। সেই জের টানতে টানতে ঘুম এলো শেষ রাতে। বাকি রাতটা ফুরিয়ে যায় গাঢ় ঘুমের মধ্যে।

পরদিন।

সকাল থেকে আকাশে মেঘ জমতে শুরু হয়েছিল। দুপুরের দিকটা সে মেঘ খানিক সময়ের জন্যে ঝোড়ো বাতাসে উড়ে গিয়েছিল। বিকেলের দিকে আবার পশ্চিম আকাশে মহিষে রঙের মেঘ জমতে শুরু হয়। দেখতে দেখতে সে মেঘ অর্ধেক আকাশ ঢেকে দিল। বাতাসও বন্ধ হয়ে গেল সেই সঙ্গে।

আকাশের দিকে ফিরে তাকালো বারুণী। ঝড়-বৃষ্টি নামবে হয়তো। গাঙ-চরে বাঁধা রয়েছে গোরু-বাছুর। এখনি না নিয়ে এলে বৃষ্টি এলে আর বেরোতে পারবে না। ডেকেও সাড়া পেল না সুবলের। বোধহয় পাড়ায় বেরিয়েছে। আঁটসাট করে শাড়ি ফিরিয়ে পরে, হনহন করে গাঙ-চরের দিকে চললো বারুণী।

বাড়ি থেকে গাঙ-চর সামান্য পথ। গাঙ-চরে পৌঁছেই বাঁধা গোরু-বাছুর-গুলোর খোঁটা দড়ি খুলে দিলে। কথায় বলে, ঘরমুখো গোরু—গাঙ-চর পেরিয়ে আলের ওপর দিয়ে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ছুটে চললো।

আকাশের দিকে ফিরে তাকালো বারুণী। কালো মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ। মেঘের কোল ঘেঁষে একদল চিল চক্রাকারে উড়ছে।

শোঁ শোঁ শব্দ উঠছে। ঝড়ের সংকেত। থমথম করছে ভরা গাঙ। মাঝদরিয়া বরাবর কটা ডিঙি চলছিল, আকাশের অবস্থা দেখে যে-যার কূলে পাড়ি জমিয়েছে। ঝড় আসার আগেই পারে পৌঁছবে বলে শক্ত-হাতে দাঁড় বাইছে ওরা।

মেঘ দেখে বারুণীর মনটা যেন আর এক জগতে হারিয়ে গেছে। ভুলে গেছে, সে কেষ্ট নস্করের বৌ, ভুলে গেছে তার জন্যে ঘরে অপেক্ষা করে রয়েছে চারটি ছেলেমেয়ে। হঠাৎ যেন সে পিছিয়ে পড়েছে অনেকদিনের হারিয়ে যাওয়া এক জীবনে। যে জীবনে সে ছিল মোল্লাখালির গুরুপদ হাউলির কিশোরী কন্যা।

ঝড় এলো। নোনা-গাঙ পাগল হয়ে উঠলো মুহূর্তে। বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো গাঙের পারে। নুনে জর-জর পাড়ের মাটির চাঙড়া খসে খসে পড়লো।

বারুণীবালা ঠায় দাঁড়িয়ে মাতাল গাঙের দিকে চেয়ে। ঝোড়ো হাওয়ায় ওর শাড়ির আঁচল উড়ছে, উড়ছে ওর চুলের গোছা। অমন ক'রে গাঙের বুকের দিকে চেয়ে কী দেখছে ও।

হঠাৎ বারুণীর দৃষ্টি যায় দূরে। গাঙের মাঝদরিয়ায় উথালি-পাথালি ঢেউ-এর

ওপর ওঠা-নামা করছে একটা ডিঙি। ঝড়ের মুখে পড়েও মাঝদরিয়ার ডিঙি পারে নিয়ে যায়নি—কে এমন সাহসী মাঝি!

ধনপতির কথা মনে এলো বারুণীর। মনে হলো, ও ডিঙি নিশ্চয়ই তার। নয়তো ঝড়ের ভাব দেখেও ডিঙি পারে নিয়ে যায় না, মাঝদরিয়ায় ভেসে চলে, এমন মাঝি এদেশে কোথায়!

বারুণী যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছে। ছুটে যায় গাঙের দিকে। উথালি-পাথালি করছে গাঙ। ডিঙিটা অনেক দূরে। পারে দাঁড়িয়ে তো মাঝদরিয়ার ডিঙির মাঝিকে চিনতে পারা যাবে না।

বারুণী তবু সেই ঝড় মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নদী পারে আল-বাঁধের ওপর। চোখের সামনে, পায়ের কাছে আছড়ে পড়ছে নোনা গাঙের ঢেউ।

দেখতে দেখতে বৃষ্টি নামলো মুষলধারায়। বড় বড় ফোঁটা পড়তে লাগলো মাটিতে। আকাশে মেঘ ডাকলো, বিদ্যুৎ চমকালো। দেখতে দেখতে আকাশের মেঘ যেন আরো ঘন হয়ে এলো। বেলা থাকতে অন্ধকার নামলো।

সেই জল-ঝড়ের মধ্যেও গাঙ পারে দাঁড়িয়ে রইলো বারুণী। দৃষ্টি তার দূরে, গাঙের মাঝদরিয়ায়। জল ঝড়ের মধ্যে ডিঙিটা ঠিকই এগিয়ে আসছে মাতাল ঢেউ-এর বাধা পেরিয়ে।

প্রচণ্ড শব্দে মেঘ ডেকে উঠলো। হঠাৎ আলোর ঝলকানি লাগলো বারুণীর চোখে মুখে। হারানো মনটা সে ফিরে পায় এতক্ষণে। আর কালক্ষেপ নয়--বারুণী গাঙ-চর পেরিয়ে জল-ঝড়ের মধ্যে একরকম ছুটেই চলে আসে বাড়ি। এসেই দাওয়ার ওপর উঠে একটা খুঁটি জড়িয়ে ধরে। নোনা গাঙের মতো ওর মনের মধ্যেও উথালিপাথালি ঢেউ।

—মা, মা গো!

সুবল এসে জড়িয়ে ধরে মাকে। মায়ের আলুথালু অবস্থা দেখে সে কেমন যেন ভয় পেয়েছে।

—তোমার কী হয়েছে মা? ভয়ে-ভয়ে সুবল জিজ্ঞাসা করে।

—কিছু হয়নি রে। বলে বারুণী ছেলেকে বুকে চেপে ধরে।

—খোকারে কোলে নেওগে, মেঘ ডাকার শব্দে সেই থেকে কাঁদতেছে।

এতক্ষণে বারুণীর কানে আসে কোলের ছেলেটার কান্না। ছুটে যায় ঘরের মধ্যে। হেঁদলায় শুয়ে একটানা কাঁদছে ছেলেটা। কেঁদে কেঁদে 'হেদিয়ে' গেছে।

ছেলেটাকে কোলে তুলে নেয় বারুণী। অনেকক্ষণ পরে মায়ের কোল পেয়ে

ছেলেটা শান্ত হয় একটুতেই। কিন্তু বারুণীর মন তখনও অশান্ত। থেকে থেকে তার মনে হচ্ছে, সেই জল-ঝড়ের মধ্যে ভেসে-আসা ডিঙিটার কথা। ওই জল-ঝড়ের মধ্যে মাতাল ঢেউ-এর বাধা পেরিয়ে ডিঙিটা পারে এসে ভিড়তে পেরেছে তো?

সে রাতে জল-ঝড় বন্ধ হলো, কিন্তু চোখের পাতা বন্ধ হলো না বারুণীর। সারারাত সেই ঝড়ের মুখে-পড়া ডিঙির কথাটাই ভাবলো। ভোরে উঠেও তার মনে রাতের চিন্তার জের। দু-এক জনকে ডেকে জিজ্ঞাসাও করলো, কাল ঝড়ের মুখে পড়ে কোনো ডিঙি সাতজেলিয়ার গাঙে ডুবে গেছে কিনা। কেউ কিছু বলতে পারে না।

বারুণী মনকে বোঝালো, নিশ্চয়ই কোনো অঘটন ঘটেনি এ গাঙে। তাছাড়া তেমন কিছু ঘটলে সে খবর ঝড়ের মুখে ভেসে আসতো। সুখবরটা অনেক সময় কানে পৌঁছয় না, কিন্তু দুঃসংবাদ ঝড়ের আগে ভেসে আসে।

দুপুরের পর। কেষ্ট নস্কর এলো।

বারুণী দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে ছিল, ঘুম-ঘুম তন্দ্রায় জড়িয়ে এসেছিল তার চোখ। স্বামীর ডাকটা প্রথমেই তার কানে পৌঁছয়নি। দ্বিতীয়বার ডাক শুনেই উঠে বসলো বারুণী। এক পক্ষ পরে বাড়ি ফিরলো কেষ্ট নস্কর। এসেই দুটো কাগজের বড় বড় মোড়ক বারুণীর সামনে রাখে। বলে, জমির গণ্ডগোল মিটে গেল বৌ। তারক উকিল ছিলেন বলে মিটলো, নয়তো ও-পক্ষকে রাজী করায় কার সাধ্যি।

---তা এগুলোয় কি?

---একটায় ছেলে-মেয়েদের জামাটামা, তোমার শাড়ি আর একটায় মেঠাই-টেঠাই আছে।

ছেলেমেয়েরা ছুটে এলো। যে যার জামাপ্যান্ট লুফে নেয়, তারপর মেঠাই-এর ঠোঙাটাও খালি হয়ে যায়। বারুণীও তার জন্যে আনা শাড়িটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, ঠাস বুননের তাঁতের শাড়ি---রঙ এমন গাঢ় লাল না হলেই যেন ভালো হতো।

---এতো সব আনতি গেলে কেন?

---জমি-জমার গণ্ডগোল মিটলো অল্পস্বল্পে---তাই ভাবলাম, তোমাদের জন্যে কিছু নে যাই।---কেমন, সব পছন্দ হয়েছে তো?

অনেকদিন পর স্বামীকে পেয়ে বারুণীর আজ খুশীর শেষ নেই। এক মুখ হাসি আর এক বুক সুখ নিয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকালো।

বেশ কিছু সময় পরে, ছেলেমেয়েরা অন্যত্র গেলে কেষ্ট নস্কর নিজে থেকেই শোনায় ধনপতির কথা। আসার পথে মোল্লাখালির লঞ্চ-ঘাটায় চা খেতে নেমে সে খোঁজ করেছিল ধনপতির। খোঁজ কেউ দিতে পারে না। কেউ বলে সে একেবারে বেপাত্তা হয়ে গেছে, কেউ বলে, চৈত্তির মাস শেষ সেই-যে সে বাদায় গেছে তারপর আর ফেরেনি। আরো শুনে এসেছে কেষ্ট নস্কর, শেষপর্যন্ত 'সন্ন্যেস' করা হয়নি তার। তারকেশ্বরে গিয়েও নাকি বাবার মাথায় জল না দিয়ে চলে এসেছে। শুধু তাই নয়, সে নাকি বলে বেড়িয়েছে, ওসব 'সন্ন্যেস' করা হল একটা বুজরুকি।

—সে কি!

বারুণী সবিস্ময়ে ফিরে চায় স্বামীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ। চমকাও কেন গো, ধনপতি হলো আস্ত কালাপাহাড় —ওর সব কিছুই বিদ্‌ঘুটে।

বারুণীবালা কিছুক্ষন চুপ করে থাকে। তারপর সে স্বামীর মুখের পরেই বলে বসে, এ্যাদ্দিন তুমি তোমার শালা আশের কথায় মেতে থাকতে, আজকাল তার 'নিন্দে বোটকারা' করতি পারলেই তুমি খুশী হও —কেন বলো দিকিন?

কেন আবার, কেষ্ট নস্কর হঠাৎ বলে বসে, আমি এ্যাদ্দিন জানতাম তার মুখের মণ্ডা আমি খেয়ে বসে রইছি। তোমার মনটারে আগে বুঝতি পারিনি, আজকাল বুঝি- ধনপতিরে তুমি আজও ভুলতি পারোনি। এখনো তুমি তার কথা ভাবো। বলতো, সত্যি কথা কিনা?

তখনকার মতো বারুণী আর কথা বাড়ালো না। চুপ করে গেল। কেষ্ট নস্করও জানে, এ কথা নিয়ে আর বেশি ঘাটানো ঠিক নয়। সে-ও নিজের কাজে বাড়ির বাইরে গেল।

কথা তখনকার মতো চাপা পড়ে গেলেও, সেই কথা উঠলো রাতে। বারুণী কথা তুললো। ভেবেছিল এ-সব কথা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে কোনো বাদ-বিতণ্ডা করবে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথা না তুলেও পারলো না।

ধনপতির ব্যাপারে কেষ্ট নস্করের কোথায় 'দাগ' লেগেছে, বারুণী সেটুকু বোঝে বৈকি। স্বামী মনে করে, বারুণীর মনটা যেন ধনপতির জন্যে। কেষ্ট নস্কর তার স্বামী হলেও, তাকে একটা মিথ্যে ফাঁকির ছলনায় ভুলিয়ে রেখেছে এতদিন

এতকাল সেই মিথ্যেটা ধরা পড়েনি কেষ্ট নস্করের চোখে। তপারচরে যাওয়ার ঘটনার দিন থেকে তার চোখটা যেন পরিষ্কার হয়ে গেছে।

এত যে নরম মন বারুণীর, সেও আজ শক্ত করে নিজের মনটাকে বেঁধেছে। সে ঠিক করেছে, সে তার জীবনের সত্যি কথাটা খুলে বলবে স্বামীর কাছে।

বারুণী বলতে লাগলো তার জীবনের কথা। যে জীবনে ধনপতি ছিল তার মনের মানুষ, সেই জীবনের কথা। কথা বলতে তার গলার স্বর বারেকের জন্যেও কেঁপে উঠলো না। সে অনর্গল বলে গেল তার এতদিনের না-বলা কথা।

কেষ্ট একমনে শুনছে। কথার মধ্যে কথা বলে বারুণীর বলায় ব্যাঘাত ঘটাতে সে নারাজ। তারিয়ে-তারিয়ে শুনছে সে বারুণীর কথা। বেশ লাগছে।

কিন্তু যত কথা বলুক বারুণী, তার মর্ম একটিই—প্রথম যৌবনে সে ভালোবাসতো ধনপতিকে। সে ভালোবাসাটা দাম পেল না সমাজের কাছে, মোল্লাখালির মানুষের কাছে। কিন্তু এই একটা কথার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকে যাওয়ার অর্থ কি? তবু বারুণী থামে না—মনের মধ্যে যত কথা আছে, সবই সে শোনাতে চায় স্বামীকে। শোনালোও।

কথার মধ্যে বারুণী মুহূর্তের জন্যেও উতলা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু কথার শেষে সে কেমন যেন উতলা হয়ে পড়লো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কথা বলছিল, হঠাৎ উঠে বসে জড়িয়ে ধরে স্বামীকে। বলে, আমাকে তুমি বিশ্বেস করো—ওগো, তোমাকেও আমি ভালোবাসি, কিন্তু সে মানুষটার ওপর ভালোবাসা ছিল বলেই তো তার জন্যি এত দুঃখ। তারে হারিয়ে আমি তোমারে পেইছি, সে মানুষটা যে কিছুই পেলে না। সে যদি বে-থা করে সংসারী হতো, তা হলি হয়তো তার জন্যি আমার মনটা এমন করে কাঁদতো না। তারেও আমি ভুলতি পারতাম। কিন্তু তারে তো ভুলতি পারিনে, সে যে বয়ে গেল আমারে না পেয়ে। আমার দুঃখুটা তো সেই জন্যে—আমার তো সব রয়েছে, কিন্তু তার যে কিছু নেই। থাকার মধ্যে আছে একটা ডিঙি আর নোনা গাঙের জল।

এর পর আর বলতে পারে না বারুণী। লুটিয়ে পড়ে স্বামীর বুকের ওপর। আকুল হয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে।

পাথরের মতো অনড় হয়ে শুয়েছিল কেষ্ট। এত'র পরেও সে বিন্দুমাত্র চঞ্চল হলো না। শুধু একবার চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে অমুচ্চকণ্ঠে বলে, আমারে একটু ভাবতি দেও—তোমার কথা তো শোনলাম, এবার একটু হিসেব করে দেখি, ভাবি—

—শোনো আমার একটা কথা, স্বামীর বুকে মুখ রেখে বারুণী বলে, তুমি তো নানান জায়গায় ঘোরো-ফেরো—সে মানুষটার জন্যে একটা মেয়ে ছাখো—ধরে বেঁধে তারে সংসারী করো। তা যদি পারো, তাহলি আমার চেয়ে সুখ আর কেউ পাবে না।

—সবই তো বোঝলাম। সে মানুষটারে পাবো কোথায়! কোন্ বাদা-বনে তারে খুঁজে বেড়াবো। তাছাড়া ও কালাপাহাড়—ওরে বাগ মানানো আমার বাপেরও সাধ্যি নেই। সে যদি কখনো আসে, তা হলি তুমি তারে সে কথা বোলো। যদি শোনে তোমার কথাই শোনবে।

—বেশ, তাই বলবো। কিন্তু আমার কথা সে শোনবে না। তারে তো জানি, হয়তো একথা বলতি গেলেই সে হো হো করে হেসে ওঠবে।

ঘুমন্ত ছেলেটা কেঁদে উঠলো। বারুণী তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিলে ছেলেটিকে। ছেলেটিকে আদর করতে করতে নিজের চোখের জল মুছে ফেলে।

এই মুহূর্তে বাইরে থেকে রাত জাগা পাখির ডাক ভেসে আসে। হয়তো কোনো বিরহী পাখির ডাক।

বুক চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বারুণী। তবু পাথরচাপা বুকটা যেন কিছুতেই হালকা হয় না।

॥ দশ ॥

আষাঢ়ের মাঝামাঝি।

ধনপতি তখনো বাদাবনের গাঙের বুকে ডিঙি নিয়ে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ঘরের কথা যেন ভুলেই গেছে সে ; যেন কোনদিন তার নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা ছিল না।

আজ এ-গাঙে, কাল ও গাঙে তারপর কখনো খালের মধ্যে, কখনো সংকীর্ণ খাড়ির বুকে—এই করেই তো ক'মাস কেটে গেল। প্রায় তিন মাস। ধনপতি ভাবে, যাক না আরো দিন, আরো মাস—বছরের চাকাটা যদি ঘুরে যায়, তাতেও ক্ষতি নেই।

বৈশাখের ঝড়-তুফান গেছে। সে ঝড়-তুফানেও ডরায়নি ধনপতি। বড় গাঙ পাড়ি দিয়েছে ঝড়-তুফানের সঙ্গে লড়াই করে, বাদার মধ্যেকার সংকীর্ণ

খাড়িতে ডিঙি গেরাবি করে রাত কাটিয়েছে। ঘুমিয়েছে বাঘের ডাক শুনতে শুনতে। কতদিন পারে ডিঙি বেঁধে মিঠে জলের সন্ধানে বাদার গভীরে গেছে সে গরানের কোঁড়া না হয় বল্লম হাতে নিয়ে। নোনা গাঙের দেশে মিঠে জল পাওয়া দায়। যেখানে যেখানে মিঠে জল, সেখানে ওত্ পেতে আছে ভয়—হিংস্র শ্বাপদ থেকে শুরু করে এ বনের সব প্রাণীই যে মিঠে জল পান করে। ভগবানের কি বিচিত্র লীলা—নোনা গাঙ, নোনা মাটি, তার মধ্যেও মিঠে জলের বরাদ্দ। এ-সব জল বন্য জন্তুর জন্যে। এ বাদাবনে যারা ডিঙি নিয়ে আসে, তারা বেশ কিছুদিনের মতো জল সঙ্গে রাখে। সে জল ফুরিয়ে গেলে তারা জলের কোলা ভরে নিতে যাবার যায় লোকালয়ে, না হয় জঙ্গলের অফিসে। নয়তো জঙ্গলের রাজ্যে মিঠে জল খুঁজতে যাওয়ার মানে যমের মুখে যাওয়া। কিন্তু ধনপতি যমকে ডরায় না। মিঠে জলের খোঁজে সে জঙ্গলের মধ্যে যাবে এ আর আশ্চর্য কি।

ধনপতির মনে এখনো বাদাবনের নেশা। এখনো সে ঘুরে বেড়াতে চায় এই জঙ্গলের রাজ্যে। কিন্তু বাদ সাধে নটবর। বাদাবনের মধ্যে থেকে তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে। তা ছাড়া কদিন থেকে তার শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। পেটের গোলমালে ভুগছে। দেহটা তার সত্যিই কাহিল হয়ে পড়েছে। সে সুযোগ পেলে ধনপতিকে ডেকে বলে. ধনপতিরে--এবারে চল, ফিরে যাই। বর্ষাটা কাটিয়ে আবার তুই আসিস। আমার শরীর আর বইছে না।

যখনই নটবর একথা বলে, তখনই ধনপতি তাকে এক কথা শোনায়, আর কটা দিন দেরি করো খুড়ো—এ্যাদ্দিন যখন থাকলাম, তখন শ্রাবণের গাঙ দেখে যাই। বাদাবন যদি দেখতি হয়, তো, দেখার মতন দেখা আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে। আর কটা দিন কাটিয়ে যাও খুড়ো। যে কটা চাল ডাল আছে, ওগুলো ফুরোলে এমনিতেই তো চলে যাতি হবে। আবার তো সেই পেটের গান্দায় ঘোরা।

—যা বুঝিস তাই কর। নটবর হতাশার সুরে বলে, দেখিস শেষটা তোর খুড়ো না অক্কা পায়।

—তুমি অক্কা পাবা এতো সহজে? ধনপতি হেসে বলে, তেমন পুণ্যি তুমি করে এসোনি খুড়ো। জীবনের খোঁটায় এখনো তুমি বাঁধা থাকবা।

নটবর এ-সব কথার পর আর কথা বাড়াতে চায় না। সে জানে, ধনপতির ইচ্ছেটাই হলো আসল, তার ওপর কোনো জারি-জুরি খাটে না। বরং ওরে বেশি কথা বলা মানে পাগলের সাঁকো নাড়া।

নটবর যতবারই ভেবেছে ধনপতিকে আর সে বলবে না ঘরে ফেরার কথা, দু' চারদিন চুপ করে থেকেছেও, তারপর আবার সে ধনপতিকে ডেকে বলেছে বাদাবন ছেড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু ধনপতির সেই এক কথা, আষাঢ় মাস যাক, শ্রাবণের দু'চার দিন হলে তারপর সে ফিরবে।

আষাঢ়ের কদিন বাকি ছিল। এ-কটা দিন যেমন করে হোক কেটে যাবে। কদিন ধরে বিহারখালের মুখে ডিঙি গেরাব করে রেখেছে ধনপতি। বিহারখাল নামেই খাল, নয়তো এটাও গাঙের মতো। তিন দিন তিন রাত একই জায়গায় ডিঙ বেঁধে বসে আছে দুটি প্রাণী।

খালের মাঝামাঝি ডিঙ গেরাবি করা। পারের দিকে না রাখাই ভালো। একে এই বর্ষাকাল, তার ওপর বর্ষায় বাদাবনের দেশ আরো ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ডাঙায় বাঘের উৎপাত, সে তো আছেই, কিন্তু সাপের উৎপাত আরো ভয়াবহ। পারের দিকে ঝুলে পড়া গাছের ডালগুলোতে যখন তখন সাপ দেখা যায়। নানা জাতের সাপ। পারের দিকে ডিঙি বাঁধা মানে, যে কোনো সময় সাপের মুখে পড়া। তা ছাড়া অন্য বিপদের ঝুঁকি তো আছেই।

কদিন ধরে একঘেয়ে বর্ষা শুরু হয়েছে। বিরাম নেই। দিনরাত ছই-এর মধ্যে বসে থাকা। বৃষ্টি যদি খানিক সময়ের জন্যে বন্ধ হয়, তো সেই ফাঁকে একটু বাইরে আসা।

নটবর কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। শরীরে জুত নেই বলেই সে অমন মনমরা হয়ে গেছে। এত যে গানের বাতিক, একতারা ছোঁয় না আজ পনেরো দিন হয়ে গেল। ধনপতি যদিও গান গাইবার কথা বলে, নটবর তবুও গায় না। বলে, 'মেজাজ না এলে কি গান করা যায়! গান হলো মনের জিনিস।' একতারাটা পড়েই থাকে। কখনো কখনো ধনপতি সেটা তুলে নিয়ে তাতে বেসুরো আওয়াজ তোলে।

একনাগাড়ে বর্ষা চলেছে। সূর্যের দেখা নেই সাত-আট দিন। সারাদিন সারারাত আকাশ চুয়ে জল পড়ছে। দু' এক সময় খানিক 'চিকসে' বেরোয়। সূর্য দেখা না গেলেও আকাশটা যেন একটু হালকা হয়ে যায়। কিন্তু খানিক সময় বাদে আবার নতুন করে ধূসর-কালো রঙের মেঘের স্তর কোত্থেকে যেন ভেসে এসে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলে, আবার বৃষ্টি নামে মুষলধারে।

বর্ষায় যেন অরণ্যের রূপটা সম্পূর্ণ বদলে যায়। বদলে যায় নোনা গাঙ, খাল, খাড়ির চেহারা। কূলপ্লাবী জল থৈ থৈ করে গাঙ, খাল, আর খাড়ির বুক জুড়ে।

সে জল এপার ওপার ভাসিয়ে দিয়ে যায়। তারপর যখন জোয়ার আসে, সে জল সমস্ত অরণ্যরাজ্যকে প্লাবিত করে দেয়। কথায় বলে, 'অভদ্র বর্ষাকাল হরিণ চাটে বাঘের গাল।' সত্যি এ-সময় রাজা বাঘেরাও এই অরণ্যরাজ্যে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। অরণ্যরাজ্যে ওরা এই বর্ষার দিনে খুঁজে বেড়ায় 'টঁ্যাকা' জায়গা। বর্ষার দিনগুলো সেইসব জায়গাতে কাটিয়ে দেয়। তবু শিকারের সন্ধানে তাদেরও মাঝে মাঝে টহল দিতে হয় অরণ্য-দেশে। হয়তো মনের মতো শিকার পায় না সব সময়, তাই ক্ষুধার তাড়নায় জোয়ারে ওঠা কাঁকড়া খেয়েও তাদের অনেক দিন কাটাতে হয়। বর্ষার দিনগুলোর জন্যে যেটুকু অপেক্ষা—তার পরেই এই রাজাবাঘের দল তাদের বর্ষার ঋণটা শোধ করে নিতে চায়।

সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। মুষলধারায়। বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস—নতুন উপসর্গ। নটবর সেই প্রথম রাতে ঘুমিয়েছে, এখনো ওঠেনি। তেলচিটে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। ধনপতিও 'আলসে কুঁড়ের' মতো সকাল থেকে ছই-এর মুখের কাছে বসে আছে। কখনো দেখছে ভরা বিহারীখালের মুখের দিকে, যেখানে বিহারীখাল গিয়ে পড়েছে 'বিত্তের গাঙে'। কখনো দেখছে খাল থেকে বেরিয়ে যাওয়া খাড়ির দিকে, কখনো বৃষ্টি-ধোয়া গহন বনের দিকে ফিরে চাইছে।

অরণ্য এখানে ভয়ংকর।

ভয়ংকর হলেও ধনপতির চোখে এই অরণ্য যেন এক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। ও বলে, 'আষাঢ়-শ্রাবণের বর্ষায় বৃন্দাবন না দেখলে বৃন্দাবন দেখা হয় না। বৃন্দাবন যদি দেখতে হয়, তাহলে এই বর্ষাকালে'।

কিন্তু প্রতিদিন, দিন-রাতে ধনপতি আকুল নয়নে জঙ্গলের দিকে চেয়ে থাকে কেন? জঙ্গলের ওই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে ওর চোখ কি না-জানি খুঁজে বেড়ায়? যার জন্যে দিনের পর দিন রোদ-জল-ঝড় মাথায় নিয়ে, নিত্য নতুন ঝুঁকির মধ্যে ও বিহারীখালের বুকে ডিঙি গেরাপি করে বসে আছে। কী আছে ওই জঙ্গলের মধ্যে?

দিনের কথা আলাদা, কিন্তু গভীর রাতে অন্ধকারের মধ্যে ধনপতি জঙ্গলের দিকে চেয়ে কী দেখে! ঘন-অন্ধকারে ভরা রাত, তার ওপর ধারা-বর্ষণ, মেঘের ডাক, বিদ্যুতের চমকানি—সব মিলিয়ে এই অরণ্যরাজ্য অপরূপ হয়ে ওঠে ধনপতির চোখের সামনে। স্থিরদৃষ্টিতে নিশি-পাওয়া মানুষের মতো রাত-জাগা

ধনপতি ছই-এর মুখে চুপচাপ বসে থাকে। যদি বৃষ্টি থেমে যায়, উঠে গলুই-এর ওপর এসে বসে। মুগ্ধ-বিস্ময়ে চেয়ে থাকে গভীর জঙ্গলের দিকে। কান পেতে শোনে রাত-জাগা পাখির ডাক, শোনে বুনো শূয়োরের ঘোঁতঘোঁত, শোনে অদেখা কোনো রাজাবাঘের গর্জন। দু' এক সময় কেওড়ার ডালে বসা বানরের পাল কিচির-মিচির করে ওঠে। বানর ডাকলেই বুঝতে হবে, কাছাকাছি কোথাও রাজাবাঘ কিংবা রানীবাঘিনীর আবির্ভাব হয়েছে, নয়তো বিষধর সাপ কাছের ডাল বেয়ে উঠছে পাখির বাসার সন্ধানে। বানরগুলোর অনুভূতি শক্তি ভারি প্রখর—ওরা এই অরণ্যের হিংস্র-শ্বাপদ আর সরীসৃপের সবচেয়ে বড় শত্রু। নিরামিষভোজী এই জন্তুটির ওপর রাজাবাঘের সর্বক্ষণের কোপদৃষ্টি। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত এই বানরকুল সুন্দরবনের সর্বত্র অবাধে ঘুরে বেড়ায়। তারা পরোয়া করে না আর আর অরণ্যচারীদের।

কিন্তু ধনপতি এই জঙ্গলের রাজ্যে দিনের পর দিন কী খুঁজে বেড়ায়?

—ধনপতি, অ-ধনপতি!

ঘুম ভেঙে গেছে নটবরের। কাতরকণ্ঠে ডাকছে ধনপতিকে।

নটবরের ডাক শুনতে পেয়েছে ধনপতি। ফিরে তাকায় ছই-এর ভিতরের দিকে। ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু এখনো তেলচিটে কাঁথাটা জড়িয়ে শুয়ে আছে নটবর। ধনপতি জিজ্ঞাসা করে, কি—কিছু বলবা?

—হ্যাঁরে, নটবর আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসে। গায়ে জড়ানো কাঁথাটা খুলে ফেলে দেয়। বলে, ধনপতিরে গায়ে হাত দিয়ে গ্যাখ দিকিন—বোধহয় জ্বর হয়েছে! সব্যাঙ্গ ব্যথায় টাটিয়ে রয়েছে যেন।

সত্যিই জ্বর হয়েছে নটবরের। ধনপতি তার গায়ে হাত দিয়ে দেখে, গা যেন আগুন হয়ে উঠেছে।

একে কাদন পেটের গোলমালে ভুগে কাহিল হয়ে পড়েছে নটবর, তারপর এই জ্বর। ধনপতি একটু চিন্তায় পড়ে। বলে, খুড়ো—এই জোয়ারেই ডিঙি ছাড়বো। দু' জোয়ার না হয় তিন জোয়ার বেয়ে গেলে মোল্লাখালি পৌঁছে যাবানে। তুমি থির হয়ে বোসো।

—জানিস, কাল রাতে আমি তারে দেখিচি।

—কারে!

—ফুলটুসিরে, সে আমারে ডাকতি এইছিল।

—তারপর?

—তারে বলে দিছি, আমি এখন যাবো না। ধনপতির সঙ্গে আমি সাগর দেখতি যাবো, তারপর তুমি এসো।

—তুমি সাগর দেখতি যাবা খুড়ো! ধনপতি বিস্ময়ের সঙ্গে ফিরে চায় নটবরের বিবর্ণ মুখের দিকে।

একে অসুস্থ নটবর, তার ওপর রাতের দুঃস্বপ্ন ওকে আরো কাহিল করে তুলেছে। কালো ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে নটবরের চোখ-মুখ। ভাঙা চোয়াল আরো বসে গেছে, কোটরে ঢুকে গেছে চোখ, কণ্ঠের হাড় বেরিয়ে পড়েছে, কথা বলতেও যেন হাঁপিয়ে পড়ছে সে।

নটবরের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ধনপতি। আজ খোলা চোখে নটবরকে দেখে ধনপতির মনটাও কাতর হয়ে পড়ে। ভুল করেছে সে, এতদিন এই বুড়ো মানুষকে তার এভাবে বাদাবনের দেশে আটকে রাখা ঠিক হয়নি। সবাই তো আর তার মতো নয়। সে না হয় নিজের খেয়ালে আপন নেশায় ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু নটবর খুড়ো? তার কাছে এ-তো একটা শাস্তি।

—দেখিস কি? নটবর শুধোয়, আমায় পানে চেয়ে অমন করে কি দেখিস?

—তোমারে দেখি খুড়ো—আমার জন্যে মরার হাল হয়েছে তোমার।

—কিন্তু তোর হালটা একবার দেখিছস? ডিঙিতে তো একটা পরকলা রাখিসনে, ডাঙায় গে পরকলায় তোর মুখ দেখিস—রোদে-জলে তুই তো তামাপানা হয়ে গেছিস। তোরে দেখতে হয়েছে দুষ্টু ভামের মতন।

—দুষ্টু ভাম! ধনপতি হেসে ওঠে। বলে, সে আবার কি! তুমি যা কথা জানো, তা কি বলবো তোমারে। ডাঙায় গে আরশিতে মুখ দেখার কথা বলছো—তা দ্যাখবো বৈকি। কিন্তু খুড়ো তোমার দুষ্টু ভাম কেমন সেটা শোনাও দেখি।

—ওটা কথার কথা। আজ যদি বনের বাঘ তোরে দ্যাখে, তবে তোরে ওই চেহারায় দেখে সেও ভয় পেয়ে যাবে।

কথাটা মিথ্যে বলেনি নটবর। সেই প্রথম বোশেখে ধনপতি বাদাবনে এসেছে আর এখন আষাঢ়ের শেষ। মাঝের দিনগুলো কেটে গেছে বাদাবনের দেশে, নোনা গাঙের বুকে। মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে রোদ, জল, ঝড়। তারপর নোনা গাঙের জলে স্নান করে সারা দেহ ব্যাঙের চামড়ার মত খড়ি-ওঠা খসখসে হয়ে গেছে। একে ধনপতির গায়ের রং কালো, তারপর সেই রঙ রোদে-জলে-ঝড়ে আর নোনা হাওয়ায় বিবর্ণ হয়ে গেছে। তেল অভাবে মাথার চুলগুলো হয়েছে বাদামী রঙ-এর। আরশির কাঁচে দেখার দরকার নেই, কদিন আগে

মেটে গামলায় বৃষ্টির জল ধরে রেখেছিল তাতেই দেখলো ধনপতি নিজের মুখ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। দেখে আপন মনে হো হো করে হেসে উঠলো।

—হাসিস কেন? নটবর জিজ্ঞাসা করে।

—জলে মুখ ছাখলাম খুড়ো। ধনপতি গামলার স্বচ্ছ জলে আপন মুখের প্রতিবিম্বের দিকে চোখ রেখে বলে, ছাখবা—দেখে যাও, ঠিক পরকলার মতন দেখা যায়।

—জলে মুখ দেখতে নেই রে।

—কেন?

—চরিত্তিরে কলুঙ্কে পড়ে। নানান্ জনে নানা কথা কয়। নে, সরে আয়, জলে মুখ দেখিস নে।

—ও সব মেয়েলি কথা। জলে মুখ দেখলি যদি চরিত্তির নষ্ট হতো, তা হলে ভূ-ভারতে চরিত্তির বলে কিছু থাকতো না। তাছাড়া আমার চরিত্তিরে কলুঙ্কে পড়বে কেন—আমি কি—

কথা শেষ করতে পারে না ধনপতি। আচমকা চুপ করে যায়। একটু স্বর টেনে বলে, আমিও গঙ্গাজলে ধোয়া মানুষ নই খুড়ো। আমার মনের মধ্যেও পাপ আছে। আমার চরিত্তিরেও কলুঙ্কে ছোপ পড়েছে।

নটবরকে এতদিন এত কথা বলেছে ধনপতি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনদিন তার কাছে সেঁজুতির কথা বলেনি। বারুণীবালার কথা জানে নটবর। আগাগোড়া সে জানে। সে-ও তো মোল্লাখালির মানুষ। তবুও ধনপতি কথা প্রসঙ্গে বারুণীর কথাও তোলে, বলে, তারে আমি পাপ চোখে দেখি নে খুড়ো। একদিন তার সঙ্গে আমার ভাব-ভালোবাসা ছিল সে কথাটা যেমন সত্যি, তেমনি আজ সে কেষ্ট নস্করের বৌ হয়েছে সে কথাও সত্যি। পুরনো দিনের কথা ভাবি বটে, কিন্তু আজ আর তার ওপর সে-রকম টান নেই। কিন্তু সে মেয়েটারে দেখার পর থেকে মনটা কেমন কু-ভাবনা ভাবে। বলতি পারো খুড়ো, এ ভাবনা থেকে কেমনে রেহাই পাই। এই ধরো না, এ্যাদ্দিন তার কথা মনে পড়েনি, কিন্তু যেই তুমি জলে মুখ দেখার কথা বললে, সেই যেন মনের মধ্যে সে মেয়েটার মুখ ভেসে উঠলো। জানো খুড়ো—সে মেয়েটার জন্যে আমার মন কাঁদে, শুধু যে কাঁদে তাই না, তারপর মনের মধ্যে আরও সব চিন্তা আসে। একদিন কি মনে হলো জানো।

—কি মনে হলো?

—না, সে তোমারে বোঝাতি পারবো না খুড়ো। সে একটা নোংরা কথা। সে কথা মুখে বলাটাও পাপ।

—তোর কথার মাথামুণ্ডু আমি বোঝলাম না। নে, ও সব বাজে ভাবনা ভাবিসনে। মানুষটা তুই এত শক্ত, মনটা তোর এত তেজী, তোর মুখে ও-সব কথা শুনতি চাইনে।

ধনপতি খানিক সময় চুপ করে বসে থাকে। নটবরও গায়ের কাঁথা ফেলে শুধু 'কোঁচার মুড়ো' গায়ে দিয়ে ছই-এর বাইরে এসে বসে।

বাড়ি ফেরার নামেই দেহে বল পেয়েছে নটবর। মনেও স্ফূর্তির আমেজ এসেছে। নয়তো হঠাৎ একতারাটা হাতে নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করবে কেন!

টুং-টাং করে একতারা বাজিয়ে চলে নটবর। কিন্তু গানের কলি ফোটে না তার মুখে। শুধু একতারার স্বরের সঙ্গে মাথাটা অদ্ভুতভাবে দোলাতে থাকে।

জোয়ারের টান এলো গাঙে, সেইসঙ্গে মুষলধারে নামলো বৃষ্টি। সেই জোয়ারেই গেরাবি তুলে ডিঙি ছেড়ে দিল ধনপতি। জোয়ারের টানে ডিঙি ভাসিয়ে নিজে রইলো হাল ধরে। নটবর ছই-এর নিচে গায়ে কাঁথা জড়িয়ে বসে রইলো গাঙ পারের দিকে চেয়ে।

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ডিঙির হাল ধরে বসে ধনপতি। বিহারীখালের মাঝখান দিয়ে ডিঙি নিয়ে চলেছে বিদ্যে নদীর দিকে। মাতলা থেকে বেরিয়েছে বিদ্যা। বিদ্যার ধারা গিয়ে পড়েছে রায়মঙ্গলে। আসার পথে এসেছিল সাতজেলিয়ার গাঙ দিয়ে, ফেরার পথে ধনপতির ইচ্ছে বাঘনা-শকুনখালির জঙ্গলের পাশ দিয়ে পারঘুমটি হয়ে যাবে মোল্লাখালি।

গাঙ-পথে বেরোলে কোনো ইচ্ছের ঠিক থাকে না ধনপতির। ভাবে এক, শেষ পর্যন্ত হয় আর এক। ওর খেয়ালটাই বড় কথা। স্থির চিন্তা নিয়ে কোনো কিছু করাটা ওর 'ধাত-গড়েনে' নেই।

আকাশ-ভাঙা বৃষ্টির মধ্যেও নৌকোর মাথায় হাল ধরে বসে আছে ধনপতি। ঘন মেঘ আঁধার করে রেখেছে চারদিক, তারপর ধারা-বর্ষণে সে আঁধার আরো ঘন হয়ে উঠেছে। দিনের বেলাতেও কেমন যেন সন্ধ্যার পরিবেশ।

বিহারাখালের মুখের কাছে এসে মাছ-মারা দলের ডিঙি দেখতে পেল ধনপতি। বরফ বোঝাই একটা লঞ্চও দাঁড়িয়ে রয়েছে খালের মুখ বরাবর। ওই লঞ্চ বোঝাই হয়ে মাছ যাবে কোলকাতায়।

—কার ডিঙি, মাঝি কেডা? জেলে-ডিঙির মাঝি জিজ্ঞাসা করে।

—কেন, জিগাও কেন, আমি তোমাদের কেউ নই। মাছ মারতে আসিনি, বাদা বেড়াতি এইছিলাম, উত্তর দেয় ধনপতি।

—বলো কি? বর্ষায় আবার বাদায় আসে নাকি কেউ শখ করে?

—আমি শখ করে আসিনি গো, বাদাবনে আসি আনন্দ পাই বলে। ধনপতি জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কোন্ দেশের গো?

—বসিরহাটের।

—খাস বসিরহাট, না আর কোথাও।

—আমরা ধলচিতে আর সোলাদানার, ও সব ডাক বসিরহাট।

—বোঝলাম।

এই কথার মধ্যে কাছেই একটা ডিঙি থেকে চিৎকার উঠলো। আর্ত চিৎকার। কি জন্যে চিৎকার, কি বৃত্তান্ত সে খবরের অপেক্ষা না করে ধনপতি ডিঙির মুখ ঘোরালো।

অনেকগুলো আর্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, ওরে জীব্নে গাঙে পড়েছে—ওরে জীব্নে গেল বুঝি—জীব্নেরে—

সবাই চিৎকার করছে, কিন্তু এই বিপদের মুহূর্তে সবাই দিশেহারা। শুধু তাই নয়, ঘোলে পড়ে জীবন যে ডুবতে বসেছে তাকে বাঁচাতে কেউ একটা কাছি-দড়িও ছুঁড়তে পারছে না। ঘোলের মধ্যে ডিঙি নিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য।

ধনপতির কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ডিঙি বেয়ে ঘোলের কাছেই গেল। মাথায় বুদ্ধি এলো তার। এ ঘোল এমন কিছু নয় অনায়াসে ডিঙি নিয়ে যেতে পারবে সেখানে।

একা হাল ধরে ঘোলের মধ্যে ডিঙি নিয়ে গেল ধনপতি। কিন্তু কোথায় মানুষটা। তবে কি তলিয়ে গেল, না কামট-কুমিরে খতম করে দিল। এসব ঘোলের ধারে কামট কুমির থাকে না সব সময়। তাহলে? হঠাৎ একটা হাত দেখতে পায় ধনপতি। শুধু দেখার অবসর, ধনপতি ডিঙি ছেড়ে দিয়ে সেই ঘোলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এদিকে ধনপতির ডিঙিটা ঘোলের মধ্যে পড়ে ঘুরপাক খায়। নটবর ছই-এর ভিতরেই চিৎকার জুড়ে দেয় ধনপতি শেষটা তুইও মরলি, আমাকেও মারলি।

জেলে-ডিঙির মাঝিরা নীরব দর্শক। সবাই দেখছে একজন মানুষ কেমন করে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

কয়েকটি রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত। ধনপতি সেই ঘোলের মধ্যে ডুব দিলে। পরক্ষণে আর একজনকে জড়িয়ে সেই দুরন্ত ঘোলের ওপর ভেসে উঠে তার ডিঙির 'মলম' আঁকড়ে ধরলো।

আশ্চর্য! সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে এলো না। একা ধনপতি এক হাতে ডিঙির মলম আঁকড়ে রইলো প্রাণপণে। জলে-ডোবা লোকটি তার অন্য হাতে ধরা। ডিঙিটা ঘুরছে ঘোলের মধ্যে। হাতে চেপে ধরা লোকটিকে অদ্ভুত কায়দায় প্রাণপণ শক্তিতে ডিঙির পাটাতনের ওপর তুলে দিলে। কিন্তু নিজে আবার ঘোলের মধ্যে পড়ে গেল। বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও ধনপতি ডরায় না। বরং বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে আরো বেপরোয়া হয়ে পড়ে। ঘোলের মধ্যে পড়ে ধনপতি তলিয়ে গিয়ে আবার মাথা তুলে ডিঙিটা ধরতে গেল। কিন্তু ডিঙিটা পাক খেতে খেতে কিছুটা দূরে সরে গেছে।

নোনা গাঙের ঘোল। জল একটা বৃত্তের মধ্যে চরকির মতো ঘুরছে। ধনপতি তার মধ্যে সাঁতার কেটে এগিয়ে ডিঙিটা ধরে ফেললো। দু'হাতের শক্তিতে মলম চেপে ধরে উঠে এলো ডিঙির মাথায়। এসেই চেপে ধরলে হালের মুঠি। শক্ত হাতে হাল ধরে ঘোলের চরকি-পাকের বাইরে নিয়ে গেল ডিঙি।

—ধনপতি, অ-ধনপতি, নটবর বলে ওঠে, আমরা তাহলি বেঁচে আছি!

উত্তর দিলে না ধনপতি। হালের মুঠি ধরে বৃষ্টিঝরা আকাশের দিকে চেয়ে উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে।

ধনপতির বলিষ্ঠ দেহ, আর অমন বাজখাঁই গলার হাসি শুনে আশপাশের জেলেডিঙির মাঝিরা কেমন থ বনে গেল। বাদাবনের নোনা গাঙে তারা এতদিন মাছ মারতে এসেছে, অনেক মানুষ দেখেছে, কিন্তু এমন দুঃসাহসী মানুষ দেখেনি।

অচৈতন্য জীবনকে অন্য ডিঙিতে তুলে দিয়ে ধনপতি আবার তার ডিঙির হাল ধরে বসলো। জিজ্ঞাসা করলে না কেমন করে লোকটি পড়ে গিয়েছিল ঘোলের মধ্যে, শুধু লোকটিকে মাছমারাদের ডিঙিতে তুলে তাদের শুনিয়ে দিলে, এবারে তোমাদের জীবনেরে দ্যাখো।

এ-ডিঙি সে-ডিঙি থেকে দু-একজন একথা ওকথা বলতে গেল, কিন্তু কোনো কথায় কান দিলে না ধনপতি, কারো মুখের দিকে ফিরেও চাইলো না। হাল ধরে আবার ডিঙি নিয়ে চললো বিহারীখাল দিয়ে বিদ্যানদীর পথে।

বিদ্যানদী এখনো অনেক দূর।

বৃষ্টির বেগ কমে এসেছিল। বড় গাঙের মুখে পড়ে ধনপতি দেখলো আকাশও অনেক পরিষ্কার হয়ে এসেছে। হয়তো বৃষ্টি থেমে যাবে।

গুঁড়ি-গুঁড়ি বর্ষণের মধ্যে ধনপতি বড় গাঙের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি ডিঙি চালাতে আরম্ভ করে। এই জোয়ারেই সে পৌঁছে যাবে গাঙপারে। তারপর ভাঁটার সময়টুকু ডিঙি গেরাবি করে রাখ। বিকেলের জোয়ারেই আবার ডিঙি ছেড়ে বেরিয়ে যাবে।

ভরা জোয়ারে টলমল করছে গাঙ। বাতাস নেই তেমন, তবু গাঙের মাঝ দরিয়ায় উথালিপাথালি ঢেউ। ঢেউ কেটে আড়াআড়ি ডিঙি নিয়ে চলেছে ধনপতি। ভাঁটার টান লাগলে এ-গাঙ আরো দুরন্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু ভাঁটা লাগার আগেই ধনপতির ডিঙি পৌঁছে যাবে গাঙপারে।

গুঁড়ি-গুঁড়ি বর্ষণ বন্ধ হলো।

মাঝ-আকাশে এক জায়গায় জমাট-বাঁধা মেঘ হঠাৎ ভেঙে গেল। সেখান থেকে সূর্য দেখা দিয়ে পলকের মধ্যে আলোর বন্যায় ভরিয়ে দিলে পৃথিবীটাকে। কিন্তু নিমেষের মধ্যে সূর্য আবার হারিয়ে গেল মেঘের আড়ালে।

হারিয়ে যাওয়া সূর্য মেঘের আড়ালে একটা আলোর বৃত্ত রচনা করেছে। ধনপতি ফিরে তাকায় সে আলোর বৃত্তের দিকে। ভাসা-ভাসা মেঘ আবার ভেঙে-ভেঙে গেল। আবার সূর্যের আলো এসে আছড়ে পড়লো গাঙের বুকে, এপারে ওপারে, ধনপতির চোখে-মুখে।

আজ সাতদিন পর সূর্যের আলো গায়ে মাখলো ধনপতি। মনটা তার খুশীতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। চিৎকার করে নটবরকে ডাকে, খুড়ো—অ ঘরামি খুড়ো, আজ একটা মন-মাতানো গান গাও দিকি। জুত্ করে গাও।

নটবর সর্বাঙ্গে কাঁথা জড়িয়ে বসেছিল। নতুন করে কম্প দিয়ে জ্বর আসছে তার। তবুও ধনপতির উৎসাহ দেখে একতারাটা হাতে তুলে নেয়। কিন্তু বাজাতে গিয়ে বেকুব বনে যায়, একতারার তারটা ছিঁড়ে গেছে।

—কি হলো, অ খুড়ো?

—তার ছিঁড়ে গেছে।

—যাক গে। তুমি খালি গলায় গাও।

—একটু থির হয়ে বোস, নটবর একতারার ছেঁড়া তার খুলতে খুলতে বলে. তারটা আবার ঠিক করে বেঁধে নেই।

তারটা বাঁধতে গিয়েও বাঁধতে পারে না নটবর। যেটুকু তার পাকানো

ছিল, সেটুকু খুলে ফেলেও একতারার মাপে কুলোলো না। না পেরে এক-তারাটা একপাশে সরিয়ে রেখে নিজের মনেই হেসে ওঠে। বলে, ধনপতি আজ থাক, আজ আর গান আসবে না রে।

---তবে থাক। বলে ধনপতি ফিরে চায় গাঙপারের দিকে। যে পারে এ-বেলার মতো ডিঙি বেঁধে রাখবে সে।

শুধু গাঙ-পারে যাওয়ার সময়টুকু---দেখতে দেখতে জোয়ারের টান শেষ হয়ে এলো। ভাঁটার টান লাগলো নোনাগাঙের জলে।

॥ এগারো ॥

রাত ভোর।

বারুণী ধড়মড় করে উঠে বসে। দুঃস্বপ্নের রেশ তখনো তার মনে। ঘুম ভেঙে গেছে, উঠে বসেছে বিছানায়, তবু মন থেকে স্বপ্নের রেশটা মুছে গেল না।

স্বপ্ন দেখেছে বারুণী—ধনপতি আর্তকণ্ঠে তার নাম ধরে ডাকছে। বাদা-বনের দেশে নোনাগাঙে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়েছে ধনপতি। ডিঙি সামলাতে পারেনি, ডুবে গেছে। ডিঙিটা ডোবার সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ধনপতি। কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়ে নোনাগাঙে জেগেছে সমুদ্রের ঢেউ। সেই বিশাল ঢেউ ভেঙে-ভেঙে সাঁতার কাটছে ধনপতি। হিংস্র হাঙর তার পেছনে। ছুটে আসছে হাঙরটা। জলের পোকা ধনপতি। বুঝতে পেরেছে যম তাকে অনুসরণ করেছে, ঠিক এই সময় ধনপতি ঢেউ-এর মাথায় ভেসে উঠে আর্তকণ্ঠে ডাকতে লাগলো বারুণীর নাম ধরে। বারুণী—বারুণী—

এই পর্যন্ত। তারপরেই ঘুম ভেঙে যায় বারুণীর, ধড়মড় করে উঠে বসে বিছানায়। হাঁপাতে আরম্ভ করে। হাপরের মত শ্বাস টেনেও বুকটা যেন ভরে না। যেন বাতাস ফুরিয়ে গেছে। বুকটা ভরে নেবার মতো বাতাসের অভাব ঘরে।

উঠে জানালা খুলে দিলে বারুণী। বাইরের আকাশে জমাট-বাঁধা মেঘ। জানালা খোলার সঙ্গে সঙ্গে এক-ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকলো।

জানালা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙে যায় কেষ্ট নস্করের। জিজ্ঞাসা করে, ওখানে দাঁড়িয়ে কি করো?

—ঘুম ভেঙে গেল, তাই উঠে পড়লাম। বারুণী জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থেকে বলে, ভোর রাতের স্বপ্ন সত্যি হয়, না?

—ছুর্, আমি স্বপ্ন বিশ্বেস করিনে। স্বপ্নের আবার সত্যি—কেষ্ট নস্কর মাথার বালিশের নিচে থেকে বিড়ি দেশলাই বার করে একটা বিড়ি ধরায়। বলে, এতো ভোরে উঠে কি করবা, শুয়ে পড়ো।

পাখি ডাকলো বাইরের শিরীষ গাছটা থেকে। ভোর হয়ে আসছে। কিন্তু আকাশে যে রকম জমাট-বাঁধা মেঘ, তাতে এখনো মনে হয় রাত রয়েছে।

বিড়ি-টানা শেষ করে কেষ্ট নস্কর আবার ডাক দেয় বারুণীকে। বারুণী তখনো জানালার ধারে দাঁড়িয়ে। স্বপ্নের স্মৃতিটা রোমন্থন করছে মনে মনে। কী দারুণ দুঃস্বপ্ন!

—বোনাই আছো—বোনাই! দূর থেকে চিৎকার শুনতে পেল বারুণী। কেষ্ট নস্করেরও কানে পৌঁছলো ধনপতির বাজখাঁই সুরের চিৎকার।

—বোনাই আছো, বোনাই—অ বোনাই—

এগিয়ে আসছে ধনপতির কণ্ঠস্বর।

জানালার ধারে ঠায় দাঁড়িয়ে বারুণী। এই মুহূর্তে তার আত্মসম্বিৎ যেন হারিয়ে গেছে। এও যেন এক স্বপ্নের মতো।

কেষ্ট নস্কর বিছানা ছেড়ে ওঠে। বারুণীকে ডেকে বলে, শুনতি পাও না, শালাআশ ডাকে যে। দোর খুলে দে এসো!

—তুমি যাও। বারুণী কাঁপা-কাঁপা সুরে বলে, আমার ভয় হচ্ছে।

—ভয়! কিসের ভয়!

—সে তোমারে পরে বলবো। তুমি যাও—না-না—যেও না। তুমি এখান থেকে সাড়া নেও আগে। তারপর দোর খুলতি যেওনে।

এবার মেটে পাচিলের সদর দরজার কাছ থেকে ধনপতির উচ্চকণ্ঠের ডাক আসে, অ বোনাই—বোনাই, ঘুমোও নাকি, অ বোনাই!

—শালাআশ নাকি? ঘরের ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করে কেষ্ট নস্কর।

—হাঁ, দোরটা খোলো।

—দাঁড়াও, যাচ্ছি।

দরজা খুলে দিতে গেল কেষ্ট নস্কর। পিছনে পিছনে এলো বারুণী।

দরজা খুলেই কেষ্ট নস্কর যেন থতমত খেয়ে যায়। আধো-অন্ধকারে ধনপতি এসে দাঁড়িয়েছে প্রেতমূর্তির মত। কাপড়-চোপড়ে কাদা মাখা, এক

মাথা চুল মুখের সামনে, খালি গা—কাঁধের ওপর একজনের দেহ ভার। বারুণী দূরে দাঁড়িয়ে আঁত্‌কে ওঠে। একি বীভৎস রূপ নিয়ে ধনপতি এসে দাঁড়িয়েছে!

—ভয়ানক অসুখ করেছে আমার খুড়োর, জ্বরে বেহুঁশ হয়ে আছে, বলে ধনপতি সোজা এগিয়ে যায় ঘরের দিকে। দাওয়ার মাটিতে শুইয়ে দেয় বেহুঁশ নটবরকে।

সকাল থেকে দুপুর।

দুপুরের পর থেকে নটবর যেন কিছুটা সামলে উঠেছে। বারুণীর অন্য কোনো কাজ নেই, সকাল থেকে সে রোগী নিয়ে ব্যস্ত। যত রকমে শুশ্রূষা দরকার, সবই করেছে।

বারুণীর বাপের বাড়ির দেশের লোক নটবর। গ্রাম সুবাদে কাকা বলে ডাকে। তাছাড়া নটবরের বাবা দিগম্বর ঘরামির সঙ্গে বারুণীর ঠাকুর্দা মহাদেব হাউলির বন্ধুত্ব ছিল। সে-সব শোনা কথা বারুণীর। নটবরকে সে খুব ছোটবেলায় দেখেছে, দেখেছে তাদের বাউণ্ডুলে ঘরামি কাকাকে বিয়ে করতে। বারুণী তখন খুব ছোট, মা-মাসির সঙ্গে সে-ও ঘরামি বাড়ি গিয়েছিল বৌ দেখতে। সেই ঘরামি কাকা কত বুড়ো হয়ে গেছে। অথচ মনে হয়, সেদিনের কথা সব। দিনগুলো কত তাড়াতাড়ি হারিয়ে যায়!

দুপুরের পর জ্বর কমে এলো নটবরের। বারুণী 'পথ্যি' দিতে শরীরে কিছুটা বলও পেলো। তারপর উঠে বসলো দেয়াল ঠেস দিয়ে।

বারুণী জিজ্ঞাস করে, এখন কেমন আছো ঘরামি কাকা?

নটবর ক্লান্তকণ্ঠে বলে, এ-যাত্রায় মরা হলো না দিদি।

—মরবা কেন? তুমি মরলে তোমার ওই বেহুদো ভাইপোটারে সামলাবে কে? বারুণী হাসি মিশিয়ে বলে, তিন মাস বাদাবনে কাটিয়ে মরার হাল হয়েছে সব। যেমন তুমি, তেমন তোমার ওই 'আকালকেঁড়ে' ভাইপো। এবারে আর কোনো কথা শোনবো না, ওরে খোঁটায় বেঁধে তবে কাজ।

—ও তুমি পারবা না দিদি। নটবর ধুঁকছে কথা বলতে গিয়ে। বলে, ওরে আমি কত বলিচি, কিন্তু কথা কানে নেয় না। আর বেশি খোঁচালে চটে যায়। তাই আর বলিনে, শেষটা হিতে বিপরীত হবে। ত্যাখো, তুমি যদি পারো। তা হলি বোঝবো একটা কাজ করলে দিদি। কিন্তু ও তুমি পারবা না।

ধনপতি বাড়ি ছিল না। কেষ্ট-নফরের সঙ্গে কোথায় যেন বেরিয়েছে।

এই অবসরে বারুণী তার ঘরামি কাকার কাছ থেকে ধনপতির কিছুটা খোঁজ-খবর করে নিতে চায়। নয়তো ধনপতির সামনে এ-সব কথা বলা যায় না। ধনপতির চরিত্রটা তো ওর জানা। তবু তার আজকের কথাটা ঘরামি কাকাই বেশী জানে। তাই তো জানার কৌতূহল।

নটবর যতটুক জানে সবই বলে গেল। যতদিন সে ধনপতির সঙ্গে আছে, ততদিনে সে তার একটা রূপই দেখতে পেয়েছে। সে রূপ কোনো ঘরমুখো মানুষের নয়। সোজা কথা সে রূপ হলো এক জন্ম-বাউণ্ডুলের। শুধু তাই নয়, সেই বাউণ্ডুলের মনটা আবার ঘূর্ণি-বাতাসের মতো। সে মনকে একটা জায়গায় বাঁধা যায় না। তাকে বাঁধতে পারে এমন কেউ জন্মায়নি।

নটবরের কথা শুনে বারুণীর মনটা হতাশায় ভরে যায়। ভাবে, সত্যি ধনপতির মন ঘূর্ণি-ঝড়ের মতো। সে মন কখনো স্থির হবে না।

একটা চাপা বেদনা বারুণাকে অস্থির করে তোলে। এমন হয়তো হতো না ধনপতি, সে-ও আর দশ জনের মতো সংসারের মানুষ হতে পারতো, সংসারী মানুষের মতো দুঃখে-সুখে দিন কাটাতে পারতো—কিন্তু বিধাতা বিরূপ, নয়তো এমন হবে কেন।

বারুণীর দু'চোখে জল এলো। মনে এলো রাতের দুঃস্বপ্নের কথা। তারপর ধনপতির এ-বাড়িতে আসা। ধনপতিকে প্রথমটা দেখে সত্যি আঁতকে উঠেছিল সে। অমন চেহারা যে একজন মানুষের হতে পারে, এ তার কল্পনার বাইরে। সর্বাঙ্গ কাদা-মাখা, একমাথা রুক্ষ চুল, রোদে ঝলসানো পোড়া-পোড়া মুখ, আগুনের গোলার মতো দুটি চোখ, তারপর ঘরামি কাকার দেহটা কাঁধের ওপর ফেলা—সব মিলিয়ে ধনপতিকে দেখতে হয়েছিল 'ধম্ম রাজের চেলার' মতো।

—ভাবো নাকি দিদি, নটবর ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, ভাবো কি?

—কিছু না ঘরামি কাকা, কি আর ভাববো! বলে বারুণা গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। নটবর ম্লান হাসে। বলে, দিদি—ওরে বাঁধতে যেও না। ও যেমন আছে তেমন থাক।

—তাই থাক।

বারুণী আর বসে থাকতে পারে না। বসে থাকলেই চিন্তা বাড়ে। তার চেয়ে কাজে থাকাই ভালো। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে সংসারের।

উঠে পড়লো বারুণী। এঁটো বাসনের 'পাজা' নিয়ে গেল খিড়কির পুকুরে।

হাটখোলা থেকে দাড়ি কামিয়ে মাথার চুলের বোঝা কিছুটা ছেঁটেছুটে সন্ধ্যের আগে হৈ হৈ করতে করতে এলো ধনপতি।

মোল্লাখালির মামা কখন আসবে এই আশায় বসেছিল বারুণীর ছেলে-মেয়েরা। মামা বলে গেছে মেঠাই আনবে।

ধনপতি উঠোনে পা দিয়েই হৈহৈ শুরু করে দিলে, কইরে সুবল, কইরে সুদাম, কই—হোই—শিগ্‌গির আয় রে, মেঠাই এনিচিরে—

ছুটে এলো ছেলে-মেয়ে তিনটে। অমনি ঠোঙা থেকে মুঠো মুঠো মেঠাই দিলে ছেলে-মেয়েদের হাতে। ছেলে-মেয়েরা মোল্লাখালির মামাকে ঘিরে হৈহৈ করতে থাকে। ধনপতিও তেমনি, ছেলে-মেয়ে তিনটেকে নিয়ে ছেলেখেলা আরম্ভ করে দেয়।

কেষ্ট নস্করও তার শালাআশের রকম-সকম দেখে না হেসে পারে না। বলে, তোমার বয়েস কত হলো শালাআশ?

—তা দু' কুড়ি হতি গেল আর কি? কেন? বয়সের কথা কেন!

—না, তোমার রকম-সকম দেখে মনে হলো, বয়েসটা তোমার এক-জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে।

—আছে না তো কি। দেখো বোনাই—তোমরা বুড়িয়ে যাবা, কিন্তু আমি ঠিক এ-রকমটা রয়ে যাবো। মনটারে তাজা রাখতি জানলে, রাখা যায়। মনের 'ধাত-গড়েন' নেই। মনের বয়েস বাড়ে না, বুঝলে?

—বোঝলাম।

—ঘোড়ার ডিম বুঝেছো। ত্যাখো বোনাই—আমি যে কথা বলি সে কথা নিজের জীবনে 'পরখ' করার পরে বলি। ফালতু কথা আমার কাছে পাবা না।

—হুঁ

—হুঁ, মানে?

—হুঁ মানে হুঁ, বলে কেষ্ট নস্কর ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

—পালালে তো?

ধনপতি হো হো করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বারুণীর মেজ ছেলে সুদামকে পাঁজা-কোলা করে তুলে ঘরের দাওয়ার দিকে এগিয়ে আসে হনহন করে।

—কেমন আছো খুড়ো? ধনপতি শুধোয়।

—ভালো আছি। নটবর বলে, তবে জ্বর এখনো জুড়োয় নি। পেটের ফাঁপটা যেন একটু বেড়েছে।

—ঠিক আছে, দেখবা দুদিন 'তাগোতে' থাকলি সব সেরে গেছে। বোনাই আজই ডাক্তার আনতি যাবে বলছিল, আমি বললাম, একটা দিন দেখতি।

—ডাক্তার বদ্যি ডাকতি হবে না রে। নটবর বলে, দুটো পাঁচটা দিন বিশ্রাম নিলে ভালো হয়ে যাবো। অসুখটা আর কিছু না—অত কষ্ট শরীর বইতে পারেনি। বুড়ো হাড়ে অত স'বে কেন। বয়েসটা তো কম হয়নি রে।

—নেও মেলা কথা কোয়ো না। চুপ-চাপ বসে থাকো, না হয় শুয়ে পড়ো। কাল রাতে তোমারে নে আমার যা ভয় হইছিল, ভাবলাম—খুড়ো বুঝি গেল।

—নারে, এর মধ্যি যাবো কি করে। তেমনি পুণ্যি করে আসিনি।

—নেও, কথা না বলে মনে মনে পাপ-পুণ্যির হিসেব কষো গে—বলে ধনপতি ডাক দেয়, অ বোনাই—বোনাই!

কেষ্ট নস্কর ঘরের কোণে বারুণীর সঙ্গে সলা পরামর্শ করছিল। ধনপতির ডাকে সাড়া দিয়ে বলে, চেল্লাও কেন, বোসো—যাচ্ছি। তোমার মতো শালা আর দুটো থাকতো যদি, তা হলেই জান কয়লা।

ধনপতির তর সয় না। সোজা ঘরে গিয়ে ঢোকে। স্বামী-স্ত্রী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফিসফিস করছে দেখে প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে যায়। পরক্ষণে সহজ হয়ে বলে, কিছু ফন্দি আঁটো নাকি?

—হ্যাঁ। সেই রকম একটা কিছু, বলে কেষ্ট নস্কর ফিরে দাঁড়ায়। বুঝতে পারে, এই মুহূর্তে ধনপতির মেজাজটাও যেন ভালো আছে। মনের কথাটা বলার এই সুযোগ। মেজাজ বিগড়ে গেলে ওর সঙ্গে কথা বলাই দায়। সুযোগ বুঝেই কেষ্ট বলে ফেলে কথাটা। —শালা আশ, এতোকাল তো বেহুদো হয়ে ঘুরে বেড়ালে, বলি এবারে একটা বে-থা করো। বারুণীরও তাই ইচ্ছে।

ধনপতি কথাটা শুনেই হকচকিয়ে যায়। এ-কথা সে অনেকবারই শুনেছে বোনাই-এর মুখে। শুনে শুধু হেসেছে। কিন্তু আজ বোনাই-এর কথার সুরে আগের মতো 'হালকা রস' নেই, সে যেন ভেবেচিন্তে এ কথাটা বলেছে। তারপর বারুণীর ইচ্ছের কথাও যোগ করেছে কথার সঙ্গে। আজও শেষপর্যন্ত ধনপতি হাসলো বটে, কিন্তু তার হাসিটা অন্য ধাঁচের।

—দ্যাখো, এবারে আর অমত কোরো না। বয়স হয়ে যাচ্ছে, একটা অবলম্বন তো দরকার। তাছাড়া বংশের ধারাটাও তো বজায় রাখা পুরুষ মানুষের কাজ।

ধনপতি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনো কথা নেই তার মুখে। কেষ্ট

নস্কর হঠাৎ ওকে একথা বলতে গেল কেন? ধনপতির মনের মধ্যে শুধু একটিই প্রশ্ন। কিন্তু এই একটি প্রশ্নের পেছনে যথেষ্ট কারণ লুকিয়ে রয়েছে। সে কারণটা কী হতে পারে?

ধনপতি বেশ কিছু সময় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। কেষ্ট নস্কর বোঝে, এ নিয়ে আর কথা বাড়ানোর সময় এখন নয়। বারুণীও দাঁড়িয়ে ছিল, সে-ও কি ভেবে এদের সামনে থেকে সরে গেল।

—তুর, এই একটা কথা নে মালকাঠ-ঝাঁকা ধনপতিকেও ভাবতে হয়। কেষ্ট নস্কর এগিয়ে গিয়ে ধনপতির পিঠে চাপড় দিয়ে বলে, নেও—চলো, তোমার ঘরামি খুড়োর কাছে বসি গে।

ধনপতির হাত ধরে কেষ্ট নস্কর এসে বসে নটবরের বিছানার পাশে। শুয়ে রয়েছে নটবর, গায়ে কাঁথা চাপা দিয়ে। জ্বরের ওপর আবার জ্বর এসেছে তার। তবে অন্যদিনের মতো যন্ত্রণা নেই শরীরে।

নটবর বলে, ধনপতি—আমার জন্যে তোর বোনাই-এর খুব কষ্ট। নারে?

ধনপতি নয়, উত্তর দিলে কেষ্ট নস্কর, ঘরামি খুড়ো, তোমার অসুখ হইছিল বলে শালা আশরে এ বাড়িতে প্যালাম। তাছাড়া তোমার পায়ের ধুলোও পড়লো। অসুখ হয়েছে বলে এয়েচো, কিন্তু অসুখ সারলে দুদিন মাছ-ভাত পথ্যি করে তবে যাবা। তার আগে যাওয়া চলবে না।

ধনপতি বিস্ময়ের সঙ্গে বলে ওঠে, অ বাবা, সে কদিন আমাকে আটক রাখবা নাকি? তা হবে না।

—তা হবে না মানে। বলি—পড়েছো যবনের হাতে, খানা খাতি হবে সাথে। বুঝেছো। কাজের নামে 'লবডঙ্কা'—মোল্লাখালি গে তো আবার বাদাবনে যাবার কথা ভাববা, তার চেয়ে এখানে দু'দশ দিন কাটিয়ে যাও। এ্যাদ্দিন এখানে শুধু এয়েচো, থাকতি তো চাওনি। তিন মাস বাদা-বনে ঘুরে ঘুরে খুব তো 'হুরুশ' করলে, এবারে এখানে দুদিন আরাম করো।

—আরাম! ধনপতি হেসে বলে, আরাম-টারাম বুঝিনে। তাছাড়া আরাম বলে যদি কিছু থাকে, তবে যার আরাম তার কাছে।

নটবর শুয়ে শুয়ে এদের কথা শুনছে। ধনপতির শেষের কথাটা তার মনে ধরেছে। 'যার আরাম তার কাছে', কথাটা মনে মনে বার কয়েক আউড়ে নটবর বলে, এবারে একটা কথার মতন কথা কইছিস ধনপতি।

ধনপতি মুরুব্বি মানুষের মতো হাসে।

কেষ্ট নস্করের বাড়ি অনেক সময় সন্ধ্যের পর আড্ডা বসে। বিশেষ করে বর্ষাকালে যখন যাত্রার আখড়া বন্ধ থাকে—তখন একটা ওঠা-বসার জায়গা তো চাই, সে জায়গাটা হলো কেষ্ট নস্করের বাড়ির সামনের টিনের চালা।

ঘরটাও বেশ বড়সড়ো, বিশ-পঁচিশজন লোকের গুলতানি করার পক্ষে যথেষ্ট। জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত যাত্রার আখড়াতেই বসতো সবাই—আষাঢ় মাসে পুরো বর্ষা নামতে আখড়া উঠে এসেছে কেষ্ট নস্করের টিনের চালায়। লোকজন আসে-বসে বলে চালাটা এবারে জুত্‌সই করে মেরামত করে দিয়েছে কেষ্ট নস্কর।

ক'দিন একনাগাড়ে বৃষ্টি হয়েছিল। কাছে-পিঠের ছু'চারজন ছাড়া কেউ আসেনি। আজ বৃষ্টি বাদলা নেই, সন্ধ্যের পর থেকে এ-পাড়া ও-পাড়ার অনেকেই আসতে আরম্ভ করে। তারপর তুপুরে ধনপতিকে নিয়ে পাড়ায় বেরিয়েছিল কেষ্ট নস্কর। মালকাঠ-ঝাঁকা ধনপতির সঙ্গে পরিচয় সবার থাক না থাক, তার নামটা অনেকেরই জানা। তার সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ অনেকেরই। শুধু তাই নয়, ভাদ্র মাসে গ্রামে মহাবীরের পুজো হয়, হাঁড়িঝি তলায় আবাদ অঞ্চলের মল্লদের লড়াই হয়। তাতে ধনপতি আসুক—এ সম্পর্কেও কথাটা পাকাপাকি করে নিতে চায় অনেকে।

আসর ভালোই জমলো। এ-পাড়া ও-পাড়ার লোক—তার মধ্যে ছোকরার দলই বেশি—এসেছে কেষ্ট নস্করের টিনের চালায়।

ধনপতিকে নিয়ে কেষ্ট নস্কর বসেছে। নাছোড়বান্দা ছোকরার দল, ধনপতির কাছ থেকে তার মালকাঠ-ঝাঁকার কথা, বাদাবনের জলন্ত কাহিনী, তার মাঝি-জীবনের অভিজ্ঞতার কথা—না শুনে ছাড়বে না। এ-সব গল্প বলতে আপত্তি নেই ধনপতির। বলেও। গল্প নয়—এ সব কথা তার জীবনের কথা। শুনে শিউরে ওঠে ছোকরার দল। বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়ে ধনপতি। জঙ্গলের কথা, ঝড়-তুফানে ডিঙি নিয়ে নোনা-গাঙ পাড়ি দেওয়ার গল্প, কর্ম বাউলির আখড়ায় মাল-কাঠ ঝাঁকা—আরো কত ঘটনার কথা শুনিয়ে চলে ধনপতি। বলতে বলতে উত্তেজিত ধনপতি উঠে দাঁড়ায়, হাত-পা আস্ফালন করে, আবার বাজখাঁই গলায় ছু'একবার চিৎকারও করে ওঠে। মাঝে মাঝে হাসি তো আছেই।

যাত্রাদলের একটি ছোকরা—ধনপতিকে দেখে তার একটা কথা মনে হয়েছে, 'ধর্মযুদ্ধ' নাটকে ভীমের পার্ট করার লোক মেলে না—ধনপতিকে ভীম সাজানোর কল্পনাটা তার মনে এসেছে। একসময় সাহস করে বলেও ফেললো কথাটা।

কথাটা বলতেই আরো কয়েকজন তার সমর্থনে এগিয়ে এলো। কিন্তু যাকে নিয়ে কথা, শেষটা সেই ধনপতি বলে ওঠে, ছ্যাখো—ওসব যাত্রাফাত্রা আমি বুঝিনে। ওসবের মধ্যে আমারে টানতি চেয়ো না। তাতে লাভ হবে না।

কেষ্ট নস্কর বলে, ওসব কথা এখন থাক, যাত্রা তো এখন হচ্ছে না। সে-সব মাঘ-ফাল্গুন মাসের ব্যাপার। সময়কালে দেখা যাবে শালাআশরে ভীম সাজানো যাবে কিনা।

উৎসাহী ছোকরা বলে, বেশ—ওই কথাই থাক কেষ্টদা।

—তাই থাক। কেষ্ট নস্কর উঠে দাঁড়ায়। বলে, অনেক রাত হয়েছে, আজ এই পর্যন্ত থাক। শালা আশ তো দু'চার দিন আছে—কথাবার্তা পরে হবে।

আসর ভাঙতে ধনপতিকে নিয়ে কেষ্ট বাড়ি মধ্যে এলো। দুজনেই গেল নটবরের খোঁজ নিতে। ঘুমিয়ে পড়েছে নটবর। গায়ে হাত দিয়ে দেখলো ধনপতি, জ্বর তেমন বেশি না হলেও, হয়েছে।

বারুণী তার ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে রান্না ঘরে বসেছিল। ধনপতি আর স্বামীকে না খাইয়ে হাঁড়ি হেঁসেলের পাট চুকোতে পারছে না।

—আমাদের ভাত দেও, ঘরের ছাঁচতলায় কোলার জলে কেষ্ট নস্কর মুখ ধুতে ধুতে বলে, তোমার এই মালকাঠ-ঝাঁকা ভাইটার জন্যে দেরি হয়ে গেল।

অনেক পদ রান্না করেছে বারুণী। কলমি শাক দিয়ে চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি, শোল মাছের ঝোল, পার্শে মাছ আর পেঁয়াজের মাখা-মাখা তরকারি, তারপর ভাঙন মাছ ভাজা। শেষ পাতে সরষে ফোড়ন দিয়ে কচি আমড়ার টক।

খেতে ভালোবাসে ধনপতি, তাছাড়া বেশ খেতেও পারে। কতদিন পর বারুণী আজ নিজে বসে থেকে খাওয়াচ্ছে ধনপতিকে। সেই কবে কোন্ কালে বিয়ে হয়েছে, তারপর ধনপতিকে আর নিজের হাতে কখনো এমন করে খেতে দেয়নি। বিয়ের আগে বারুণী কতদিন যে ধনপতিকে বসে থেকে খাইয়েছে তার হিসেব নেই। বারুণী সামনে বসে থাকলে ধনপতির খাওয়াও যেন বেড়ে যেত। এক থালার জায়গায় দু' থালা ভাত খেয়ে বলতো, 'কই আর দেও বারুণী।' বারুণী ঠাট্টা করে বলতো, তোমার পেটে কি আজ রাক্ষস সেঁধিয়েছে!'

ধনপতিকে খাওয়াতে বসে সেই সব পুরনো কথা মনে পড়ে বারুণীর। আর ধনপতির মনটাও হারিয়ে যায় পুরনো দিনের চিন্তায়। দু'জনেই যেন কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

—কই গো, আর গোটাকতক ভাঙন মাছ ভাজা দেও শালাআশরে। কেষ্ট

নস্কর হাসতে হাসতে বলে, কই গো শালাআশ খাও। আজ তোমার জন্যে বাঁওড় থেকে মাছ আনিয়েছি। খাও।

বেশ. কয়েকটা মাছের দাগা ধনপতির পাতে দেয় বারুণী। ধনপতি 'না না' করে ওঠে। কিন্তু কে শুনছে ওর 'না' বলা। শুধু মাছ ভাজা নয়, আরো খানিক ভাত, আরো দু'বাটি মাছের তরকারি দিলে বারুণী।

—আহা করো কি! ধনপতি দু'হাত উপুড় করে থালার ওপর। কেষ্টর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আমার কি সে বয়েস আছে? আর দিও না, নষ্ট হবে।

কেষ্ট নস্কর হাসে।

—বসে বসে খাও, বারুণী বলে, খুব খাতি পারবা। তোমার খাওয়া তো জানি।

—জানি বোলো না, বলো জানতাম, বলে মাথা নিচু করে ধনপতি খেতে আরম্ভ করে।

সামান্য কথাতেই যেন আনন্দে-বাঁধা সুরটা কেটে যায়। কেষ্ট নস্কর চেষ্টা করে সেই সুরটা ফিরিয়ে আনতে। বলে, বাদাবনে ছিলে তিন মাস, পেট ভরে খাওয়া তো জোটেনি, তাই না শালা আশ?

ধনপতি বলে, বাদাবনে গেলে আমার খাওয়া লাগে না বোনাই। মনটা এত ভরে থাকে, পেটের খিধে ভুলে যাই।

কেষ্ট বলে, আমারে একবার নে যাবা?

ধনপতি বলে, বাদাবন তোমাদের জন্যে নয়।

—কেন, আমরা কি?

—তোমরা সংসারের ঘানি-টানা প্রাণী, বাদাবনে গে মজা পাবা না।

—সংসারে থাকলি কি বাদাবনে যাতি নেই?

—যাতি নেই কেন, একশ বার যাতি আছে। যাচ্ছেও তো কত লোক। তবে সে যাওয়া কেমন জানো—সে যাওয়া হলো একটা ঝোঁক মেটানো। বাদাবনে যাতি হলে মন আর চোখ তৈরি করে নিতে হয়, নয়তো সেখানে দেখার কিছু খুঁজে পাবা না। বুঝলে? নেও, ওসব কথা বলে আমারে ঘেঁটিও না—খাওয়া হয়ে থাকে তো ওঠো।

মুখ হাত ধুয়ে পান চিবোতে চিবোতে ধনপতি এলো নটবরের কাছে। অকাতরে ঘুমোচ্ছে নটবর? অনেকদিন পর আজ স্বস্তি পেয়ে ঘুমোচ্ছে সে।

নটবরের মাথার কাছে ধনপতির বিছানা। ঘরের বিছানা তুলে দাওয়ায় নিয়ে আসে ধনপতি। এতদিন খোলা জায়গায় রাত কাটিয়ে ঘরে মন টিঁকলো না।

বাইরের দাওয়ায় বিছানা বিছিয়ে রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে পড়ে ধনপতি।

দূর আকাশের এক কোণে খানিকটা জমাট-বাঁধা মেঘ।

নয়তো আকাশ পরিষ্কার। যে আকাশে অজস্র নক্ষত্র মিটমিট করে জ্বলছে। আর দূর আকাশের মেঘের কোলে চিড়িক-পাড়ার মতো মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

কখনো নক্ষত্র কখনো ক্ষণ-বিদ্যুতের আলো দেখতে দেখতে ধনপতি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

দিন তিনেক পরে।

নটবর আগের থেকে অনেক সুস্থ হয়েছে। গায়ের জ্বর জুড়িয়েছে, পেটের গোলমালও অনেক কম। এ-কদিন বারুণী ওর জন্যে কম করেনি। কোথায় গুগ্‌লির ঝোল, গাঁদাল থানকুনি পাতা সেদ্ধ, কলমি ডগার ক্বাথ, চিঁড়ে-মুড়ির জল—এই সব 'পথ্যি'তেই নটবর সুস্থ হয়ে উঠেছে। ডাক্তার-বদ্যি ডাকার দরকার হয়নি।

তিন মাস জঙ্গলে থেকে জঙ্গলী বনে গিয়েছিল ধনপতি, কদিনে তার চেহারার হারানো জৌলুস ফিরে এসেছে। শুধু তেল-সাবানে মুখের পোড়া পোড়া দাগগুলো এখনো ওঠেনি। মুখের চামড়ার ওপর-পর্দাটাই জ্বলে গেছে। ও-চামড়া না উঠে গেলে মুখের আসল রঙ ফিরে আসবে না।

বারুণীর শুধু নয়, তার স্বামীরও ইচ্ছে ছিল, ধনপতি আর নটবর তাদের কাছে দিনকতক থাকুক। কিন্তু ধনপতি আর থাকতে চায় না। সে বলে, এই তো কদিন হৈ হৈ করা গেল, আর কেন—আবার একসময় এসে দুদশ দিন কাটিয়ে গেলে হবে।

নটবরের কিন্তু যাওয়ার ইচ্ছে নেই। আরো কটা দিন কাটিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে তার। অথচ মুখ ফুটে তা বলতে পারে না। ধনপতিকে মনে মনে সে ভয়ও করে। হয়তো ওকে ফেলে রেখেই সে চলে যাবে।

কেষ্ট নস্কর সকালে উঠে মাঠে গেছে চাষের কাজ দেখতে। যাবার সময় বলে গেছে ধনপতিকে ডেকে, 'যাবার নাম কোরো না শালাআশ—এখনো কটা দিন কাটাতে হবে এখানে। নিজের ইচ্ছেয় এয়েচো—যাবা আমার ইচ্ছেয়, বুঝেছো ?'

কেষ্ট নস্কর ক্ষেত-মজুরদের সঙ্গে কাজে চলে গেছে। ধনপতিও সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু কেষ্ট যেতে দেয়নি। বলেছে—বোনাই-এর বাড়ি এয়েচো, কুটুম্বর মতন ঠ্যাং-এর ওপর ঠ্যাং তুলে বসে থাকো, মাঠে যাবা কি ?

এ কথার পরে ধনপতি আর মাঠে যাবার কথা চিন্তা করেনি। বারুণীর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ডিঙি করে বেড়াতে গেছে সাতজেলিয়ার গাঙে।

বেলা তুপুর। আর রোদের জোরও তেমনি। মাঠ থেকে ফিরে এলো কেষ্ট নস্কর। এসে শুনলে ধনপতি এখনো ফেরেনি। সকালে ছেলেমেয়েদের নিয়ে গেছে এখনো তার পাত্তা নেই। বারুণীর মনে চিন্তা—ধনপতি যে-রকম বেতালা মানুষ, তাতে কখন ফিরবে কে জানে! কিন্তু কেষ্ট নস্করের মনে অত চিন্তা নেই। ধনপতি নিজে যাই হোক, এমন বেতালা নয় যে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেশি দূরে কোথাও যাবে।

স্বামী-স্ত্রীতে বসে ধনপতির কথা বলাবলি করছিল, এমন সময় বড়ছেলে সুবল এক ঠোঙা মেঠাই নিয়ে ছুটতে ছুটতে এলো। এসেই বলে, মা—মামার সঙ্গে আজ রাঙাবেলের হাটে গিছিলাম।

—বলিস কি রে, সে তো অনেক দূর! বারুণী বিস্ময় প্রকাশ করে।

—মামার কাছে রাঙাবেলে দূর না। একটানে গেছে একটানে এয়েছে—এই তাখো মামা কত মেঠাই কিনে দেছে।

—তাই নাকি! কেষ্ট নস্কর বলে, কই দেখি—কি মেঠাই ?

—আমরা পেট ভরে খেয়ে এয়েচি খাস্তাগজা, জিলিপি আর বঁদে, এ-সব তোমাদের জন্যে, বলে মেঠাই-এর ঠোঙা বাবার হাতে তুলে দেয় সুবল।

মেঠাই-এর ঠোঙা হাতে নিয়ে বারুণীকে শুনিয়ে কেষ্ট নস্কর বলে, দেখেছো—শালাআশের কাণ্ড কারখানা। আসুক সে—পয়সা যেন গায় কামড়ায়।

বলতে বলতে ধনপতিকে দেখা যায়। তুটো ছেলেমেয়েকে তু' কাঁধে বসিয়ে হনহন করে বাড়ির দিকে আসছে সে। ছেলে-মেয়ে তুটো ধনপতির মাথা ধরে আছে।

উঠোনে এসে ধনপতি ছেলেমেয়ে তুটোকে বলে, কই—নেমে আয়।

—কি করে নামবো, তুমি নামায়ে না দিলে। তুমি যে তালগাছের মতো ঢ্যাঙা—ছেলেটা বলে ওঠে।

হো হো করে হেসে উঠে উঠোনের মাঝখানে নাচতে শুরু করে দেয় ধনপতি।

ছেলেমেয়ে দুটো ভয় পেয়ে ধনপতির মাথা সজোরে জড়িয়ে ধরে। মেয়েটা তো প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি!

শেষটা উঠোনের মাঝখানে উবু হয়ে বসে পড়ে ধনপতি। ছেলেমেয়ে দুটো লাফিয়ে নেমে ছুটে যায় মায়ের কাছে।

দরজার ধারে মুখে হাসি ফুটিয়ে দাঁড়িয়েছিল বারুণী। দেখছিল ধনপতির এই ছেলেমানুষীপনা।

ধনপতির নজর পড়ে বারুণীর দিকে। লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি পরে দরজার ধারে দাঁড়িয়ে আছে বারুণী। দাঁড়িয়ে হাসছে। চোখাচোখি হতেই বারুণী আড়ালে সরে যায়। ধনপতিও আস্তে আস্তে উঠে আসে বারান্দায়। কেষ্ট নষ্করের পিঠে একটা মৃদু চাপড় দিয়ে বলে, অনেক ঘুরে এ্যালাম বোনাই।

—তাতো ঘুরলে, এবারে চলো চান করে আসিগে।

—চলো।

নটবর বসেছিল বারান্দায়। এত সময় সে একটা কথাও বলেনি। এবারে ধনপতিকে ডেকে একটা কথা না বলে পারলো না। বলে, ধনপতি রে—আমার অসুখ না হলি তো তোর এখানে আসা হতো না। এই আনন্দ তোর কপালে জুটতো না।

—যা বলেছো। ধনপতি মাথার চুলে তেল ঘষতে ঘষতে বলে, এতক্ষণ পরে একটা সার কথা শোনলাম তোমার মুখে। গুগ্‌লির ঝোল খেয়ে মুখে বুলি ফুটেছে দেখছি, ডিঙিতে তো 'হোঁচকানি' যাবার জোগাড় করেছিলে।

—তুই ক্যাটক্যাট করে যা তা বলিস নে ধনপতি, নটবর যেন দুঃখের সুরেই বলে, ধনপতিরে আমার শরীরের হাল দেখে তুইও তো ভয় পেইছিলি। তুই তো সাতজেলের ঘাটে ডিঙি বেঁধে আমারে আড়কোলা করে তুলে এনেছিস তোর বোনাই-র বাড়ি। আমি তো বলিছিলাম আমারে মোল্লাখালি নে চল।

—রাগ করলে খুড়ো? রাগ করো না—আমার জিবটা একটু ঝাল-ঝাল, কিন্তু আমার মনটা বোধহয় খারাপ নয়।

—আরে এসো দিকি শালাআশ, বেলা দুপুরে এখন তোমার বকবকানি শুরু হলো—এসো, চান করে আসি, পেটে এদিকে ছুঁচোয় ডন মারে।

কেষ্ট নষ্কর আর ধনপতি চলে গেল স্নান করতে। বারুণী তখন থেকে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল, এবারে বেরিয়ে আসতে নটবর তাকে ডাক দেয়, দিদি—অ বারুণী দিদি।

—কি ঘরামি কাকা ?

—ও দস্যিরে তুমি বাঁধন পরাতে পারবা না। ওরে আমি জানি, তুমিও জানো—ও এক জন্ম্য বাউণ্ডুলে। ওর চলন-বলন সবই বিদ্‌ঘুটে। তবে ভালোর মধ্যে যেটা, সেটা হলো ওর 'রিদয়'—অমন 'রিদয়' দেখিনে। রায়মঙ্গল গাঙ দেখিচি, ওর 'রিদয়' হলো তেমনি।

বারুণী কোনো কথা বলে না, নীরবে দাঁড়িয়ে তার ঘরামি কাকার কথা শোনে। কথা শুনতে শুনতে কেমন যেন উন্মনা হয়ে যায়।

নটবর লক্ষ্য করে বারুণীর ভাবান্তর। বলে, অ দিদি ভাবো কি ?

—কিছু না।

—ঘরামি কাকা সবই বোঝে দিদি। তুমি ওরে সংসারী দেখলে খুশী হও—কিন্তু সংসার ওর জন্যে না। ও ছিল মালকাঠ-ঝাঁকা ধনপতি, হয়েছে নোনা-গাঙের মাঝি ধনপতি। ওর ওপর মাঝে মাঝে খুব রাগ হয়, কিন্তু রাগ করে করবো কি, ও বাউণ্ডুলেটারে যে ভালোবেসে মরিচি।

ভালোবাসা। ধনপতিকে ভালোবেসে মরেছে নটবর—আর বারুণী সেই ভালোবাসার দাম দিতে তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষ করেছে। ধুপের মতো নিজে পুড়ে খাক হয়ে গেছে। সবই তো গেছে হারিয়ে, শেষ পর্যন্ত কেবল একটি কামনাই তার মনে ছিল, ধনপতি সংসারী হোক। একটা জীবন থেকে সেও তার মতো আর একটা জীবনকে খুঁজে পাক। সে কামনা বোধহয় পূর্ণ হবার নয়।

তবুও মনে মনে স্থির-সংকল্প করলে বারুণী, একবার সে নিজে ধনপতিকে বলবে তার মনের বাসনার কথা। কিন্তু ধনপতি যদি তার কথা না শোনে !

বারুণীর মনে আশা, ধনপতিকে সে নিশ্চয়ই রাজী করাতে পারবে। কিন্তু এমন সময়-সুযোগ পাচ্ছে না, যখন ধনপতিকে আড়ালে ডেকে তার মনের কথা বলতে পারে।

আরো দুদিন কাটলো।

আজ রাতটুকু কাটিয়ে ভোরের জোয়ারে ধনপতি চলে যাবে মোল্লাখালি। সেইরকম কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে। এর আগেই সে চলে যেত কিন্তু নটবরের জন্যে যাওয়া হয়নি। এখন পুরোপুরি সুস্থ নটবর। যাওয়ার আর বাধা নেই। রাত পোহালে ভোরের জোয়ারে সে যাবেই। ভোরে চলে যাবার চিন্তা নিয়েই ঘুমিয়েছে ধনপতি।

শেষ রাতে কাক পক্ষী ডাকার আগে ঘুম ভাঙে ধনপতির। উঠে নটবরকে ডাক দেয়।

বিছানায় শুয়ে গড়িমসি করে নটবর। বলে, বোস—আর একটু ঘুমিয়ে নেই।

—আর ঘুমোতে হবে না। জোয়ার লাগলো বলে। বলি এই গনে না বেরুলে আজ আর যাওয়া হবে না। নেও—ওঠো, আর শুয়ে শুয়ে 'ধ্যানাচি' কোরো না। তুমি উঠে পড়ো, আমি মাঠের দিকে গ্যালাম।

ঘর থেকে ধনপতির গলার আওয়াজ পেয়ে বারুণী তাড়াতাড়ি করে উঠে পড়েছে। স্বামীকে ডাকেনি ঘুম থেকে। সে একাই উঠে আবছা অন্ধকারের মধ্যে বাইরের দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়। ধনপতি তখন সদরের দরজা খুলে হনহন করে চলেছে মাঠের দিকে।

বারুণী চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল দাওয়ায় খুঁটি ধরে। ওদিকের ঘর থেকে কখন তার ঘরামি কাকা এসে দাঁড়িয়েছে পাশে, তা সে খেয়ালই করেনি।

—অ দিদি, অমন করে ভাখো কি?

নটবরের কথায় সচকিত বারুণা ফিরে তাকায়। মুখ ফুটে কিছু বলে না। খানিক সময় চুপ করে থাকে নটবর, তারপর অনুচ্চকণ্ঠে বলে, দিদি গো. জারি-জরিনার দলে গান গেয়ে বেড়িয়ে আমার তুটো চোখ ছাড়া আর একটা চোখ হইছিল, সে চোখ দে অনেক কিছু টের পাই। বুঝলে?

—ও-কথা কেন কাকা?

—আমি বুঝতে পেরেছি তোমার মনের বেথা, কিন্তু কি করবা বলো. ধনপতির চরিত্তির আর শোধরাবে না। পাকা বাঁশ কি বেঁকানো যায় সহজে? তুমি ওরে কোনো কথা বোলো না। ও তোমারে নতুন করে দাগা দে যাবে।

বলতে বলতে নটবরের গলার স্বর ভারি হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে বারুণী আর ধনপতির জন্যে ওর মনটা কাতর হয়ে ওঠে। বারকয়েক ঢোক গিলে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে, দেখো দিদি—ধনপতি কোনদিন বেঘোরে হারিয়ে যাবে।

নটবরের কথায় চমকে ওঠে বারুণা। 'ধনপতি কোনদিন বেঘোরে হারিয়ে যাবে' একথার মানে কি!

নটবর সংক্ষেপে বলে যায় ধনপতির হালফিল জীবনের কথা। আগে যাও-বা কিছু হুঁশ-তাল ছিল তার, আজ কাল তাও নেই। চিরদিন খেয়ালী- বাউণ্ডুলে হলেও তার মধ্যে খানিকটা 'সামিঞ্জস্ত' ছিল—কিন্তু কিছুদিন হলো মানুষটা 'বেহিসেবী খেয়াল সব্যস্ব' হয়ে পড়েছে।

কথার মধ্যে নটবর এই ক'মাস বাদা-বনে কাটানোর কথাও বলে যায়।

এইসময় ধনপতি দেখেছে বর্ষার ভরা-গাঙের এপার-ওপার, বাদা-বন, জোয়ার-ভাঁটা। আর নটবর দেখেছে ধনপতিকে। দেখেছে আর ভেবেছে ধনপতির মধ্যে একটা পাগল ঘূর্ণি রয়েছে, সে ঘূর্ণিপাকে জীবনভোর ঘুরে বেড়াতে হবে তাকে।

ধনপতির কথা শুনতে শুনতে বারুণীর দুটি চোখ ছলছল করে ওঠে। মন ভরে যায় নিদারুণ ব্যথায়। মনের সে ব্যথা ওকে বিবশ করে তোলে।

—কই খুড়ো, তোমার হয়েছে? ধনপতি উঠোনে এসে দাঁড়ায়। নটবর আর বারুণীকে এক নজরে দেখে বলে ওঠে, কি কথা কইছিলে তোমরা?

—কথা কতো রকমের হয়। নটবর বলে, কথার কি কূল-কিনেরা আছে। ধনপতিও হঠাৎ যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

নটবর ডাকে, অ ধনপতি—কি হলো রে তোর! অমন করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

ধনপতি সচকিত হয়ে ফিরে তাকায়। এইমাত্র বারুণী দাঁড়িয়েছিল এখানে, পলকের মধ্যে সে চলে গেছে চোখের আড়ালে।

ধনপতি চিৎকার করে ডাকে, অ বোনাই—বোনাই।

ওর ডাক শোনার আগেই কেষ্ট বিছানা ছেড়ে উঠেছে! ডাক শুনতে পেয়ে বাইরে আসে। শুধোয়, সত্যি চলে যাবা নাকি শালাআশ?

—সত্যি নয়তো মিথ্যে নাকি। ধনপতি বলে, আজ যাই, যাতায়াতের পথে আবার আসবো। আসা-যাওয়া তো আছেই। তা, তুমি যদি এর মধ্যে মোল্লাখালি যাও তো দেখা কোরো। কেমন?

—বেলা উঠলে গেলে পারতে। কেষ্ট নস্কর বলে, এখুনি যাবা কি করতি?

—না, এই গনেই টেনে বেরিয়ে যাই। ধনপতি বলে, এসো না—ঘাট পর্যন্ত যাবা।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল বারুণী। বাইরে এসে বলে, তা তোমাদের জন্যে যে পান্তা রেখেছি, দুটো করে পান্তা খেয়ে যাও।

—আবার পান্তা। ধনপতি বলে, তা নাম করে রেখেছো যখন দেও—কি বলো খুড়ো, দুটো খেয়েই যাই?

উঠোন থেকে আবার দাওয়ায় উঠে আসে ধনপতি।

দু'টি থালায় করে পান্তা-ভাত আর বোয়াল মাছের টক এনে দেয় বারুণী।

পান্তা খেতে আর কতটুকু সময়। খেয়েদেয়ে ধনপতি উঠে পড়ে। বারুণীর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তোমার ঘরে কদিন বেশ আরামে ছিলাম বারুণী। কিন্তু কি করবো, ঘরের আরাম আমার জন্যে না, বুঝলে?

বলে ধনপতি হো হো করে হেসে ওঠে।

কেষ্ট নস্কর বলে, শালাআশের হাসিটা ঠিক আছে।

—এই হাসি নিয়েই তো আছি। হাসতি জানলি জগৎ 'পোসকার'—বুঝলে বোনাই।

বলে ধনপতি আরো একদফা হাসি হাসে।

হাসতে হাসতে সে ভেড়ি-পথের ওপর দিয়ে সাতজেলিয়ার হাটখোলার ঘাটের দিকে চলে। যে ঘাটের নাম রেখেছে সে বারুণীবালার নামে।

গাঙ-ধারে এসে দাঁড়ায় ধনপতি।

বারুণীবালার ঘাটে টলমল করছে জোয়ারের জল।

॥ বারো ॥

ভরা জোয়ারে মোল্লাখালির ঘাটে ধনপতির ডিঙি ভিড়লো।

তখন রাত। ঘাটে কেবল কয়েকটি ডিঙি গেরাবি করা। অন্ধকারে গাঙের কিনারায় ডিঙি গেরাবি করে রাখলো ধনপতি।

পাশেই একটা জেলেডিঙি বাঁধা। ডিঙির মাঝি বোধহয় ঘুমিয়েছিল, ধনপতির ডিঙির মাথার ঠোক্কর লেগেছে জেলেডিঙির ছই-এ। ঠোক্কর-খাওয়া ডিঙির মাঝির ঘুম ভেঙে গেছে। তিরিক্ষি স্বরে জিজ্ঞাসা করে, কেডা—ডিঙির গায়ে ধাক্কা দেও কেডা?

—আমি ধনপতি। তুমি কে—সনাতন নাকি?

—গলা শুনে ঠিক চিনেছো তো? সত্যি তুমি এলেমদার বটে।

জেলে-ডিঙির মাঝি বিছানা ছেড়ে উঠে ছই-এর বাইরে আসে। জিজ্ঞাসা করে ধনপতির খবরাখবর।

মোল্লাখালির ঘাট পারাপারের মাঝি সনাতন কয়াল। বাড়ি ওর বয়ারমারি। মোল্লাখালির ঘাটে মাঝিগিরি করছে সাত-আট বছর।

ধনপতির নিজের কথা বলা হলে সেও মোল্লাখালির খবর নেয়। নতুন কিছু

খবর নেই মোল্লাখালির। তবু সনাতনের কথার ধরনে বোঝা যায়, ও ধনপতিকে কোনো একটা বিশেষ খবর জানাতে চায়। কিন্তু কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারছে না যেন।

—এখন বাড়ি যাবা, নাকি ডিঙিতে থাকবা? জিজ্ঞাসা করে সনাতন।

—ডিঙিতেই থাকবো। এই ডিঙিই এখন আমার ঘরবাড়ি। যাতি হয় তাই মাঝে মাঝে বাড়ি যাই। ধনপতি উত্তর দেয়।

—বাড়িতে গে আর কি করবা? শেষপর্যন্ত সনাতন বলেই ফেললো কথাটা, তোমার ঘরের আর দ্যাখবার হাল নেই।

—তার মানে!

—কদিন আগে যে বাদ্‌লা হলো না—তারপর ঝড়ও হইছিল, সেই ঝড় বাদলে তোমার ঘর গেল।—সনাতন একটু সান্ত্বনার সুরেই বলে, যাবার আগে ঘরের চালে যদি দুটো খড় গুঁজে দে যেতে, তাহলি কমা সারা হতো না। তা যদি না দিয়ে গেলে, তবে একটা কারুরে মুখের কথা তো বলে যেতে পারতে।

সনাতনের মুখে ঘর ভেঙে পড়ার কথা শোনার পরেও ধনপতি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর কতকটা আপন মনেই বলে উঠলো, ভাঙুক গে ঘর, না তো ডোবেনি।

আপন মনে বললেও কথাটা স্পষ্ট করেই বলেছে ধনপতি। শুনতে পেয়েছে নটবর। ধনপতির কথার পিঠেই নটবর ডাকে, ধনপতি অ ধনপতি, ভাঙা ঘরটা একবার দেখতিও কি তোর মন চায় না?

—এখন তো চাইছে না। ধনপতির কণ্ঠস্বর নিস্পৃহ ধরনের। বলে, বুঝলে খুড়ো, ঘর যে ভাঙবে তাতে আর আশ্চয্যি কি। এ্যাদ্দিন যে ঘর খাড়া ছিল সে-ই আমার বাপ মায়ের ভাগ্যি। গেছে যখন একেবারেই যাক, ও ভাঙা ঘর মেরামতের তালে আমি নেই। আমার এই ডিঙি বেঁচে থাক, বেঁচে থাক গুরুপদ হাউলির নাম, কি বলো খুড়ো?

—আমি আর কি বলবো। তুই তো বলিস, তোর জন্মের কালে কুগ্রেহ'র দৃষ্টি পড়েছিল, ও গ্রেহর বিধেনের নিদেন নেই। নে—এবারে আয় দিকি ডোরার দিকে, যা খাবি খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়। এদিকে রাত কাবার হবার যোগাড় হলো দেখি।

ডোরায় কেরোসিনের কুপীর আলোয় নটবর দুটো সানকিতে ভাত বাড়ে।

ভাত আর নোনা গুলের ঝোল। বিকেলে রান্না করে রেখেছে, আর এই মাঝ রাতে খাওয়া।

ভাত বাড়া হলে নটবর ডাক দেয় ধনপতিকে। হাতে মুখে জল দিয়ে ধনপতি ডোরার কাছে এসে বসে। ভাতের সানকিটা কোলের কাছে টেনে নেয়।

খেতে বসে একটি কথাও বলে না ধনপতি। নীরবে মাথা গুঁজে খাওয়ার পাট চুকিয়ে নেয়। ধনপতির থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে নটবরও কিছু বলতে চায় না। ধনপতির চরিত্র তার জানা। ভাবান্তর ঘটলে ধনপতি এমনই উন্মনা হয়ে থাকে। এ সময়ে কথা বললে হয় চটে উঠবে, না হয় পাগলের হাসি আর বকবকানি শুরু করবে।

নীরবে খাওয়ার পালা চুকিয়ে যে যার মাদুর কাঁথা বিছিয়ে ছইয়ের নিচে পাশাপাশি শুয়ে পড়লো।

ছদিন মোটামুটি ভালোই ছিল আকাশ। সেদিন শেষ রাতে আকাশে আবার মেঘ জমতে শুরু হলো। ছিটেফোঁটা বৃষ্টিও পড়তে থাকে। কিন্তু বৃষ্টি যত না, মেঘ গর্জন তত। সেকি ডাক আর বিদ্যুতের ঝলকানি!

মেঘের ডাকে নটবরের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, পাশ ফিরে কানে হাত চাপা দিয়ে শুয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু অঘোরে ঘুমোচ্ছে ধনপতি। মেঘ যত ডাকে তার নাকে তত ডাক।

জোয়ার শেষ হয়েছে। ভাঁটার টান লেগেছে গাঙের জলে। সাগরের হাওয়ার দাপটে গাঙের জলে জেগেছে উথালিপাথালি ঢেউ।

স্রোতের বিপরীতে বাতাস বইলে ঢেউ-এর দাপট বাড়ে। তারপর বর্ষাকালের গাঙ।

শেষ রাতের আকাশে জমাট-বাঁধা কালো মেঘ। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে ক্ষণবিদ্যুতের দীপ্তি মাঝে মাঝে অন্ধকারকে ভেঙে খান খান করে দিয়ে যাচ্ছে। পরক্ষণে সে অন্ধকার আরো যেন ঘন হয়ে উঠছে।

মোল্লাখালির ঘাটে গেরাবি করা কয়েকটি ছোট-বড় ডিঙি, তাতে জন-কয়েক ঘুমন্ত মানুষ। এরা যেন আর এক পৃথিবীর বাসিন্দা—যে পৃথিবীতে আলো নেই, শুধু অন্ধকার।

ঘুম ভেঙে গেছে ধনপতির। উঠে বসেছে ছইয়ের মুখের কাছে। চেয়ে আছে ঘন অন্ধকারে ভরা দিগন্তের দিকে।

দিগন্ত জুড়ে জমাট বাঁধা কালো মেঘ। ধনপতি জানে, সূর্যের মুখ দেখা যাবে না, তবু সে চেয়ে আছে পূব দিগন্তের দিকে। সূর্য দেখা না দিক, রাতের অন্ধকার তো ঘুচে যাবে। একটু আলোর আভাস তো চোখে পড়বে।

রাত শেষ হলো। পূব দিগন্তে এক জায়গায় পাতলা মেঘের আবরণ : সেখানে আলোর স্পষ্ট আভাস।

ডিঙির গলুই-এর ওপর দাঁড়িয়ে ধনপতি ফিরে তাকালো চারদিকে। তিন মাস পরে মোল্লাখালিতে ফিরে এসেছে সে, তাইতো পুরনো পরিবেশকে নতুন করে দেখার শখ।

কিন্তু কিছু ভালো লাগছে না ধনপতির। আবার সে ছই ঠেস দিয়ে বসলো।

জাগো ওগো রাধা সখি নিশি পোহালো,
জাগো ওগো বৃন্দাদূতী জাগো সখিগণ,
ফিরে ভ্যাখো কুঞ্জে কৃষ্ণ নাই—
জাগো ওগো বিনোদিনী রাই।
সে কালা-কিশোর গেছে, গেছে আন ঘরে,
গেছে কোথা লো—
জাগো ওগো রাধাসখি নিশি পোহালো।

নটবর নয়, ওপাশের আর একটি ডিঙি থেকে হারমোনিয়মের সুরের সঙ্গে গানের কথাগুলো ভেসে আসছে। ভারি মিষ্টি এ সুর।

গান শেষ হতে ধনপতির ইচ্ছে হয়, ডেকে জিজ্ঞাসা করে, কে গাইছে এ গান। কণ্ঠস্বরে ধনপতির অনুমান হয়, এ গানের কণ্ঠ অনেক দিন গানের তালিম নিয়েছে। এমন সুর সাধা-গলা ছাড়া আসে না।

ডেকে জিজ্ঞাসা করতে হলো না ধনপতিকে। দেখতে পেলো অদূরে একটা ডিঙির আড়ালে আর একটা বড় ডিঙি। গয়নার নৌকোর মতো মনে হলো দূর থেকে। একটু নজর রেখে দেখলো, গয়নার নৌকোই বটে। সে নৌকোর ছই-এর ওপর একজন বাউল গোছের মানুষ পিছন ফিরে বসে। হাতে একটা গুপীযন্ত্র :

ধনপতির ইচ্ছে হলো লোকটির সঙ্গে আলাপ করে। আলাপ করে তার কাছ থেকে আরো দুটো গান শোনে। কিন্তু ইচ্ছে হলেও ধনপতির ইচ্ছা পূরণ হলো না। সে গয়নার নৌকো গেরাবি তুলে ভাঁটার টানে চলতে শুরু করেছে। ডিঙিটা একটু এগিয়ে যেতে দেখতে পেল, ছইয়ের ভিতরে আরো

কয়েকজন বাউল গোছের মানুষ। নিশ্চয়ই কোনো গানের দল হবে, কোথাও বায়না পেয়ে গাইতে চলেছে।

সে গয়নার নৌকো মোল্লাখালির ঘাট পেরিয়ে চলে গেল। ধনপতি কিছুক্ষণ চলমান নৌকোর দিকে তাকিয়ে রইলো।

গানটা শোনার পর থেকে ধনপতির মনটা অনেকখানি হালকা হয়ে গেছে। সাদা মনে চিন্তা করতে পারছে। নয়তো শেষ রাতে খানিক সময়ের জন্যে ঘুমিয়ে সেই যে ছইয়ের মুখে বসেছিল ধনপতি, তখন থেকে ওর মনটা কেমন যেন শিথিল হয়ে পড়েছিল। বৃন্দাবনে থাকতে ওর মনটা ভরে থাকতো এক আনন্দ-রসে। বৃন্দাবন থেকে ফিরে কদিন সাতজেলিয়ায় বারুণীবালার বাড়িতে ছিল, সে-কটা দিনও আনন্দে ভরা ছিল, কিন্তু মোল্লাখালির গাঙে পৌঁছেই সে আনন্দ কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

কাল রাতে সনাতন কয়ালের কাছ থেকে ঘর ভেঙে যাওয়ার খবর শুনে ও মুখে যে কথা বলুক, মন কিন্তু সে কথায় সায় দেয় নি। অনেক সাধের ঘর তার। ও ঘর বেঁধেছিল বিশ বছর আছে। তখন ওর মা বেঁচে, তখনো বারুণীর প্রেমে ও পূর্ণ। ওর ঘর কেমন হবে, বারুণীর সেজন্যে কম মাথাব্যথা ছিল না। থাকাই তো স্বাভাবিক। ওর ঘরই তো বারুণীর ঘর। বারুণী বলেছিল, চালের বাতায় বেতের 'নশকা বাঁধন' দিতে। বলেছিল, জানালা-দরজার মাথায় 'ফুল তারা' আঁকতে। ঘরের কুলুঙ্গি কেমনতরো হবে, মাটির ওপর কাঠি দিয়ে আঁক কেটে দেখিয়ে দিয়েছিল সে। তাছাড়া আরো কত রকমের কথা। ধনপতি ঘাম ঝরানো পয়সা দিয়ে গুরুপদ হাউলির দেওয়া জমিতে মন-পছন্দ আটচালা তৈরি করেছিল। মালকাঠ-ঝাঁকা ধনপতির ঘর কি যেমন-তেমন হতে পারে! সত্যি, ধনপতির নতুন ঘরের 'চেকনাই বাহার' দেখে সবাই বলতো—এই না হলে ঘর।

ধনপতির সেই ঘর ভেঙে গেছে। সেই ঘরটা হয়তো ভেঙেছে এই বর্ষায়, কিন্তু ধনপতির কাছে সে-ঘর অনেকদিন আগেই ভেঙে গেছে।

নটবর ঘুম থেকে উঠে ধনপতিকে গলুই-এর ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করে, কি দেখিস রে ধনপতি?

ধনপতি বলে, কিছু না।

নটবর বলে, পারে নামবি নাকি? তুই না নামিস তো ডিঙিটা পাড়ে

লাগিয়ে দে, আমি নেমে যাই! মাটিতে পা না দিতে পারলে স্বস্তি হচ্ছে না। মোল্লাখালির মাটিতে কদ্দিন পা দেইনি বলতো?

লগি দিয়ে ঠেলে ডিঙির মুখ পাড়ে লাগিয়ে দিল ধনপতি। নটবরের তর সয় না, টপ করে লাফিয়ে নেমে পড়ে এঁটেল কাদার পারে। পা পিছলে কাদার মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে। সারা মুখ ভরে যায় নোনা কাদায়। চোখের মধ্যেও কাদা।

নটবরের অবস্থা দেখে ধনপতিও তাড়াতাড়ি ডাঙায় নামে। কোশ করে জল তুলে ধুয়ে দেয় নটবরের চোখ। বলে, দেখে শুনে নামতি পারো না, এখনো কি তোমার লাফাবার বয়েস আছি নাকি!

গামছা দিয়ে মুখ মুছে নটবর বলে, পেছলা কাদায় পড়তে আবার বয়েস লাগে নাকি?

ধনপতি হেসে বলে, অ—আমারই হিসেবে ভুল হয়ে গেছে। নেও—চলো. নামলাম যখন পারটা এক চক্কোর ঘুরে আসি।

নটবর গেল নিজের ঘরের দিকে। ধনপতিও নিজের মতো পাড়া ঘুরতে বেরোলো। সারাদিনের মধ্যে আর ডিঙিতে ফিরে আসা হলো না ধনপতির। সম্পর্কে মামা হয়, মুচকুন্দ হালদার—দুপুরে না খাইয়ে ছাড়লো না। তারপর আরো এ-পাড়া ও-পাড়া ঘোরা তো আছেই। সারাদিন গাঁয়ের এ-বাড়ি সে-বাড়ি ঘুরে সন্ধ্যের পর এলো নিজের ঘরে। দেখলো ভাঙা ঘরের অবস্থা। পুবের দেয়াল ধ্বসে গেছে, পড়ে গেছে চালের খানিকটা অংশ। সামনের দাওয়া ভেঙে গেছে, খুঁটির গোড়া পচে যাওয়ার দরুণ চালও খসে পড়েছে। ঘরের যেটুকু দাঁড়িয়ে আছে সেটুকু না থাকলেই যেন ভালো হতো।

উঠোনে দাঁড়িয়েই ঘরের অবস্থা দেখলো ধনপতি। খানিক সময় দাঁড়িয়ে থেকে তারপর উঠানের কোণে ঝাঁকড়া কাঠ-টগরের গাছটার পাশে এসে দাঁড়ায়।

অজস্র ফুল ফুটেছে কাঠ-টগরের গাছে। প্রতি পল্লবে ফুল। টগর গাছটার সঙ্গে একটা স্মৃতি জড়িয়ে আছে। বারুণী পুতেছিল এটা। তারপর এই গাছটা বড় হতে ফুল ধরলো। মনে আছে, বারুণী টগরের কুঁড়ি নিয়ে গড়ে-মালা তৈরী করে কত সময় খোঁপায় দিয়েছে।

সেই সব পুরনো কথাগুলো ধনপতির মনে পড়তে চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো ওর বুক থেকে। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দে নিজেই চমকে ওঠে ধনপতি।

পুরোনো স্মৃতি আজ আর আনন্দ দেয় না, বরং একটা অব্যক্ত বেদনার ঢেউ ওর মনের কিনারে আঘাত করতে থাকে। আগে সহ্য করতে পারতো

সে আঘাত, আজকাল বড্ড বেশি করে বাজে, আর কেমন যেন অসহ্য বোধ হয়।

—ওখানে দাঁড়িয়ে কেডা ধনপতি নাকি? অ—ধনপতি?

ধনপতির বাড়ির সামনে দিয়ে গ্রামে ঢোকার পথ। পথের ওপর থেকে কে একজন ডাকছে।

—কে ডাকো? ধনপতি সাড়া দেয়।

—পাঞ্জাতন। ঠিক ধরিচি, এ-মানুষ ধনপতি ছাড়া আর কেউ নয়। বলি মালকাঠ-ঝাঁকা ধনপতির ছায়া দেখলেই চেনা যায়।

ধুতুরদহ'র পাঞ্জাতন গাজী, ধনপতির যৌবনকালের সাগরেদ। মোল্লাখালির পাশের গ্রাম ধুতুরদহ, সেখান থেকে রোজ সন্ধ্যেবেলা কর্ম বাউলির আখড়ায় মাল কাঠ ঝাঁকতে আনতো পাঞ্জাতন। ধনপতির সঙ্গে 'দোস্তী' পাতিয়েছিল। দু'জনের ভাব ছিল গলায় গলায়। কর্ম বাউলি মরে গেল, তার আখড়াও উঠে গেল। ধনপতি আর পাঞ্জাতন চেষ্টা করেছিল আখড়াটা বজায় রাখতে। কিন্তু পারলো না। তারপর দিনকাল সব সময় একরকম থাকে না, কাজের তাগিদে জীবনের সবকিছু বদলে যায়। পাঞ্জাতন বিয়ে থা করে সংসারী হলো। মাল-কাঠ ঝাঁকলে তো আর পেটের ভাত হবে না। সংসার ছেড়ে কথা কয় না—সংসারের জোয়াল কাঁধে চাপলো তো এদিক-ওদিক সব গেল।

বিয়ে-সাদি করে পাঞ্জাতন মুদির দোকান দিলে মঠবাড়ির হাটখোলায়। ধুতুরদহ ছেড়ে গেল দুটো পয়সা রোজগারের ধান্দায়। প্রথম প্রথম গ্রামে আসতো পাঞ্জাতন, দেখা সাক্ষাৎ হতো ধনপতির সঙ্গে। পরে ধুতুরদহের বাস তুলে উঠে গেল মঠবাড়ি। সেখানেই বাড়ি ঘর করে পাকাপোক্ত হয়ে বসলো। তারপর থেকে ধনপতির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। সেও প্রায় বারো চোদ্দ বছর হলো।

এত দিন পর দুই বন্ধু পরস্পরকে পেয়ে যেন খুশীই হয়েছে। পাঞ্জাতন জড়িয়ে ধরেছে ধনপতিকে, কিন্তু ধনপতির মন আজ সব রকমের আবেগ উচ্ছ্বাস হারিয়ে ফেলেছে।

পাঞ্জাতন বলে, তোর সব খবর রাখি ধনপতি, বলতে পারিস—তুই এমন করে জীবনটারে বরবাদ করে দিচ্ছিস কেন?

ধনপতি উত্তর দেয়, সে কথা তুই বুঝবি নে পাঞ্জাতন।

—বোঝাবুঝির কি আছে। সবাই যা করে তোর তাই করাই উচিত ছিল। বে-সাদি করলি নে; ভালো মন্দ বুঝলি নে, বুড়ো হলে ছাখবে কে? রক্তের

জোর চিরদিন থাকবে না। আত্মজন কাছে না থাকলি নিদেন কালে কেউ এক ফোঁটা জল মুখে দেবে না। বুঝলি ?

ধনপতি নীরবে শুনে যায় পাঞ্জাতনের কথা। আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম অনেক কথা বলে যায় পাঞ্জাতন। সব কথা তার ধনপতির ভবিষ্যৎ নিয়ে।

ধনপতি কথা না বললেও, সে মনে বোঝে পাঞ্জাতন যা বলছে, তাকে ভালোবাসে বলেই বলছে।

বেশ কিছু সময় ধরে পাঞ্জাতন এক তরফা বকে গেল। তারপর কি মনে করে জিজ্ঞাসা করে, এখনো চল্লিশের ধাক্কা আসেনি, পারিস তো দেখে শুনে একটা বে-সাদি কর।

এবারে মোক্ষম কথা বলেছে পাঞ্জাতন। ধনপতি হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে। তারপর হাসতে হাসতে বলে, আর কদিন পাঞ্জাতন। জীবনটারে তো পার করে দিছি।

—তুই এখনো তেমনি আছিস দেখি। হাসি রোগটা এখনো গেল না।

—ও রোগ যাবে না রে। দেখিস—আমি হাসতে হাসতে ফুরিয়ে যাবো। ছোটবেলায় অনেক দিন মাল কাঠ ঝেঁকেছি, মনটা সেই মালকাঠের মতো শক্ত হয়ে গেছে।

বলে খানিক সময় চুপ করে থাকে ধনপতি। ভাবে, পাঞ্জাতন কিছু বলবে। কিন্তু পাঞ্জাতন আর কোনো কথাই বললে না। শুধু ধনপতির মুখের দিকে চেয়ে রইলো হতভম্বের মতো।

—আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবি পাঞ্জাতন ? কিছু সময় নীরব থেকে ধনপতিই জিজ্ঞাসা করে।

—কোথায় ?

যাবি কিনা বল ?

—কিন্তু আমায় যে ধুতুরদ' যাতি হবে। চাচার মেয়েরে দেখতি আসার কথা আছে।

—যাবি তো ধুতুরদ'—সে তো দু'পা রাস্তা। নে—চল তুই আর আমি এক জায়গায় যাই।

—চল, দেখি কোথায় নে যাস তুই। পাঞ্জাতন বলে, না বললেও তো তুই শুনবি নে।

ভেড়িপথ দিয়ে ধনপতি আর পাঞ্জাতন চলেছে কর্ম বাউলির আখড়ার দিকে।

আখড়ার নামই শুধু আছে, আখড়া নেই। কেবল গাঙধারের চরে পড়ে আছে সেদিনের সেই মালকাঠগুলো।

অন্ধকারের মধ্যে ধনপতি আর পাঞ্জাতন মালকাঠগুলোর মধ্যে এসে দাঁড়ায়। কিছু সময়ের জন্যে দুজনেই যেন সব রকমের খেই হারিয়ে ফেলে। মালকাঠগুলো পড়ে আছে এখানে ওখানে। যেন বিগত দিনের কঙ্কাল।

—পারবি পাঞ্জাতন মালকাঠ ঝাঁকতে?

ভাঙা ভাঙা শোনায় ধনপতির কণ্ঠস্বর। সে কণ্ঠস্বরে প্রাণ নেই।

—পারবো না ধনপতি। শরীরে আর সে বল নেই।

—তবে দাঁড়া, দ্যাখ আমি ঝাঁকি।

সামনে একটা মাঝারি গোছের মালকাঠ। ধনপতি হঠাৎ কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে পড়ে। দুহাতে ধরে মালকাঠের মুঠো। 'হোঁক্কোর' দিয়ে মালকাঠ তুলে ঝাঁকতে থাকে। এক দুই তিন, চারবারের পর আর পারে না সে, ফেলে দেয় মালকাঠটা। অথচ এই মালকাঠ এক নাগাড়ে বিশ পঁচিশ বার ঝেঁকেছে সে। আর আজ তিনবার ঝেঁকেই সে হাঁপিয়ে উঠেছে।

—আমি যাই ধনপতি, পাঞ্জাতন বলে, তুইও যা। মিছে ওসব নাড়াচাড়া করছিস। দিন কি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে রে!

—তুই যা। ধনপতি বলে, আমি একটু থাকি এখানে।

পাঞ্জাতন চলে যাওয়ার পরেও ধনপতি অন্ধকারে গাঙ-চরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে ছায়ামূর্তির মতো। পুরনো দিনের আখড়ার মুখর ছবিটা ওর চোখের সামনে। বিকেলে মোল্লাখালির জোয়ান ছেলেরা আসে কর্ম বাউলির আখড়ায়। আখড়ার মধ্যমণি কর্ম বাউলি। শুধু মালকাঠ ঝাঁকা নয়, মাঝে মাঝে মেঠো-কুস্তি, লাঠিখেলা, সড়কি চালার কসরতও চলতো। শীতের দিনে চাঁদনী রাতে কর্ম বাউলি আয়োজন করতো নৌকো বাইচের। সে-সব ছবিও স্পষ্ট হয়ে ভাসে ধনপতির চোখের সামনে।

অন্ধকারে মাঠের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে ধনপতি সেই পুরনো দিনের ছবি দেখে।

আকাশে মেঘ জমেছে। গাঢ় মেঘ। বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। হয়তো বৃষ্টি নামবে। এদিকে রাতও ক্রমে গভীর হয়েছে। ধনপতির কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে একা অন্ধকারে সেই গাঙ-চরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সম্মোহিতের মতো।

একটা ফোঁস-ফোঁসানির শব্দে চমক ভাঙে ধনপতির। অদূরে গাঙ-পারের

ভেড়ির ধারে কিসের যেন চাপা ফোঁস-ফোঁসানি। এ শব্দ ধনপতির জানা। এ নিশ্চয়ই 'গিধে ভাঙা কেউটে'র আওয়াজ।

চমক ভাঙতে ধনপতি ফিরে চায় আকাশের দিকে। জমাট-বাঁধা কালো মেঘ সারা আকাশ জুড়ে। বাতাস নেই, মনে হয় বৃষ্টি নামবে এখনি।

সে আওয়াজটা এখনো উঠছে। ধনপতি কান পেতে শোনে সে আওয়াজ। তারপর সেই আওয়াজ অনুসরণ করে পা চালায় ভেড়ির দিকে। কিন্তু ঘন অন্ধকারে কোনো কিছু ঠাওর করতে পারে না। ফোঁস-ফোঁস আওয়াজটা শুধু আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

—ধনপতি—ধনপতি—অ ধনপতিরে এ-এ—।

নটবরের উচ্চকণ্ঠের ডাক শুনতে পায় ধনপতি। আলের ওপর উঠে দাঁড়ায়। দূরে ভেড়ির ওপর দিয়ে হ্যারিকেন হাতে আসছে নটবর।

—খুড়ো, অ খুড়ো, আমি এখানে···এ···এ···এ··· ধনপতির কণ্ঠস্বর এই গভীর রাতের নীরবতাকে ভেঙে খান খান করে দেয়। দূরে মোল্লাখালির বসতি অঞ্চল থেকে কয়েকটা কুকুর প্রায় একই সঙ্গে ডেকে ওঠে।

চরে পৌঁছেই নটবর বলে ওঠে, তোর কী আক্কেল রে ধনপতি—সেই তখন বেরোইছিস, আর রাত শেষ হতি যায় এখন। ইহকালে তোর হিসেব জ্ঞান হবে না। তুই মানুষ, না কি ?

ধনপতি বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, বলো কি খুড়ো, রাত শেষ হবার জো হয়েছে ?

—হ্যাঁ। দু'পহরের শিয়েল ডেকেছে সেই কখন—কি করিস এখানে ?

—খুড়ো আমারে তুমি যত খুশি বকো, আজ আর রাগ করবো না।

সেই ফোঁস ফোঁস আওয়াজটা আবার ধনপতির কানে আসে। নটবরও শুনতে পায় সে আওয়াজ। শুনেই নটবর দু'হাত পেছিয়ে যায়। ভয়ে ভয়ে বলে, চলে আয় ধনপতি—সাক্ষাৎ যম রয়েছে কাছে-পিঠে।

—আলোটা দেও খুড়ো—দেখি কোন ঠাঁই সে মক্কেল আছে।

—থাক, আর দেখতি হবে না। আয় দিকিনি।

চরের পারে ভেড়ি। ভেড়ির ওপর উঠেই নটবর লাফিয়ে পড়ে ভেড়ি থেকে। সেই সঙ্গে ধনপতিও। ভেড়ির ফাটলের মুখে বিরাট একটা কাঁকড়া কেউটের মাঝামাঝি জায়গায় দুটো দাঁড়া দিয়ে কামড়ে ধরে রেখেছে। ফাটলের মুখে কাঁকড়াটা এমন ভাবে রয়েছে, যেখানে কেউটের ছোবল পৌঁছয় না।

অথচ থেকে থেকে কেউটেটা ছোবল মারছে ঝাটলের মুখে। আর সেই সঙ্গে ফোঁস ফোঁস শব্দ করছে।

ধনপতি বলে, আলোটা দেও খুড়ো—দেই ওটারে শেষ করে। নয়তো ভেড়িপথে রাত বিরেতে চলতে কেউ হয়তো ঠাওর করতি পারবে না।

—থাক, শনিবারে আর ও কাজটা করিস নে। নে—চল, এখন মা মনসার নাম নে যেখানকার মানুষ সেখানে ফিরে যাই।

দাঁড়িয়ে থেকে কি যেন ভাবে ধনপতি। তারপর বলে, তাই চলো খুড়ো, তোমার কথাই থাক।

ভেড়ি পথ ধরে ওরা এগিয়ে চলে।

একটা কুকুর ভেড়ির ওপর দিয়ে এই দিকেই ছুটতে ছুটতে আসছে। পিছনে আরো কয়েকটা কুকুর। বোধহয় হাটখোলার বেওয়ারিশ কুকুর ওগুলো। এক দঙ্গল কুকুর থাকে হাটখোলায়।

হঠাৎ একটা কুকুর আর্তস্বরে ককিয়ে উঠলো। আর আর কুকুরগুলো তারপরেই চুপ করে গেল। এই রাতের অন্ধকারের কুকুরের আর্তস্বর একটা করুণ অবস্থার সৃষ্টি করলো। কুকুরটা যেন কাঁদছে।

নটবরের বাধা মানলো না ধনপতি। আলো নিয়ে হনহন করে ছুটে চললো ভেড়িপথে। দেখলো, ভেড়ির নিচে 'আছাড়ি-পিছাড়ি' করছে হাটখোলার খেয়াঘাটের সেই জোয়ান কুকুরটা। আর কুকুরগুলো তাকে ঘিরে কাঁউ কাঁউ আওয়াজ করছে। আর সেই কাল-কেউটের ফোঁসফোঁসানি তখনো বন্ধ হয়নি।

ধনপতির মাথায় রোখ চেপে গেল। ছুটে গেল চরের দিকে। তুলে আনলো ছোট একটা মালকাঠ। তারপর কেউটের মাথা লক্ষ্য করে মাল-কাঠটা সজোরে ছুঁড়ে মারলো। মালকাঠের আঘাতে থেঁতলে গেল কেউটের মাথা।

ভেড়ির নিচে কুকুরটা তখনো ছটফট করছে কেউটের তীব্র বিষের জ্বালায়। কুকুরটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো ধনপতি। তাকে দেখে কুকুরটা হিঁচড়ে হিঁচড়ে সরে এসে লুটিয়ে পড়ে ধনপতির পায়ের ওপর।

কুকুরের চোখেও জল ঝরে। মৃত্যুযন্ত্রণায় অস্থির হয়ে জোয়ান কুকুরটা কাঁদছে জীবনের মায়ায়। এখন শুধু কুঁই-কুঁই আওয়াজ করছে। ওর কান্নার ভাষা এই। আর কুকুরগুলো চক্রাকারে বসে। তাদের চোখেও জল ঝরছে।

ধনপতির মাথাটা কেমন যেন গুলিয়ে যায়। সব যেন বেঠিক হয়ে গেছে, নয়তো মৃত্যুযন্ত্রণায় অস্থির কুকুরটার জন্যে ওর চোখে জল ঝরবে কেন? ধনপতির চোখের জল, সে তো এক আশ্চর্য বস্তু।

ধনপতি স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। কেউটের ছোবল খাওয়া কুকুরটা দেখতে দেখতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

—ধনপতি, আর কত সময় দাঁড়িয়ে থাকবি?

ধনপতি হাতের আলোটা তুলে দেয় নটবরের হাতে। তারপর নীরবে নটবরকে অনুসরণ করে ভেড়িপথে এগিয়ে চলে হাটখোলার দিকে।

হাটখোলায় পৌঁছতে না পৌঁছতে মুষলধারে বৃষ্টি নামলো।

জল পড়তে না পড়তে ভেড়িপথ পিছল হয়ে যায়। সেই পিছল পথ ধরে দুজনে এগিয়ে চলে হাটখোলার দিকে।

বৃষ্টিতে ভিজে 'চাপুরচোপর' হয়ে নটবর আর ধনপতি হাটচালায় এসে আশ্রয় নিলে।

ধনপতি সেই থেকে একটি কথাও বলেনি। নটবর বুঝতে পারে ধনপতির দুঃখটা কোথায়। বলে, একটা কুকুরের জন্যে তোর এত ভাবনা—আমি বলি এবার তুই একটু নিজের জন্যে ভাব।

—তুমি কি মনে করো খুড়ো নিজের জন্যে আমি কিছু ভাবি নে।

—কই ভাবিস?

—বলো কি! তোমার চোখ নেই তাই দেখতি পাও না, তোমার মন নেই তাই বুঝতি পারো না। তবে বলতি পারো আমার যত ভাবনা, তার সব ভাবের ভাবনা। নেও ওসব কথা বাদ দেও খুড়ো। এখন অন্য কথা বলো, তাই শুনি। না হয় একটা ভাবের গান গাও। মনটা আজ আমার ভালো নেই খুড়ো।

—ধনপতি, একটা কথা তুই শুনে রাখ, নটবর বারকয়েক ঢোক গিলে বলে, তোর ক্ষ্যাপা মনটারে এখনো যদি না বাঁধতে পারিস, তাহলে পরে তোরে পস্তাতে হবে। জারি-জরিনার দলে গান গেয়ে আমিও একদিন ভাবতাম জীবনটা বোধহয় চিরদিন রঙে রসে ডুবে থাকবে। কিন্তু তা থাকলো না রে। তাই বলি, আমার কথাটা একবার ভেবে ছাখ। একটা কিছু কর—নয়তো পরকালে গে জবাব দেবার কিছু থাকবে না।

নটবরের কথা শোনার পরেও চুপ করে থাকে ধনপতি। নটবর আশা

করেছিল ধনপতি কিছু-না-কিছু বলবে। কিন্তু ধনপতির নীরবতা তাকে নিরাশ করলো।

—তুলতুলির পেঁচো ঢালিরে চিনিস? এক সময় নটবর জিজ্ঞাসা করলে।

—চিনি।

—পেঁচোর মেয়ে বাসিরে বে' কর না।

কথাটা বলে নটবর ভয়ে ভয়ে তু'পা পিছিয়ে গেল। শুধু কথাটা কানে যাওয়ার অপেক্ষা, তারপরেই ধনপতি বজ্রকণ্ঠে ধমক দিয়ে ওঠে, খুড়ো—তোমার কি ভীমরতি ধরেছে!

নটবর সেই যে চুপ করলো, অনেকসময় সে চুপ করেই রইলো। ধনপতিও হাটচালার কোণে দাঁড়িয়ে রইলো পুতুলের মতো। তারপর একসময় বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেল।

নটবর শুধু দাঁড়িয়ে দেখলো, ধনপতির নাম ধরে পিছু ডাকতে তার সাহস হলো না।

॥ তেরো ॥

আশ্বিনের সকাল।

মোল্লাখালির হাটখোলার ঘাটের কাছে ডিঙি বেঁধে সওয়ারীর অপেক্ষায় পাটাতনের ওপর ছই-এর মুখ ঠেস দিয়ে বসে ধনপতি। নটবর ঘরামি ডিঙির অপর প্রান্তে বসে থেলো হুঁকোয় তামাক টানছে। বিড়ি টানলে কাশি হয় বলে আজকাল 'গুড়ুক' তামাক ধরেছে সে।

বিড়ি সিগারেটের কোনদিনই তেমন ভক্ত নয় ধনপতি। কিন্তু নটবরের তামাক টানার ধুম দেখে সেও একটা 'ডাবা হুঁকো' কিনেছে। কখনো-কখনো খেয়াল হলে সে-ও নটবরের হুঁকোর কলকে নিয়ে ডাবা হুঁকোয় তামাক টানে।

দিনে রাতে নিজেকে কাজের চাকায় বেঁধে ফেলেছে ধনপতি। মোল্লাখালির হাটখোলার ঘাটে সে আছে তার ডিঙি নিয়ে। সওয়ারী পেলে ছাড়ে না সে। তবে যদি ভাড়া ফুরোন ঠিক মতো হয়।

নিয়মমাফিক কাজের চাকায় নিজেকে বেঁধে রাখা ধনপতির জীবনে এই প্রথম। হাটখোলার ঘাটের মাঝিরা শুধু নয়, সবাই অবাক হয়ে যায় তার এই

পরিবর্তন দেখে। সবচেয়ে খুশী হয় নটবর। তার খুশীর মাত্রাটা এত বেশি যে, নতুন করে চরণ বোষ্টমের কাছ থেকে একটা একতারা বানিয়ে নিয়েছে। গান গাওয়া তো আছেই, তাছাড়া নতুন একটা উপসর্গ হয়েছে তার। গান বাঁধা। নতুন নতুন নানা রসের গান বাঁধতে আরম্ভ করেছে সে। হাটখোলার মনিহারী দোকান থেকে একটা খাতাও কিনেছে। নিজে লিখতে জানে না, তাই যা অসুবিধে। ধনপতি লিখতে জানলেও তাকে লিখতে বলে নি। পাছে এসব লেখাজোখার কথায় তার মন বিগড়ে যায়। মনে মনে গানের পদ রচনা করে। এক-একটা পদ একতারার সুরে গেয়ে মনের মধ্যে ধরে রাখে। তারপর কাজের ফাঁকে নারান তিওরের কাছে যায়। নারান তিওর গানের পদগুলো খাতায় লিখে দেয়।

আরও একটা আশা আছে নটবরের মনে। গানগুলো সে ছাপাবে। ছাপিয়ে নিয়ে কাউকে দিয়ে হাটে-বাজারে মেলায় বিক্রি করাবে। কুমার-জোলের গোলাম আকবরও তো গান লিখে ছাপায়। সে তো গান নয়, গানের নামে যত রাজ্যের কেচ্ছা। সেই কেচ্ছা যখন বিকোয়, নটবরের রসের গানও নিশ্চয় বিকোবে। ডিঙির মাথায় বসে তামাক টানতে টানতে সেই কথাই ভাবছে নটবর।

—খুড়ো, কলকেটা দেও। ধনপতি লম্বা হাই তুলে বলে, গা-টা যেন ম্যাজম্যাজ করে।

—তার মানে নেশাটা পাকিয়ে ফেলেছিস! নটবর ছই-এর ভিতরে ঢুকে কলকেটা ধনপতির হাতে দেয়। বলে, এবারে বসিরহাটে গেলে বালাখানার তামাক নে আসবো। দা-কাটা তামাকের সঙ্গে সে তামাকের অনেক ফারাক।

ভাবা হুকোয় কলকে বসিয়ে ধনপতি তামাকের ধোঁয়া টানতে টানতে বলে, তামাক টানতে যত আরাম আর হুঁকোর ভুড়ুং ভুড়ুং শব্দটা শুনতে আরো আরাম।

নটবর হাসে। বলে, যা বলিছিস। হুঁকোর ওই শব্দে আমার তো ঝিমুনি আসে।

গালভরা ধোঁয়া ছেড়ে ধনপতি বলে, এবারে একটা গড়গড়া কেনবো খুড়ো। শুয়ে থেকেও নল মুখে দে টানা যাবে, কি বলো?

হাল্কা সুরের কথাতেই খানিক সময় গেল। ধনপতি আর নটবর, দুজনেই খোশ মেজাজে আছে।

সকালের লঞ্চেও একজন সওয়ারী পেল না ধনপতি। তবু বসে রইলো সওয়ারীর আশায়।

বেলা বাড়তে নটবর ডোরায় গেল। ধনপতি আজকাল খোশ মেজাজেই আছে। বলেছে, ভালো-মন্দ রান্না করতে। হাটখোলায় আজ তেমন মাছ না উঠলেও কিছু জেলের কাছ থেকে বাছাবাছা গোটা কতক পার্শে আর একটা মাঝারি গোছের ভাঙন মাছ সংগ্রহ করেছে নটবর। মাছ কটা পেয়েই তবে ডোরায় গেল। নয়তো শুধু ডাল ভাত রাঁধতে এত তাড়াতাড়ি ডোরায় যেত না। আঁশটে গন্ধ না হলে নটবরের ভাত রোচে না।

উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে মাছ কেটে নুন হলুদ মাখিয়ে ছই ঠেস দিয়ে বসে নটবর। কাল রাতে গানের কয়েকটা পদ মনে এসেছিল। সেই পদগুলো আবার মনে মনে আওড়ায়। মনের সঙ্গে গেঁথে গেলে আর ভুল হবে না। তারপর যখন হোক একসময় নারান তিওরের কাছে গিয়ে খাতায় লিখিয়ে নেবে সে।

—ডিঙিতে কে? ও মাঝি ভাই, ঠাকুরের আবাদ যাবা নাকি? গাঙ-পারের ভেড়িতে দাঁড়িয়ে কে একজন জিজ্ঞাসা করে।

পারের দিকে পিছন ফিরে বসেছিল ধনপতি। ঠাকুরের আবাদ নামটা কানে যেতে সে ফিরে তাকায়। নয়তো উত্তর দিত পিছন ফিরে বসে থেকেই।

—ঠাকুরের আবাদ? কার বাড়ি যাবা?

কথাটা বলতে যেটুকু সময়। লোকটিকে চিনতে পারে ধনপতি। নামটাও মনে পড়ে। লক্ষ্মণ। সেঁজুতির দেওর।

লক্ষ্মণও চিনতে পেরেছে ধনপতিকে। বলে, চিনতে পারো আমারে?

—খুব চিনিছি। চেনবো না কেন? একটা রাত কাটিয়ে এ্যালাম না তোমাদের বাড়িতে।

ভেড়ির ওপর থেকে লক্ষ্মণ গাঙ-পারে নেমে আসে। ঠাকুরের আবাদে রাখাল মৃধার বাড়ি যাবে সে বৌঠানের কাছে তার ভাইয়ের খবর দিতে। জটিল ব্যাধিতে শয্যাশায়ী ওর দাদা। এতদিন সে বৌ-এর নাম করতে দিত না। অসুখের বাড়াবাড়ি হতে তবে সে ভাইকে বলেছে সেঁজুতিকে খবর করবার জন্যে। লোক না পাঠিয়ে কিংবা চিঠিপত্তর না দিয়ে লক্ষ্মণ নিজেই চলেছে বৌঠানের কাছে। তার বিশ্বাস বৌঠানের ভাগ্যে তার দাদা ভালো হয়ে উঠবে।

ঠাকুরের আবাদে যেতে হলে এখন উজানে যেতে হবে। অন্য সময় হলে

উজানে যেতে রাজী হতো না ধনপতি, কিন্তু এ অবস্থায় রাজী না হয়ে তার উপায় নেই। তাছাড়া সেঁজুতির নাম মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওর মনটাও তাকে দেখবার আশায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। নটবর বলে, এখন না গে গন লাগলে গেলে হয়! উজোনে যাতি পেরান বেরিয়ে যাবে। তারপর এই তো সবে রান্না চাপালাম। রান্না খাওয়াটা হোক।

ধনপতি বলে, এরা আমার 'জানিত' লোক। তুমি না হয় ডোরায় বসে রান্না করো, আমি দাঁড় টেনে নে যাবো।

লক্ষ্মণ বলে, দাদার অবস্থা খারাপ, নয়তো যাবার তাড়া ছিল না।

গেরাবি তুলতে তুলতে ধনপতি জিজ্ঞাসা করে, কী হয়েছে তোমার দাদার?

লক্ষ্মণ চুপ করে থাকে। ধনপতি মনে মনে অনুমান করে নেয়, সেঁজুতির স্বামীর ব্যামোটা কোন্ ধরনের—তাই ও কথা আর ভুলেও তোলে না।

গেরাবি তুলে ধনপতি ডিঙির মাথা পারে লাগায়। কাদা মেখে লক্ষ্মণ উঠে আসে ডিঙিতে। কিনারায় বসে পায়ের কাদা ধুয়ে জুত্ করে বসে।

নটবর শুধোয়, হাল না ধরলি যাতি পারবি তো—অ ধনপতি?

ধনপতি লগি দিয়ে ডিঙি ঠেলে দেয়। বলে, পারবো না কেন? তুমি আমারে ভাবো কি! উজোনে সুতির খাল পর্যন্ত যাতি পারলে, বেলা থাকতি ঠাকুরের আবাদে পৌঁছে যাবো। তারপর রেতে গনে বেরোলে কাল এই-বেলার মধ্যে মোল্লাখালির ঘাটে ফিরে আসবো।

অসুবিধেটা বোঝে লক্ষ্মণ। বলে, আমি না হয় হাল ধরি। অভ্যেসটা আমারো একটুআধটু আছে।

ধনপতির নিষেধ শোনে না লক্ষ্মণ। সে নিজে থেকেই হাল ধরে বসে। এপারে স্রোতের টানটা বেশি, তাই অপর পার দিয়ে ডিঙি নিয়ে চলে ধনপতি।

উজান বেয়ে কিছু দূর আসার পর ছোট গাঙের মুখে ধনপতি দাঁড় ছেড়ে পারে নেমে যায় গুন টানবে বলে।

ছোট গাঙের পার পরিষ্কার, তারপর এবারে বর্ষায় নতুন বাঁধবন্দী হবার দরুণ যাতায়াতেরও সুবিধে। বাঁধের ওপর দিয়ে চলা যায়। মাঝে মাঝে বাঁধের নিচে নেমে খানিক খানিক চলতে হয়।

ক্লান্তি নেই ধনপতির, এক ভাবে গুন টেনে চলেছে স্রোতের বিপরীতে।

শেষ ভাঁটায় একটা চরের মুখে ডিঙি বাঁধলো ধনপতি।

নটবর রান্না চুকিয়ে স্নান সেরে চুপচাপ বসে গানের সুর ভাঁজছে। লক্ষ্মণ

ছই-এর ভিতর বসে ঝিমুচ্ছে। ধনপতি ডিঙিতে উঠে লক্ষ্মণকে ডাকে। বলে, চানটান করে নেও। জুটো মাছ ভাত খাবা তো!

লক্ষণ বলে, আমি এক রকম খেয়েই এইচি। তবে চান করা হয়নি।

ধনপতি বলে, তাহোক মাথায় দু-বালতি নোনা জল ঢেলে নেও, আমি গামছা দিচ্ছি। তারপর দু মুঠো খাও।

নটবর বলে, একটানে তুইও সেরে নে—আমি ততক্ষণে ভাত বাড়ি।

বালতি করে জল তুলে লক্ষ্মণ ডিঙিতে বসেই চান করে। ধনপতি মাথায় একটু তেল দিয়ে গাঙের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটু সাঁতারও দেয়, তারপর ডিঙির 'মলম্' ধরে উঠে গা-মাথা মোছে।

—এ গাঙে নামো, তোমার ভয় করে না? লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করে।

—ওসব ভয় আমার নেই। যমের দরজায় কাঁটা দে রেখেছি, হাঙর, কামটে এ 'শম্যার' কিছু করবে না। সেই তের বছর বয়সে দাঁড় ধরিচি, আর এখন প্রায় সাঁইত্রিশ হলো—গাঙ বলো আর বাদা বলো, সব কিছুর আন্থিনাড়ি তো দ্যাখলাম—দেখে একটা কথা বুঝিছি, সহজে মরণ আমার হবে না।

কথাগুলো যত সহজে বলুক না ধনপতি, তবু ওর কথার সুরের মধ্যে একটা খেদের সুর মিশে থাকে। এ খেদ ওর জীবন জুড়ে। কথায় চিন্তায় সে খেদের সুর জড়িয়ে থাকে।

তিন জনে খেতে বসে ডোরার পাশেই। পরিপাটি করে রান্না করেছে নটবর। ধনপতির 'জানিত' মানুষ লক্ষ্মণ। নটবর তাই বাছা-বাছা মাছ দিয়েছে লক্ষ্মণের পাতে। 'এ্যাতো খাতি পারবো না বললেও', নটবর শোনে না। বরং ভাঙন মাছের মুড়োটা ধনপতির পাতে দিতে গিয়েও লক্ষ্মণের পাতেই দিয়ে বসে। বলে, জোয়ান ছেলে খাতি পারবা না কি? সব খাতি হবে।

লক্ষ্মণ বলে, এ যে মেরে ফ্যালার যোগাড়, এ্যাতো খাবো কি করে?

ধনপতি বলে, হাত দে তোলবা, মুখ দে খাবা। খেয়ে ঘুম দেও। তোমার বৌঠানের বাড়ি পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

লক্ষ্মণ বলে, কিন্তু এ্যাতো খাবার মানুষ নই আমি।

ধনপতি বলে, আরে খাওয়া আরম্ভ করো দিকি। বসে বসে খাও।

খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকতে খানিক বিশ্রাম। জোয়ার লাগতে এখনো কিছু সময় দেরি আছে। যতক্ষণ না জোয়ার লাগে, সেটুকু সময় একটু ছই-এর নিচে মাদুরে গড়িয়ে নেওয়া।

লক্ষ্মণের যেমন শোয়া তেমন ঘুম। নটবরের দু'চোখেও ঘুমের 'আবিলি'। কিন্তু ধনপতি শুয়ে আছে দু'চোখ মেলে। ঘুম দূরে থাক, এত পরিশ্রমের পরেও তার দুচোখে তন্দ্রার স্পর্শ নেই। দু'চোখ খোলা রেখে সে চোখের সামনে সেঁজুতির ছবিটা ফোটাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেঁজুতির মুখটা কিছুতে খুব স্পষ্ট করে ভাবতে না পারলেও, তার সেই করুণ চাউনিটা চোখের সামনে ভাসছে।

এতদিন ধরে ধনপতি মাঝিগিরি করছে, এর মধ্যে অগণিত যাত্রীর পায়ের চিহ্ন পড়েছে তার ডিঙিতে। কিন্তু সব চিহ্ন মুছে গেছে। কিন্তু সেঁজুতি তার মনে একটা গভীর দাগ কেটে গেছে। যতদিন ধনপতির মন থাকবে, ততদিন সে দাগটা স্পষ্ট হয়ে থাকবে।

সেঁজুতির চিন্তায় এতই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল ধনপতি যে, তার খেয়াল নেই কখন গাঙে জোয়ারের টান এসেছে। হঠাৎ তার চমক ভাঙে নটবরের কথায়। নটবর বলে ওঠে, ধনপতি, অ ধনপতিরে, জোয়ার এলো যে?

জোয়ারের কথায় ধনপতি উঠে বসে। মুখ বাড়িয়ে গাঙের জল দেখে। জোয়ারের জল অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে।

গেরাবি তুলে দাঁড়ে গিয়ে বসে ধনপতি। প্রথম থেকেই দ্রুত তালে দাঁড় টানতে শুরু করে।

দ্রুত দাঁড় টানা আর সেই সঙ্গে পিঠেন বাতাস—জোয়ারের টানে তীরের মতো ধনপতির ডিঙি ভেসে চলে।

বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ ধুচুনিখালি পৌঁছয় ডিঙি। ধুচুনিখালির ঘাটে খানিক সময়ের জন্যে ডিঙি বেঁধে রাখে।

একটানা দাঁড় টেনে ধনপতির হাতের পেশীগুলো টনটন করছে। নটবরেরও তামাকের নেশা লেগেছে। তামাকের ধোঁয়া পেটে না গেলে মেজাজটা তার ঠিক হচ্ছে না। আসলে ডিঙি বাঁধা নটবরের জন্যেই। নয়তো ধনপতির হাতের পেশী যতই টনটন করুক, ও এখনো মনে করলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় টেনে যেতে পারে।

আশ্বিন মাসের বেলা। দেখতে দেখতে গড়িয়ে যায়। ধুচুনিখালির ঘাট থেকে ডিঙি ছাড়তে বেলা গড়িয়ে গেছে। ডিঙি বাঁধলে যা হয়, তামাক খেতে আর খোশ-গল্প করতেই কতকটা সময় গেল।

বেলা পড়ে গেছে ক্ষতি নেই। চিন্তা এই জোয়ারে পৌঁছনো যাবে কিনা। জোয়ারে পৌঁছতে না পারলে উজান বেয়ে ঠাকুরের আবাদ যেতে হলে মুশকিল। একে সকালে অতখানি উজান বেয়ে আসা।

জোয়ারে পৌঁছবে বলে ধনপতির দাঁড় টানার বিরাম নেই। একভাবে ঘাড় গুঁজে দাঁড় টেনে চলেছে। পা দুটো লম্বালম্বি করে পাটাতনের 'চলা'র ওপর চেপে রাখা।

ডিঙিতে তিন জন মানুষ। তিন জনের কারো মুখে কোনো কথা নেই। ধনপতি দাঁড় টানছে, নটবর বসেছে হালে, আর লক্ষ্মণ ছই-এর ভিতর আধশোয়া ভঙ্গিতে ছাউনির ফুটো দিয়ে চেয়ে আছে গাঙের জলের দিকে। পড়ন্ত রোদে জোয়ারের জল চিকচিক করছে।

ঘাড় গুঁজে দাঁড় টানছিল ধনপতি, কোনদিকে তার লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তে সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। দাঁড়টানা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায়। ফিরে তাকায় পশ্চিম আকাশের দিকে।

শরতের আকাশ। নির্মেঘ। দিগন্ত প্রসারিত হয়ে আছে সবুজ ধান-ক্ষেতের সীমান্তে। কতদূরে ওই সূর্য—অথচ মনে হয় কত কাছে।

দু'চোখে অফুরন্ত বিস্ময় নিয়ে ধনপতি সূর্যাস্ত দেখে। সবুজ ধানক্ষেতের ওপারে কোথায় কোন্ অদেখা জগতে হারিয়ে গেল সূর্য।

ধনপতির দৃষ্টি এখনো স্থির হয়ে আছে পশ্চিম আকাশে।

সূর্য অস্ত গেছে।

এখনো আকাশে নানা রঙের আলপনা। এদিকে জোয়ারে গাঙের জল দু-কূল ছাপিয়ে উঠেছে। সন্ধ্যের বাতাসেও মৃদু ঠাণ্ডার আমেজ।

নটবরের কণ্ঠে কোনো গানের সুর গুনগুনিয়ে উঠছে। ভাষা নয়—শুধু সুর।

সে গানের সুর কানে গেছে ধনপতির। বলে, একটা গান ধরো না খুড়ো তোমার বাঁধা গান।

গানের কথা শুনে লক্ষ্মণ ফিরে তাকায় নটবরের মুখের দিকে।

লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করে নটবর রসিয়ে রসিয়ে বলে, দেখে আর কি করবা, বিশ পঁচিশ বছর আগে দেখলি চিনতে পারতে। নটবর ঘরামিকে কি দেখে চেনার দিন আছে। একদিন এ গাল ভরাট ছিল, হাসলে এ মুখেও মুক্তোর মতো দাঁত দেখা যেত। বুঝলে—

বলে নটবর গলা ছেড়ে গান জুড়ে দেয়। রঙ্গরসের জমাটি গান।

দিন থাকতে দিন গেল রে মন
হারায়ে গেল ধন,
এখন পুঁজি কেবল হাড় ক'খানা
হারালো যৈবন।
জোছনা রাতে চাঁদ দ্যাখতাম,
ডাকলে কোকিল তারে ডাকতাম
ডেকে বলতাম—কাছে বোসো
তোমায় দ্যাখবে মন।
সেদিন রক্তে আগুন ছিল রে মন
পিরীত ছিল বুকে,
সেদিন প্রাণের ময়না থাকতো দাঁড়ে
ছিল যে যৈবন।

—বলিহারি খুড়ো, বলিহারি। ধনপতি সোল্লাসে বলে ওঠে, কই এ গান তো কোনদিন ছাড়োনি খুড়ো। তুমি কি পুঁজি আগলে বসেছিলে নাকি এ্যাদ্দিন? বেশ মজার লোক তো তুমি।

নটবর কোনো কথা বলে না। বলতে গেলে যে সত্যি কথাটা ফাঁস করে দিতে হয়। এ গান যে তার নিজের বাঁধা। হাল-আমলে মনে মনে এ-গান সে বেঁধেছে। আজই গলা ছেড়ে গাইলো।

জোয়ার থাকতে ঠাকুরের আবাদে পৌঁছতে পারলো না। শেষটা ঘণ্টা খানেকের পথ উজান বেয়ে ঠাকুরের আবাদে দরগার ঘাটে পৌঁছতে বেশ খানিক রাত হয়ে গেল।

ঘাটের কাছে একটা ওড়চাকা গাছ। লম্বা কাছি দিয়ে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ডিঙি আলগা করে বেঁধে রাখে ধনপতি।

সাধারণত কারো বাড়িঘরে যেতে চায় না ধনপতি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাকে কিছু বলতেও হয় না। সে নিজে থেকেই রাখাল মৃধার বাড়ির পথ ধরলো।

ঘাট থেকে রাখাল মৃধার বাড়ি পোয়াটাক পথ। পথ বলতে ভেড়ি-বাঁধ। পথ চলতে নয়, রাখাল মৃধার বাড়ির কাছে এসেই ধনপতির মনটা কেমন যেন হু হু করে উঠলো। সেই কত দিন আগে সেজুতিকে দেখেছে, তারপর

থেকে সেঁজুতির কথা কত মনে করেছে। সেঁজুতি কখনো তার মন থেকে হারিয়ে যায়নি। আজ রাখাল মৃধার বাড়ির উঠোনে পা দিতে ওর মনটা শুধু হু হু করে উঠলো। মনের মধ্যে একটা আহত কালকেউটে যেন ওকে ছোবল মারতে আরম্ভ করে।

—কী হলো রে তোর! নটবর শুধোয়, অমন করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

ধনপতি কথা বলে না। শুধু একবার নটবরের মুখের দিকে তাকিয়ে চলতে আরম্ভ করে। ধনপতির রকম-সকম দেখে নটবর আর কিছু বলে না। সে তো জানে সাগরের কূল-কিনারা আছে, কিন্তু ধনপতির মনের কূল-কিনারা নেই।

রাখাল মৃধার বাড়ি বেশ বড়। পাশাপাশি চারটি ঘর। একটি ঘরে যা একটু আলো দেখা যাচ্ছে, নয়তো কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই। তালুই মশাইকে ডাকতে গিয়েও পারে না লক্ষ্মণ। কি জানি কেন, লক্ষ্মণ এ বাড়িতে পৌঁছেই কেমন যেন বোধশূন্য হয়ে পড়েছে।

শেষটা ধনপতিই ডাকে, মিরধা মশাই আছো নাকি—ও মিরধা মশাই!

ঘর থেকে সাড়া আসে, কে! কে ডাকে?

রাখাল মৃধার-ই কণ্ঠস্বর।

—আমি ধনপতি।

—অ, বুঝিচি। দাঁড়াও আলোটা জ্বেলে নে আসি।

রাখাল মৃধা আলো হাতে বাইরে আসে। তিন জনের মধ্যে লক্ষ্মণকে দেখে রাখালের মুখটা 'পাঙাশ' হয়ে যায়।

রাখালের পায়ের ধুলো নিয়ে লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করে, বৌঠান কোথায় তালুই মশাই?

রাখাল হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। কথা বলতে গিয়েও পারে না। কি বলবে সে। বলার তার কিছুই নেই। দশদিন আগে হলেও বুক ফুলিয়ে বলতে পারতো, সেঁজুতি তার ঘরেই আছে।

আজ দশ দিন হলো, সেঁজুতি চলে গেছে। পালিয়ে নয়, সকলের চোখের সামনে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে গেছে।

সেঁজুতির চলে যাওয়ার কথা বলতে রাখালের দুচোখে জল ঝরে পড়ে। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে সে বলে যায়—

জোসেফ মদন দাস বাসন্তীর দেশীয় খ্রীস্টান। শ্বেতাঙ্গ পাদ্রী হুইলার সাহেব

উনিশ শ' সাত চল্লিশের পর সাগর পারে তার দেশে চলে যাবার পর, মদন তার জায়গা নিয়েছে। সুন্দরবনে আবাদ অঞ্চলে সে-ই এখন খ্রীস্টের অমৃত-বাণী ফেরী করে বেড়ায়।

ঠাকুরের আবাদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ঘরের ছেলে মদন। ছোটবেলা থেকে সে ছিল একটু বেপরোয়া স্বভাবের। সঙ্গতিপন্ন চাষী পরিবারের ছেলে সে, বাসন্তীর হ্যামিলটন সাহেবের স্কুলে পড়তো মামার বাড়িতে থেকে। ওই স্কুলে পড়তেই সে হুইলার পাদ্রীর তাঁবে গিয়ে পড়ে। তার মামারা অনেক চেষ্টা করেছিল পাদ্রীর সঙ্গ ছাড়াতে, কিন্তু চেষ্টা করেও হতাশ হয়েছিল তারা। স্কুলে পড়তেই সে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কুৎসা গাইতে শুরু করেছিল। হুইলার সাহেবের কাছ থেকে শেখা খ্রীস্টের অমৃত-বাণী সে বলে যেত অনর্গল। মাঝে মাঝে বই এনে পড়তো—মথি লিখিত সুসমাচার-এর মতো বই। খ্রীস্টের মহিমার কথা শুনে সে নিজে অবাক হতো। যীশু কেমন করে নদী পার হলেন, কেমন করে অন্ধকে আলোক দান করলেন—এসব গল্প তার মুখস্ত ছিল।

বাসন্তীর স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে মদন দাস। হুইলার সাহেব তাকে কলকাতায় পাঠালো আরো পড়াশুনোর জন্যে। লেখাপড়া আর হোক না হোক, কলকাতায় তিন বছর থেকে মদন দাস চৌকস ছোকরা হয়ে ফিরলো। সে বছর উনিশ শ' সাত চল্লিশের জানুয়ারী, ভারতের ইতিহাসে তখন টালমাটাল অবস্থা চলছে। হুইলার সাহেব সেই বছরেই মদন দাসকে দীক্ষা দিলো খ্রীস্টান-ধর্মে। মদন দাস হলো জোসেফ মদন দাস।

হুইলার সাহেব দেশে চলে গেল। কিছুদিনের মধ্যে সাগর পার থেকে আরো একজন পাদ্রী এলো। সে সাহেব না জানে বাংলা, না জানে দেশজ আচরণ-বিধি। চৌকস ছেলে মদন, কিছুদিনের মধ্যে নতুন পাদ্রীর ছায়া-অনুচর হয়ে দাঁড়ালো। নতুন পাদ্রী যেখানে, সেখানে মদন দাস।

নতুন পাদ্রী মদনকে ডাকতো জোসেফ ডশ। জোসেফ ডশ নতুন পাদ্রীর মতো আলখাল্লা পরে আবাদ অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। কখনো একা—কখনো সঙ্গে থাকতো নতুন পাদ্রী। টেনে টেনে সুর করে খ্রীস্টের অমৃত-বাণী শোনাতো মদন। নতুন পাদ্রী সঙ্গে থাকলে সে মুখ টিপে হাসতো।

ঠাকুরের আবাদে প্রায়ই আসতো মদন। রাখাল মৃধার সঙ্গে গ্রাম সুবাদে একটা সম্পর্কও ছিল তার। মদন প্রথম প্রথম আসতো সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে।

আসতো—নানারকম কথার মধ্যে সে খ্রীস্টধর্মের মহিমা কীর্তন করতো। সেঁজুতি আড়ালে দাঁড়িয়ে সে-সব কথা শুনতো। মাঝে মাঝে সামনাসামনি এসে দাঁড়াতো।

মদনের এই ঘন ঘন যাতায়াতের আসল রহস্যটা কোনদিন তলিয়ে ভাবতে চায়নি রাখাল মৃধা। কিন্তু যেদিন মদনের যাতায়াতের ব্যাপারটা তলিয়ে দেখলো সে, তখন আর কিছু করার নেই। মদন তার মুখের ওপরে বলে গেল, সেঁজুতিকে সে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাবে।

কথাটা শুনে রাখালের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। অন্ধকার থেকে আলোকে—কথাটা কেমন যেন বে-ভাবের কথা মনে হয়েছিল। তারপর মদন আরো বলেছিল, পরম-করুণাময় যীশুর আবির্ভাব হয়েছিল মানুষের দুঃখ মোচনের জন্যে। সংস্কার-মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের শরণ নিলে, ঈশ্বর তাকে নতুন জীবন দান করেন।

প্রথমটা দুর্বোধ্য মনে হলেও রাখাল বুঝতে পেরেছিল কী বলতে চায় জোসেফ মদন দাস।

কিন্তু মদন দাসকে আর কোনো কথা না বলে সেঁজুতিকে ডেকেছিল রাখাল। জিজ্ঞাসা করেছিল, মদনের এ-সব কথার অর্থ কী? সে কোন্ ঈশ্বরের শরণ নিতে চায়!

সেঁজুতি বুকের মধ্যে থেকে কালো কারে ঝোলানোএকটি ক্রশ-চিহ্ন বার করে বাবার সামনে মাথা হেঁ করে দাঁড়িয়েছিল।

সেই মুহূর্তে সে খ্রীস্টের চেলা জোসেফ মদনকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ির বার করে দিয়েছিল রাখাল। আশ্চর্য এত অপমান সহ্য করেও মদন বলেছিল, এও ঈশ্বরের অনুগ্রহ।

তারপর যা ঘটার তাই ঘটলো। সেঁজুতি হঠাৎ বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। মদনের পাশে দাঁড়িয়ে বলে, আমি আঁধারে পড়ে থাকতে চাইনে বাবা। আমিও চললাম।

রাখাল নীরব মাথা নিচু করে সেদিনও যেমন কাঠের পুতুলের মতো সজল চোখে দাঁড়িয়েছিল,. সেদিনের কথা বলতে আজও তেমনি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে। আজও তার দু-চোখে দরদর ধারায় গড়িয়ে পড়ে চোখের জল।

ধরাগলায় রাখাল বলে, সে মেয়ে কিরিস্তান হয়ে মদনের কাছে থাকে। বাসন্তীর গিরজের কাছেই থাকে। চোখে দেখিনি তবে কানে শুনিচি সে মেয়ে

নাকি খুব ধিঙ্গিপনা করে বেড়াচ্ছে। সবই শোনা কথা, সত্যি মিথ্যে আমি জানিনে।

সেঁজুতির কাহিনী শুনে ধনপতি আর লক্ষ্মণের মুখে রা নেই। তারা দুজনেই যেন 'থ' বনে গেছে।

নটবর বলে, দাঁড়িয়ে থেকে কি করবা, চলো ডিঙিতে গে বসি।

রাখাল চোখের জল মুছে বলে, এই রাত্তিরে যাবা কোথায়? খাও দাও—তারপর রাতটা কাটিয়ে ভোরের গনে চলে যেওনে।

লক্ষ্মণ বলে, থাক তালুই মশাই আপনি আর চাপাচাপি করবেন না—আমরা বরং ডিঙি ছেড়ে দেই গে। এই ভাঁটিতে যতদূর পারি চলে যাই।

রাখাল বলে, তা কি হয়। না খেয়ে চলে গেলে গেরস্তের অকল্যেণ হয়। যাতি হয়, যাহোক দুটো খেয়ে যাও।

ধনপতি বোবার মতো দাঁড়িয়েছিল, রাখাল তার হাত দুটি ধরে ফেলে। বলে, মেয়ের ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই, আগে জানলে ও সব্যনাশীরে কিছুতেই ঘরে আনতাম না।

সে কথায় ধনপতি বলে, ও-সব কথা শুনে আমার লাভ-লোকসান নেই মিরধা মশাই! এ-সব ব্যাপারে আমি কে—আমি মাঝি, ডিঙি নে এ-গাঙ সে-গাঙ করি—ও-সব কথায় মন নেই আমার। এখন যাই, এই ভাঁটায় গে বেরোলে খানিক পথ এগুয়ে যাতি পারবো। বসে থাকলি কি ঘাটেব মাঝির দিন চলে!

এর পরেও রাখাল মৃধা অনুনয় বিনয় করলো। কিন্তু এরা থাকতে নারাজ। যেমন এসেছিল, ওরা তেমনি চলে গেল ভাঁটার টানে ডিঙি ভাসাতে।

ভাঁটার টানে ডিঙি ভেসে চলেছে। ধনপতি হাল ধরে বসে আছে চুপচাপ। ওধারে ডিঙির পাটাতনের ওপর নটবর আর লক্ষ্মণ বসে রয়েছে। নটবরের কোলের ওপর একতারা। গান গাইবে বলে বসেছিল, কিন্তু এই বেসুরো আবহাওয়ায় গানে তার মন নেই।

ধনপতি নীরবে হাল ধরে বসে থাকলেও মন থেকে সে সেঁজুতির চিন্তাটা কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছে না। সেঁজুতিকে সে যেটুকু দেখেছে, তাতে তার মনে হয়েছিল এমন মেয়ে হাজারে একটা মেলে না। যত ভিড়ে মিশে থাক না সে, তবু তাকে আলাদা করে চিনে নেয়া যায়। সেই সেঁজুতি শেষটা এ কি করলে! এই সংসারে সেও কি শুধু আর দশ জনের মতো নিজের সুখটাই দেখলো! আর কিছু কি তার ভাববার ছিল না?

ধনপতির ইচ্ছে যায়, একবার সে সেঁজুতির কাছে যাবে, তাকে জিজ্ঞাসা করবে, এ কাজ কেন সে করলো। কিন্তু পরক্ষণে মনে হয় ; সেঁজুতির সঙ্গে তার কী সম্পর্ক। তার কাছে যাবেই বা কোন্ পরিচয়ে, আর কেনই বা।

রাতের অন্ধকারের মধ্যে ধনপতির ডিঙি তীরের মতো ভেসে চলেছে গাঙের বুক চিরে। সেঁজুতির চিন্তাটাও কখন যেন ধনপতির মন থেকে দূরে সরে গেছে।

অন্ধকার রাত। অন্ধকার হলেও নদী-পথটা অনেক দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। যতদূর দৃষ্টি যায় একটিও চলন্ত ডিঙি চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে নদীর ঘাটে যা দু-একটা বাঁধা ডিঙি দেখা যায়।

এদিকে ভাঁটাও শেষ হয়ে আসছে। জোয়ার লাগলে ডিঙি গেরাবি করতে হবে। কাছেই তুষখালির খেয়াঘাট, ধনপতি মনে মনে ঠিক করেছে সেখানেই ডিঙি বাঁধবে সে। রাত দু'পহরে উজান বেয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া সেই কখনথেকে একনাগাড়ে দাঁড় বাওয়া। এর মধ্যে না হয়েছে জল-তামাক খাওয়া, না বিশ্রাম।

তুষখালির খেয়াঘাটে পৌঁছেই ডিঙি গেরাবি করে ধনপতি। নটবর ঘুমিয়ে পড়েছিল পাটাতনের ওপর, ডিঙি বেঁধে ধনপতি তাকে ডেকে তোলে।

যেন দুঃস্বপ্ন দেখেছে নটবর। ধড়মড় করে উঠে বসে, জিজ্ঞাসা করে, কি রে ?

—কি আবার ? ধনপতি বলে, তুষখালির ঘাটে এ্যালাম—এখন উঠে যাও দিকিন, ওপরে দোকান-টোকান আছে কিনা।

—এই রাতে কি দোকান খোলা আছে রে ?

—আরে যাও না, দোকান যদি বন্ধ থাকে, দোকানিকে ডেকে তোলো গে।

বারকতক হাই তুলে আড়ামোড়া ভাঙে নটবর। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য করে। বলে, কত রাত হবে রে ?

—দেড়টা দুটো তো হবেই। নেও—যাও, দ্যাখো চিঁড়ে মুড়ি কিছু পাওয়া যায় কিনা ? পোড়া পেট যে ক্ষিধেয় জ্বলে গেল। যাও, ঘাটের কাছেই একটা দোকান আছে বলে জানি।

লক্ষ্মণ বসে ছিল চুপচাপ। নটবরকে উঠতে দেখে সেও উঠে দাঁড়ায়।

ধনপতি বলে, তুমি যাও কোথায় ?

লক্ষ্মণ বলে, আমিও যাই ওই সঙ্গে।

ধনপতির আপত্তি শোনে না লক্ষ্মণ। নটবরের সঙ্গে সে-ও ডাঙায় নামে।

খেয়াঘাটের ওপর একটা দোচালা। চালার বাইরে গরানের কোঁড়া দিয়ে তৈরী ছোট একটা মাচা। মাচার ওপর একজন লোক কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। হয়তো দোকানি হবে। ভিতরে না শুয়ে বাইরে শুয়েছে।

—অ কত্যা, নটবর ডাকে, ঘুমোও কেডা। অ কত্যা!

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছিল লোকটি। নটবরের ডাক শুনে তড়াক করে উঠে বসে। ঘুম জড়িত চোখে তু'জন মানুষকে এই রাতে তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভয় পেয়ে যায়। বলে আমার কাছে কিছু নেই বাপু, আমারে ছাড়ান দেও।

নটবর বলে, ভয় নেই—আমরা চোর দস্যু না। রেতে গনে ডিঙি নে এইছি। আর গন প্যালাম না বলে, এঘাটে ডিঙি বাঁধলাম।

এতক্ষণে লোকটি যেন ধাতস্থ হয়েছে। বলে, কিন্তু আমারে ডাকো কেন?

নটবর নরম স্বরে বলে, তোমার দোকানে চিঁড়ে মুড়ি কিছু আছে? থাকে তো দেও।

লোকটি বলে, কতটা চাই।

নটবর বলে, তিন জন মানুষ খাবে—যা লাগে তাই দেও।

লোকটি আর কোনো কথাবার্তা বললে না। দোকান খুলে তিন জন মানুষের মতো চিঁড়ে আর খানিকটা ভেলিগুড় ওজন করে দিলে। কি মনে করে নটবরের সঙ্গে লোকটি ডিঙিতে এসে উঠলো। বোধহয় খানিক কথাবার্তা বলবার জন্যে। রাতে খেয়াঘাটে একা রাত কাটাতে হতো, মানুষ পেয়ে কি সঙ্গ ছাড়া হয়?

ক্ষিধেয় পেটের নাড়ী জ্বলছে। চিঁড়ে ভেজানোর অবসর নেই। শুধু জলের ছিটে আর গুড় টাকনা দিয়ে তিন জনে বসে চিঁড়ে চিবোতে আরম্ভ করে। দোকানিও সমানে বসে রইলো ওদের খাওয়ার সময়। তারই মধ্যে খানিক কথাবার্তা হলো। তারপর দোকানি চলে গেল তার দোকানে। এরাও যে-যার মতো ছইয়ের ভিতরে বাইরে শুয়ে পড়লো।

ধনপতি শুয়েছে বাইরে, গলুই-এর কাছে। সারা দেহে অবসাদ জড়িয়ে এলেও ঘুম আসছে না ওর চোখে। বারে বারে কি এক অস্বস্তিতে তন্দ্রা টুটে যাচ্ছে। যখনই তন্দ্রা টুটে যাচ্ছে, তখনই ফিরে তাকাচ্ছে পশ্চিম আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রটির দিকে। সেই নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সে।

জোয়ারের বেগে তখন ডিঙিটা টলমল করছে।

॥ চোদ্দ ॥

এবারে দুর্গাপূজা পড়েছে শেষ আশ্বিনে।

মোল্লাখালির ধান-কলের মাঠে জাঁকজমক করে পুজো হয়। এবারেও হবে।

ধান-কলের বাঘা মালিক ভগবানদাস চাপরাশীর উদ্যোগে এ-পূজা। আগে 'ঠমক' ছিল, এখনকার মতো জাঁক ছিল না। হালফিল কয়েক বছর হলো পূজা উপলক্ষ করে মেলা বসে ধান-কলের মাঠও হাট জুড়ে। বোধনের রাত থেকে মেলা শুরু, শেষ হয় কোজাগরীর পরদিন। কদিন বাদে শ্যামাপূজাতেও মেলা বসে আবার। সে মেলা একদিন আর এক রাতের। শ্যামাপূজার মেলাকে এ অঞ্চলের লোকে বলে, 'ভাঙা মেলা'।

পূজা উপলক্ষ করে, মেলা দেখতে আসে দূর-দূর গ্রাম-গঞ্জের লোক। হাজারে হাজারে আসে। মেয়ে-পুরুষ ছেলে-বুড়ো—সবাই। মেলার কদিন মোল্লাখালির চেহারাই যেন বদলে যায়।

দূরের গঞ্জ, শহর থেকে দোকানীরা আসে। আসে ভোজবাজির খেলোয়াড়, সার্কাস, ম্যাজিকের পার্টি, আসে নানা জাতের রঙ-তামাশার দল। জুয়াড়ী আর ফড়ের দল তো আসেই। ক'বছর হলো বসিরহাট, ক্যানিং, ডায়মণ্ডহারবার থেকে দেহ-পসারিনীরাও আসতে আরম্ভ করেছে। তাদের জন্যে ধান-কলের মাঠের প্রান্তে হোগলা ছাওয়া লাইন-বন্দী ডেরা বাঁধা হয়। সব মিলিয়ে মেলার দিনগুলো গুলজার হয়ে থাকে।

পূজা যেমন-তেমন, মেলাটাই লক্ষ্য। পূজার জন্যে থোক টাকা যেমন খরচ করে ভগবান দাস, তেমন মেলার আয়ের একটা মোটা অঙ্ক জমা পড়ে ভগবান দাসের গদীতে। তবে 'ভাঙা মেলায়' যে তোলা আদায় হয়, সে টাকা ভাগ করে নেয় মোল্লাখালির পাঁচ-বারোয়ারী।

মাঝি-মাল্লা, যারা সওয়ারী বয়ে বেড়ায়—তাদের এই হলো মরশুম। শুধু ডিঙি-বাওয়া নিয়ে কথা—যাত্রীর কমতি নেই। যেমন মেহনত তেমন পয়সা।

পয়সা জিনিসটাকে কোনদিন বড় করে ভাবে না ধনপতি। দাঁও বুঝে ঘাড়ে কোপ মারার মতো মানুষও সে নয়। এই নিয়ে ফি-বছর নটবরের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় তার। নটবর যাই বলুক, ধনপতির এক কথা, 'বেশি পয়সা কোন্ কাজে লাগবে, যাহোক করে দিন চলা নে কথা।' কিন্তু এবারে

সম্পূর্ণ বদলে গেছে সে। অন্যের মতো সেও চড়া ভাড়া হাঁকতে আরম্ভ করেছে। ক'দিনের জন্যে রাজবংশীদের একটা জোয়ান গোছের ছেলেকেও রেখেছে। দরকার হলে সে দাঁড় তো টানেই, হালেও বসে।

বোধনের দিন।

সূর্য-ওঠার মুহূর্তে ধনপতি পূব-আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অচঞ্চল। নটবর গলুই-এর ধারে বসে মুখ-হাত ধুচ্ছে, এমন সময় পারের ভেড়ির ওপর থেকে ডাক এলো, ভাড়ায় যাবা নাকি মাঝিভাই ?

—কোথায় যাবা ? গামছায় মুখ মুছতে মুছতে নটবর জিজ্ঞাসা করে।

—সাতজেলের হাটখোলায়।

—আছো ক' জন ?

—পাঁচ জন, আর মোটঘাট আছে কতক।

—ভাড়া কিন্তু বেশি লাগবে।

—কত ?

—টাকা দশেক লেগে যাবে। কমটম হবে না। নটবর বেশ মেজাজ নিয়েই বলে, যাবা তো এসো।

—ছ' টাকা দেবানে।

—দরাদরি চলবে না। নটবর সাফ কথা বলে, বউনিবাটার সময়ে ভাড়া নে কচলাকচলি কোরো না। নেও, যাবা তো এসো।

—বেশ, ঘাটে ডিঙি ধরো, আমরা মালপত্তর নে আসি।

ভাঁটার টান লেগেছে মোল্লাখালির গাঙে। সেই টানেই সওয়ারী নিয়ে ডিঙি ভাসলো। হালে বসেছে রাজবংশীদের ছেলেটি। নটবর ডোরায় ঢুকেছে চায়ের জন্যে জল গরম করতে। আর ধনপতি চলন্ত ডিঙির ওপর দাঁড়িয়ে দেখছে আকাশের বুকে টুকরো টুকরো শাদা মেঘের ওপর নানারঙের খেলা। অনেকদিন পর, ধনপতির মনটাও যেন পুরনো দিনের রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে।

মোল্লাখালির ঘাট থেকে সাতজেলিয়ার হাটখোলা—পুরো এক ভাঁটার পথ। গাঙে জোয়ার লাগার আগেই ধনপতি ডিঙি বাঁধলো সাতজেলিয়ার হাটখোলার ঘাটে।

এ ঘাটে নামার কথাতেই বারুণীর কথা মনে পড়েছিল ধনপতির। ঠিক

করেছিল, নামবে না। কিন্তু ঘাটে পৌছতেই হিসেবটা বদলে গেল। শেষ পর্যন্ত নামলো সে। নটবর আর রাজবংশীদের ছেলেটিও।

হাটখোলার হাজু ময়রার দোকান থেকে ঠোঙাভর্তি মেঠাই কিনলে ধনপতি। তারপর হনহন করে এগিয়ে চললো বারুণীর বাড়ির পথে।

কিন্তু বারুণীর বাড়ির দরজায় পৌছে হতাশ হলো ধনপতি। ঘরে কেউ নেই। দরজার বাইরে থেকে কুলুপ আঁটা। নিশ্চয়ই সবাই মিলে কোনো আত্মীয়-কুটম্বের বাড়ি গেছে। নইলে কেউ-না-কেউ থাকতো ঘরে।

পাড়ার একজন ছোকরা, ছাগল-গোরু নিয়ে এদিকেই আসছে। ধনপতিকে চেনে ছেলেটি। এসে নিজে থেকেই জানালো, নস্কর বাড়ির সব তিনদিন হলো কাউখালি গেছে। কেষ্ট নস্করের মামাতো ভাই-এর বাড়াবাড়ি অসুখ। খবর পেয়ে দেখতে গেছে, এ বাড়ির দেখা-শোনার ভার তার ওপর দিয়ে।

কাউখালির কথা শুনে ধনপতির মনে পড়ে সেখানকার মোড়লবাড়ির কথা। পানু মোড়লের ছেলে রাম আর লক্ষ্মণ। রামের বৌ সেঁজুতি।

—কেষ্ট নস্করের মামাতো ভাই-এর নাম নি জানো?

—তা জানিনে, তবে শুনিচি বনেদী মোড়ল তেনারা।

—অ, ধনপতি হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। কী খেয়ালে মেঠাই-এর ঠোঙা ছুঁড়ে ফেলে দেয় পাশের খানার মধ্যে।

—কী হলো রে, অ ধনপতি? নটবর বলে।

—কিছু না।

—কিছু না তো মেঠাই-এর ঠোঙা ফেলে দিলি কেন?

—তুমি তো জানো খুড়ো, আমার মাথায় কতকগুলো বাঁদুরে পোকা আছে, বিনি কারণেও সেগুলো কিলবিলিয়ে ওঠে। নেও—চলো, এতক্ষণে বোধহয় জোয়ার লাগলো।—বলে ধনপতি দ্রুত পা চালায়। নটবর পেছন থেকে রাখাল ছোঁড়াটাকে ইশারা করে মেঠাইগুলো কুড়িয়ে নেবার জন্যে।

সাতজেলিয়ার হাটখোলার ঘাট থেকে জোয়ারের মুখে ডিঙি ছেড়ে সন্ধ্যে বেলায় মোল্লাখলির ঘাটে পৌছলো ধনপতির ডিঙি।

তখন সানাই বাজছে পূজামণ্ডপে। সানাই-এর মধুর সুর ভেসে আসছে সন্ধ্যার বাতাসে।

সানাই-এর সুর কানে আসতেই ধনপতির মনটা কেমন আনচান করে উঠলো।—অ খুড়ো, খুড়ো, আচমকা চিৎকার করে ডাক দেয় নটবরকে।

একটু আরাম করে শুয়েছিল নটবর। ধনপতির ডাক কানে যেতেই তড়াক করে উঠে বসে। বলে, অমন ডাকিস কেন, আবার কি হলো তোর?

—ডাঙায় যাবো খুড়ো। ধনপতি বলে, ডিঙিটা পারে লাগাও দিকিন।

—ডাঙায় যাবি তো যাবি। তার জন্যে অমন চিৎকার করা! তোর সবই 'আকাল কেঁড়ে'।—বলে ডিঙির মুখটা পারে লাগায় নটবর।

সন্ধ্যের সময় সেই যে পারে নেমে গেল ধনপতি, সারা রাতের মধ্যে আর ফিরে এলো না।

নটবর রাত দশটা নাগাদ একবার গিয়েছিল হাটখোলায়। খোঁজ করেছে, কিন্তু খোঁজ পায়নি। নটবর তখনই ভেবেছিল, একবার কর্ম বাউলির পোড়ো আখড়ায় যায়। কিন্তু রাতের অন্ধকারে ওদিকটা যেতে ভরসা পায়নি। কি আর করবে, ডিঙিতে ফিরে এসেছে। অনেক সময় জেগে বসে থেকে শেষটা ঘুমিয়ে পড়েছে।

শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেল নটবরের। ধনপতি তখনও ফেরেনি। বসে না থেকে পারে নামলো নটবর। ফিকে অন্ধকারের মধ্যে ভেড়ি-পথ ধরে সোজা চলে এলো গাঙ-ধারে কর্ম বাউলির পোড়ো আখড়ায়। যা ভেবেছিল, তাই। নিশ্চয় ধনপতি এখানে এসেছিল। মাঠের একান্তে জল-ডোবা জায়গায়, যেখানে পড়ে রয়েছে বড় মালকাঠটা, সেখানে খানিকটা জায়গা কাদা হয়ে আছে। তাছাড়া বড় বড় পায়ের দাগ সেখানে। এত বড় পায়ের দাগ ধনপতির ছাড়া আর কারও নয়। কিন্তু মানুষটা গেল কোথায়!

গাঙ-পারে উঁচু ভেড়ির ওপর দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকালো নটবর। কিন্তু মানুষটিকে দেখতে পেল না। শেষটা চিৎকার করে ডাকতে লাগলো ধনপতির নাম ধরে।

ভেড়ি-পথ দিয়ে আরও কিছুদূর এগিয়ে এসে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো নটবর। 'নজর' করে দেখলো, আড়কাটি খাল যেখানে গাঙে মিশেছে, সেখানে একটা ঢিবির ওপর কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেদিকেই পা চালালো নটবর।

অনুমান মিথ্যা নয়। ধনপতি দাঁড়িয়ে রয়েছে উঁচু ঢিবির ওপর। দৃষ্টি তার পূবের আকাশ সীমায়। যেখানে সূর্য উঠছে।

ধনপতির কাছে যায় নটবর। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ধনপতিকে দেখেই নটবর শিউরে ওঠে। সর্বাঙ্গে এঁটেল কাদা, চোখ লাল, মাথার চুল উসকোখুসকো, পরনের

কাপড় ছিঁড়ে কুটি-কুটি, তারপর হাতে-বুকে, হাঁটুতে রক্ত-ঝরা আঁচড়ের দাগ নিয়ে ধনপতি দাঁড়িয়ে আছে।

—তোর একি হাল হয়েছে রে, অ ধনপতি ?

উত্তর দেয় না ধনপতি, শুধু লাল গোলার মত দুটি চোখ মেলে তাকায় নটবরের দিকে।

সন্ধ্যেবেলা সানাই-এর সুর শুনে ধনপতির মনটা আনচান করে ওঠে। সুরটা এমন সুরে বেজেছিল, সে সুর শুনে তার মনটা পুরনো দিনে ফিরে যায়। নোনা গাঙের ঘূর্ণির মতো তার মনটা উথালিপাথালি করে ওঠে। তারপরেই সে গাঙ-পারে নেমে সোজা চলে আসে কর্ম বাউলির পোড়ো আখড়ায়। যেখানে পুরনো দিনের কঙ্কালের মতো পড়ে রয়েছে মাল-কাঠগুলো। মাঠে নেমে প্রথমে ছোট-মাঝারি মালকাঠগুলো ঝাঁকতে আরম্ভ করে। শেষে এগিয়ে যায় বড় মালকাঠটার কাছে। কিন্তু মিছে যাওয়া। হাজার চেষ্টাতেও মালকাঠ নড়াতে পারে না ; ঝাঁকা তো দূরের কথা। পাগলের মতো পা-দুটি নরম কাদায় পুঁতে সজোরে ঠেলতে থাকে মালকাঠটাকে। বার বার সর্ব শক্তি দিয়ে ঠেলেও এক চুল নড়াতে পারে না। যেন পাগল হয়ে গেছে সে, নয়তো পড়ে-থাকা মালকাঠের সঙ্গে মাতামাতিতে ওর বুক ছড়ে গেছে, হাতের এখানে ওখানে চোঁচ ফুটে রক্ত ঝরেছে—তবু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। একটা ভূতুড়ে রোখ ওকে পেয়ে বসেছে। সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়, তবু সেদিকে হুঁশ নেই। সারারাত ধরে বড় মালকাঠটাকে নিয়ে এমনি পাগলের মতো মাতামাতি করেছে সে।

তারপর শেষরাতে হঠাৎ পূবের আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে দেখে, হারানো সম্বিৎ ফিরে পায়। নিজের পাগলামির কথা মনে করে আকাশ-ফাটা হাসি হেসে ভেড়ি-পথ ধরে ধনপতি ছুটতে আরম্ভ করে আড়কাটি খালের দিকে।

খালের ধারে মাটির ঢিবির ওপর তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার চোখের সামনে পূবের আকাশ ফর্সা হয়ে এলো। সূর্যের আলো সর্বাঙ্গে মেখে দাঁড়িয়ে রইলো ধনপতি।

—ধনপতি, তুই কি পাগল হবি শেষটা! নটবর আদেশের সুরে বলে, আয়—ডিঙিতে চলে আয়।

শান্ত মানুষের মত ধনপতি নীরবে অনুসরণ করে নটবরকে।

ডিঙিতে ওঠার আগেই গাঙের জলে ঝাঁপ দেয় ধনপতি। সাঁতার কাটে

খানিক, তারপর কোমর জলে দাঁড়িয়ে গায়ের কাদা রগড়ে ধুয়ে ফেলে। আঁচড়-লাগা দাগগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জায়গায় জায়গায় চামড়া ছড়ে রক্ত ঝরেছে। রগড়ানিতে সেখানে আবার রক্তের চিহ্ন ফুটে বেরোয়।

ডিঙিতে উঠে ধনপতির প্রথম কথা হলো, খাবার-টাবার কিছু আছে নাকি খুড়ো? থাকে তো দেও দিকিন খানিকটে ভাত-তরকারি, ক্ষিধেটা বেশ পেয়েছে।

সানকিতে করে বাসি ভাত-তরকারি ধরে দিলে নটবর।

পেটে আগুন জ্বলছে ধনপতির, এক সানকি ভাত-তরকারি 'হাঁস-হাঁস' করে খেয়ে ফেললো। তবু ক্ষিদে মিটলো না। বলে, আর আছে নাকি খুড়ো?

আবার খানিকটা ভাত-তরকারি ধনপতির পাতে ঢেলে দিলে নটবর। সেটুকু চেঁচে-পুঁচে খেয়ে ঢকঢক করে খানিকটা জল পান করলে ধনপতি। তারপর তামাক সাজতে বললে নটবরকে।

সাধারণত নেশার বশ নয় ধনপতি। তবে মন চাইলে কখনো-সখনো এক-আধটা বিড়ি সিগারেট টানে। নটবর হুঁকো- কলকের পাট করার পর থেকে মাঝে মাঝে সে-ও টানে। তবে ওর তামাক-টানা মানে এক ছিলিম একাই শেষ করা।

ডিঙির গলুইতে আরাম করে বসে ডাবা-হুঁকোয় তামাক টানতে আরম্ভ করে ধনপতি। বলে, এবারে বোধহয় মেলার তেমন জোর হবে না খুড়ো।

—'নেরন্নের' দেশে আর মেলার কত জমক হবে। তবে শেষের ক'দিন জমবে। আজকের দিন গেলে কাল 'অস্টুমি' পড়লে দেখতে পাবি মেলার ভোল পালটে গেছে।

মেলা জমলো নবমীর দিন থেকে। মোল্লাখালির ধান-কলের মাঠও হাটের চেহারা বদলে গেল। তবু আর আর বছরের চেয়ে জৌলুস কম।

দূর-দূর গ্রামগঞ্জ থেকে এসেছে দোকানদার, এসেছে ভোজবাজির খেলা, সার্কাস, ম্যাজিকের পার্টি। বাসিরহাট-ডায়মণ্ডহারবারের শহুরে দেহ-পসারিনীরাও হোগলার চালায় আস্তানা গেড়েছে। এরপর এবারের মেলার নতুন আকর্ষণ, মেদিনীপুরের নাচওয়ালীর তাঁবু। নাচওয়ালীরাও গঙ্গাজলে-ধোয়া সতী নয়। নাচ দেখানোটা ওদের বাইরের ব্যাপার। আসলে ওরাও দেহ-পসারিনী।

অষ্টমীর দিনে তবু খানিক বিশ্রামের অবসর পেয়েছিল ধনপতি, কিন্তু নবমীর

দিনে সকাল থেকে একদণ্ড ডিঙি বেঁধে রাখতে পারে নি। সারাদিনের মধ্যে নাওয়া-খাওয়ার সময় পায়নি কেউ। ডোরার উনুন পর্যন্ত জ্বলেনি আজ। হাতে হাতে চিঁড়ে-মুড়ি-মেঠাই খেয়ে কেটে গেছে সকাল দুপুর।

সন্ধ্যার পর 'এক ঝুল' ডিঙি বেয়ে নটবরের কথামতো গেরাবি ফেললো ধনপতি। রাত-ভোর আর গেরাবি তুলবে না। সারাদিন শরীরের ওপর দিয়ে যে ধকল গেছে, এরপর রাতে ডিঙি বাইতে গেলে জানে মরতে হবে। অন্য সময় হলে ধনপতি বলতো, 'জিরেনের' দরকার নেই আমার। তুমি না পারো আমি ডিঙি বাইবো'খন। কিন্তু সেদিনের মালকাঠ ঝাঁকার চেষ্টায় ওর গা-গতর এখনও পর্যন্ত ব্যথায় টাটিয়ে রয়েছে। তারপর আজ সারাদিন হাড় ভাঙা খাটুনি খেটে দেহ এলিয়ে পড়েছে। এখন আর কাজে মন নেই।

বুড়োমানুষ নটবর। সারাদিনের পরিশ্রমে সে-ও কাবু হয়ে পড়েছে। এখন আর ডোরায় গিয়ে রান্নাবাড়ার ইচ্ছে নেই। রাজবংশীদের ছেলেটি বলেছিল রান্না করবে, কিন্তু ধনপতি বারণ করেছে। বলেছে, হাটখোলার হোটেল থেকে ভাত-মাছ কিনে আনতে।

প্রথম রাতেই খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো নটবর আর রাজবংশীদের ছেলেটি। ধনপতি ছই-এর বাইরে পাটাতনের ওপর মাদুর বালিশ বিছিয়ে শুয়ে পড়লো, কিন্তু ঘুম এলো না চোখে।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইলো মোল্লাখালির হাট, ধান-কলের মাঠ। গাঙ ধারের ভেড়ি পথে অনেক রাত পর্যন্ত চললো মানুষের আনাগোনা। মাঝ-রাতে চড়া ভাড়া পেয়ে অনেকে ডিঙি ভাসালো। ধনপতি জেগে থেকে সবকিছু লক্ষ্য করেছে।

তারপর একসময় মোল্লাখালির হাট, ধান-কলের মাঠ ঝিমিয়ে পড়লো। ধনপতির চোখেও ঘুম নামলো।

কাকপক্ষী ডাকার আগে ধনপতির ঘুম ভাঙলো সানাই-এর সুর শুনে।

ধান-কলের মাঠে পূজামণ্ডপে বাজছে সানাই। ভগবানদাস চাপরাশী এবারে নিজে উদ্যোগ করে কলকাতা থেকে সানাই আনিয়েছে। ভারী চমৎকার বাজায়। সুর যেন কথা বলে।

ঘুম ভেঙেছে, তবু চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে ধনপতি! কান পেতে শোনে সানাই-এর সুর। এ-সুর ওর মর্মে গিয়ে পৌঁছয়।

একসময় থেমে গেল সানাই। ঢাকে কাঠি পড়লো। ঢাক-ঢোল, কাঁসি। ঢাকের বাজনা শুনেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে ধনপতি।

অগুনতি ডিঙি বাঁধা ঘাটে। ভোর হয়েছে, এখনও বেশির ভাগ মাঝি-মাল্লার ঘুম ভাঙেনি। ধনপতি দেখলো, অদূরে একটা ডিঙিতে একজন মুসলমান মাঝি আজান দিচ্ছে। ইতস্তত আরও দু-চারটি ডিঙির মাঝি জেগেছে মাত্র।

বেশির ভাগ ডিঙি নৌকো আর হাটুরে কিস্তিগুলো দূর গ্রাম-গঞ্জ থেকে এসেছে। আজ 'আড়ঙ' না দেখে কোনোটি ফিরে যাবে না। ভাসান হবে সন্ধ্যের পর, তার পরেই তো আড়ঙের মেলা ঠিক ঠিক জমবে। আজ রাতের মতো এমন চেকনাইদার রাত আর মোল্লাখালিতে আসে না। হাজার হাজাকের আলোয় ধান-কলের মাঠ, হাট আজ রাত জাগবে।

ধনপতি পুবদিকে ফিরে বসে আছে। সূর্য-ওঠা দেখবে। কিন্তু পুব-আকাশের কিনারায় জমে আছে কালো মেঘ। সূর্য-ওঠা দেখা যাবে না মেঘের আড়াল থেকে, তবু দেখার নেশা।

দিনের আলো পরিষ্কার হয়ে ফুটলো। কিন্তু সূর্য-ওঠা দেখা গেল না।

ইতিমধ্যে ঘুম ভেঙেছে নটবরের। রাজবংশীদের ছেলেটিও উঠে ডাঙায় গেছে। ধনপতি এত সময় চুপচাপ বসেছিল, এবারে উঠে আসে নটবরের পাশে। বলে, তোমার একতারাটা ঠিক আছে খুড়ো? যদি ঠিক থাকে তো গাও না একখানা গান।

—সাত সকালে গান শোনার ইচ্ছে কেন? নটবর বলে, হঠাৎ 'হুরুশ' লাগলো বুঝি?

—হুরুশ লাগেনি খুড়ো, মনে এলো—তাই বললাম।

নটবর ভালোমন্দ কিছু না বলে একতারাটা নিয়ে বসে। কিন্তু বার কয়েক টুং-টাং করে আঙুল চালানো বন্ধ করে। ধনপতি উঠে দাঁড়িয়ে অমন চোখ পাকিয়ে কী দেখছে!

—অ ধনপতি, ধনপতি রে, কী দেখছিস অমন করে?

—কী আবার। সেই মেয়েটারে দেখি। ডানাকাটা পরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আঙুলের নিশানায় ধনপতি অদূরে একটা বাবু-কসমের বজরা দেখায়। বলে, ওই ভ্যাখো।

নটবর লক্ষ্য করে অদূরে ঘাটের একটেরেয় একটা বজরা গেরাবি করা

রয়েছে। বজরার পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একজন কাঁচা বয়সের মেয়েছেলে। মেয়েটি এখানে এই পরিবেশে বেমানান।

মেয়েটিকে দেখেই চিনেছে ধনপতি। রাখাল মৃধার মেয়ে সেঁজুতি। যে 'কিরিস্তান' হয়ে বাসন্তী চলে গেছে মদন দাসের সঙ্গে।

সেঁজুতিকে দেখে ধনপতির সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যায়। সানাই-এর সুর, একতারার টুং-টাং, শরতের সকালের ফুরফুরে হাওয়া—সব ছাপিয়ে ওর মধ্যে একটা ঘৃণা পাক খেতে খেতে ওকে জড়িয়ে ধরেছে।

নটবর বলে, অ ধনপতি—চেনা মানুষরে চিনতি পারবি বৈকি, নে—গান শুনিস তো বোস।

—না; গান শোনবো না। ধনপতি তখনও চেয়ে আছে সেঁজুতির দিকে। পানু মোড়লের পুত-বৌ সেঁজুতি, স্বামীর অত্যাচারে ঘর ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে এসেছিল, আর তাকে আনতে গিয়েছিল ধনপতি—কথাটা ভাবতেই মরমে মরে যায় সে। সে যদি না যেত, তা হলে হয়তো রাখাল মৃধা মেয়েকে জামাই-এর হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে পারতো না।

হঠাৎ সেঁজুতিও দেখতে পেল ধনপতিকে। দেখতে পেয়েই মাথা নিচু করলো। একটু দাঁড়িয়ে থেকে বজরার ছাউনির মধ্যে চলে গেল। সেঁজুতিকে আর দেখতে পেল না ধনপতি।

খানিক বাদেই বজরার ভিতর থেকে শাদা আলখাল্লা পরা একজন যুবক বেরিয়ে এলো। নিশ্চয়ই ও মদন দাস। যার নামের আগে 'জোসেফ' না কি একটা কথা আছে। ধনপতি ভাবলো, 'ওই শালাই সেই বৌ-ফুসলোনা কিরিস্তান'। ধনপতিকে দেখছে মদন, নিশ্চয়ই সেঁজুতি ওকে বলেছে তার কথা।

মদনকে ভালো করে লক্ষ্য করলো ধনপতি। লম্বা দোহারা চেহারার ছোকরা। মাথায় লম্বা চুলে মাঝখান থেকে 'টেরি' কাটা। তারপর গলায় কালো কারের সঙ্গে 'চিকে'র মতো কী যেন ঝুলছে।

ধনপতি চাপা রাগে গরগর করতে থাকে। কিন্তু কি করবে সে। করবার কিছু নেই। আজ সেঁজুতির কথা ভাবতে মনটা শুধু বিষিয়ে ওঠে না, নিজেকে যেন অপরাধী মনে হয়। আরও মনে হয়, হয়তো ঘর-ছাড়া মন নিয়ে স্বামীর ঘর করতো সেঁজুতি। আবার একথাও মনে হয়, হয়তো স্বামীকে সে সুখী করতে পারে নি। তারই জন্যে ওর স্বামী অমন বয়ে গেছে।

কিন্তু পরক্ষণে ধনপতির মনে পড়ে সেদিনের সেঁজুতির কথা, যেদিন সে স্বামীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল এক কাপড়ে। সেদিন তো সেঁজুতিকে দেখেছিল 'লক্ষ্মী পিরতিমের মতো'। তবে?

বেশী সূক্ষ্ম চিন্তা ধনপতির মগজে আসে না। বেশি সময় কোনো কিছু চিন্তা করতে গেলে সবই তার কাছে গুলিয়ে যায়।

—এই ধনপতি, দাঁড়িয়ে ভাবিস কি? পান্তা-টান্তা খাবি নে? নটবর জিজ্ঞাসা করে।

—পান্তা পেলে কোথায়, ধনপতি বলে, কাল তো রাঁধোনি।

—কেনা ভাত, তাই চারটি ভিজিয়ে রেখিচি। নে, খাবি তো আয়।

ধনপতি ডোরায় গিয়ে পান্তার থালা নিয়ে বসে।

নটবর বলে, পান্তা খেয়ে শান্ত হয়ে বোস দিকিনি। আজকের দিনটা তো বুঝিস। তিনটে মানুষ খেটে-খুটে যদি পঞ্চাশটা আয় না করতি পারি তো 'আড়ঙের' আনন্দ হবে না।

—আমোদ ফুর্তি করার মতলব আছে নাকি খুড়োর? ধনপতি বলে, বলি—যা খুশী করো, যেন মালটাল টেনো না।

—থুঃ থুঃ, সে-সব কোন্ কালে ত্যাগ করিচি, নটবর বলে, আমোদ মানে পেট পুরে ভালো-মন্দ কিছু খাওয়া। আর—

—আর কি?

—বাইসকোপ এয়েচে, দ্যাখবো। তোরেও নে যাবো।

—তোমরা যেয়ো, আমার ওসব ভালো লাগে না। ধনপতি বলে, বাইসকোপের ছবি দেখে কি করবা, ছবি দ্যাখবা তো বাদাবনে চলো, হরিণ-ভাঙা দে সাগরের 'মোনে' চলো—দ্যাখবা ছবি কারে বলে।

রাজবংশীদের ছেলেটি নীরবে তেঁতুল-গুড় দিয়ে পান্তা খাচ্ছিল। হঠাৎ ধনপতি তাকে জিজ্ঞাসা করে, এই তোর নাম কিরে?

—বোকা পাড়ুই।

—তুই সাগরে যাবি?

ধনপতির কথা শুনে বোকা হকচকিয়ে যায়। সাগরের কথা শুনেছে সে বাপ-ঠাকুর্দার মুখে। শুনেছে, সাগরের কূল-কিনারা নেই। সেখানে অথৈ জল, যার 'ঠেঙো' পাওয়া যায় না।

—তোরে আমি সাগরে নে যাবো বোকা, যাবি তো?

বোকা ভয়ে ভয়ে ঘাড় নাড়ে। মালকাঠ-ঝাঁকা ধনপতির কথা সে জানে। তাছাড়া কদিন ধরে খাপছাড়া মেজাজের মানুষটিকে তো চোখে দেখছে।

—অ মাঝি ভাই, আমাদের পার করে দেবা? গাঙ-পারে দাঁড়িয়ে ডাকছে পারে যাবার যাত্রী।

—কজন আছো? নটবর শুধোয়।

—ন' জন।

—পারে যাতি পাঁচ টাকা লাগবে। যাবা তো এসো।

—পাঁচ টাকা কেন, চার টাকা দেবানে।

—বউনি বেলা দরাদরি কোরো না।—ন্যাও, এসো।

ডিঙির গেরাবি তুলে হালে বসলো নটবর। দাঁড়ে বসলো বোকা পাড়ুই। হুই-এর মুখে ঠেস দিয়ে ধনপতি তখন কলকের আগুনে ফুঁ দিচ্ছে। ওর ওই এক নতুন বাতিক হয়েছে কদিন হলো, তামাক খাওয়া।

নটবর হাল ধরে বসে আছে। গাঙের মাঝদরিয়ায় পৌঁছে সে গুনগুন করে সুর ধরে। সেই সুর একসময় গান হয়ে ফোটে। নটবর গায়,

ওরে ও মন,
আমি এক নতুন ময়না পুষেছি।
টিয়াতে আর ভরে না মন,
বুলবুলিতে না মেটে সাধ,
তাইতো রে মন—দেখে শুনে
এক নতুন ময়না পুষেছি।

রঙ্গরসের ঢং-এ নটবর মাথা দোলাতে দোলাতে গায় তার মনের ময়না পোষার গান। এ গান তার নিজেরই বাঁধা।

॥ পনেরো ॥

সন্ধ্যের পর ভাসান পর্ব শেষ হলো।

বিকেল থেকে মোল্লাখালির গাঙের পার ভরে গিয়েছিল নরনারীর ভিড়ে। ভাসান পর্ব চুকলে সেই নরনারীর দল মেলা-মুখো হলো। আজকের মেলা নানা রসের নানা রঙের মেলা।

আজ সারা রাত হাজার হ্যাজাক, গ্যাসের আলোয় জাগবে ধানকলের মাঠ, হাট। সার্কাস, ভোজবাজির খেলা, যাত্রা, তরজা, রঙ-তামাশা এ তো চলবেই, এ-ছাড়া ফড়, জুয়া চলবে রাতভোর। নেশাখোর, জুয়াড়ী আর লম্পটের দল আজ নরক গুলজার করবে এখানে। বড়ের চালে কিস্তি মাত করবে সবাই।

ক' বছর ধরে মেলা বসছে, কিন্তু ধনপতি আজও আড়ঙের দিন মেলায় যায়নি। এ-সব নোংরামি, ইতরামি তার বরদাস্ত হয় না। বেলেল্লাপনা দেখলেই ওর মাথায় খুন চেপে যায়। যেখানে বেলেল্লাপনা সেখানে ও নেই।

ভগবানদাস চাপরাশী একবার ডেকেছিল ধনপতিকে। বলেছিল, মেলায় সে কুস্তি লড়াই-এর ব্যবস্থা করবে। তবে, ধনপতি যদি মোল্লাখালির হয়ে লড়ে, তাহলে। ধনপতি রাজী হয় নি। বলেছিল, তোমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে পারি, তাই বলে মেলার মধ্যে এ 'শম্মা' কুস্তি লড়বে না। তা ছাড়া এই মেলা বসিয়ে তুমি দেশটারে 'খানে-খারাপে' দিলে।

ধনপতির কথার সুর পছন্দ হয়নি ভগবানদাসের। বাবুলোকেরাও তাকে 'আপনি' বলে, আর ধনপতি কিনা 'তুমি' করে তার সঙ্গে কথা বললে। কিন্তু ধনপতির মুখের ওপর কিছু বলতে তার সাহস হয়নি।

ধনপতি এরপর ভগবানদাসের ওখান থেকে সটান চলে এসেছিল তার ডিঙিতে। এসে নটবরকে ডেকে বলেছিল, তোমাদের ওই চাপরাশীর পো'রে দু'কথা শোনায়ে দে এ্যালাম খুড়ো।

নটবর কোনো মন্তব্য করেনি। ধনপতির কথাটা শুধু শুনেছিল মাত্র।

এবারে ঘটনা ঘটলো অন্য রকম। ভাসানের পর ধনপতি নিজে থেকেই বলে, চলো খুড়ো—মেলা দেখে আসি।

নটবর একটু বিস্মিত হয়, বলে, তুই বলিস কি, মেলায় যাবি!

—হ্যাঁ, তা হয়েছে কী?

নটবর কিছু সময় চুপ করে থাকে। তারপর মাথা চুলকে বলে, কদিন গেলি নে, আজ যাবি কি করতি? আজ যাস নে।

—যাবো। তুমি যাবা তো চলো—বলে বোকাকেও ডাকে, এই বোকা, যাবি নাকি মেলা দেখতি?

মনে ইচ্ছে থাকলেও বোকা ভয়ে ভয়ে বলে, না।

—যাক, তোর যাতি হবে না। তুই ডিঙিতে থাক, আমি আর খুড়ো এক চক্কোর ঘুরে আসি।

গাঙে ভরা জোয়ার। জোয়ারের জল কূল ছুঁয়েছে। ডাঙায় নেমেই ধনপতি দেখতে পেল সেঁজুতি আর মদন দাস আসছে। মদনের হাতে একরাশ বই। 'মথি লিখিত সুসমাচার'—এত সময় মেলার একান্তে এগুলো বিলি করেছে ওরা দুজনে।

ধনপতির মুখোমুখি হয়েই থমকে দাঁড়ায় সেঁজুতি। বেশ সহজ ভাবে বলে, ভালো আছো তো?

ধনপতি চেয়ে থাকে সেঁজুতির দিকে। মেলার আলো এসে পড়েছে সেঁজুতির মুখে, যে আলোয় ধনপতি লক্ষ্য করে সেঁজুতির মুখের প্রতিটি রেখা। আগের চেয়ে আরো সুন্দর হয়েছে সেঁজুতি, আগের চেয়ে আরো—

চিন্তাটা হোঁচট খায় আচমকা। সকালে সেঁজুতিকে দূর থেকে দেখে ওর মনটা বিষিয়ে উঠেছিল, তখন কত বেমানান লেগেছিল তাকে। এখনকার এ ভালোলাগাটাও মিছে মনে হলো ধনপতির। সেঁজুতির কথার উত্তর না দিয়ে সে হনহন করে পা চালালো মেলার দিকে।

—এই ধনপতি, শোন।

কে একজন লোক টলতে টলতে আসছিল মেলার দিক থেকে। কাছে আসতে লোকটিকে চিনতে পারে ধনপতি। হাটখোলার ভনড়ু পান্তি।

ভনড়ু পান্তিকে এ তল্লাটের সবাই চেনে। অমন বদ্-স্বভাবের মানুষ এখানে আর দ্বিতীয়টি নেই। ওকে হাটখোলা থেকে তাড়ানোর অনেক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু ভগবানদাস চাপরাশীর জন্যে তা সম্ভব হয় নি। ভগবানদাস ওকে আজ ক' বছর ধরে পুষছে। লোকটি মাতাল লম্পট শুধু নয়, যত রকমের নোংরা কাজ আছে ও সবই পারে। মায় খুনখারাপি পর্যন্ত।

—এই ধনপতি, ভনড়ু জড়িত কণ্ঠে ডাক দেয় ধনপতিকে। ধনপতি থমকে দাঁড়ায়। ভনড়ু ততক্ষণে টলতে টলতে এগিয়ে এসেছে। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, ওই কিরিস্তান ছুঁড়ি কি বলছিল তোর সঙ্গে?

—তুই তোকারি করে কথা বলবা না। ধনপতি গম্ভীর ভাবেই বলে, আর কিছু দরকার আছে?

—শালা, ও মাগীর বাহার দেখেছিস, বলে অত্যন্ত নোংরা ভাষায় ভনড়ু খিস্তি করে।

ধনপতি এমনিতে শান্ত মানুষ, কিন্তু রাগলে ওর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। হঠাৎ একটা বিরাশী সিক্কার চড় মেরে বসে ভন্ডুর গালে। চড়ের ধাক্কা সামলাতে না পেরে ভন্ডু টাল খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়। ধনপতি দাঁতে দাঁত ঘষে বলে, বেয়াকুব, মাতলামো কম্মার আর জায়গা পাওনি—গায়ে খুব চুলকুনি হয়েছে, না? জানোয়ার কোথাকার।

দেখতে দেখতে লোকজন জমে যায়। মেলার মধ্যে এ-রকম একটা ঘটনা ঘটতে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। ইতিমধ্যে ভন্ডু গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। জড়ো হওয়া লোকজনের মধ্যে ভন্ডুর সমর্থকই বেশি। কিন্তু ধনপতির সামনে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না।

হঠাৎ কে একজন ধনপতির কাছার কাপড় ধরে টেনে ভিড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দেয়। রুখে দাঁড়ায় ধনপতি। চিৎকার করে ওঠে। পিছন দিক থেকে কয়েকজন লোক ছুটে এসে ধনপতিকে আক্রমণ করে।

প্রথমটা দাঁড়িয়ে মার খায় ধনপতি। কিন্তু নিমেষের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। বিপুল বিক্রমে রুখে দাঁড়ায়, চিৎকার করে, তারপরেই সে ক্ষ্যাপা মহিষের মতো ভিড় ঠেলে ছুটে যায় মেলার দিকে। কে যেন ধারালো ছুরি দিয়ে ওর কাঁধের কাছে মেরেছে, দরদর করে রক্ত ঝরছে সেখান থেকে। ক্ষতস্থানে হাত বুলিয়ে, সেই রক্ত-মাখা হাত একবার চোখের সামনে তুলে ধরে উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে ধনপতি। পাগলের মতো আকাশ-ফাটা হাসি হাসতে হাসতে মেলার হোগলার চালার একটা শক্ত গরানের খুঁটি উপড়ে আবার ছুটে আসে।

কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ধনপতির। সেই গরানের খুঁটি হাতে নিয়ে ছুটে আসছে ভিড়ের দিকে, যেখানে এখনো ভন্ডুকে নিয়ে রীতিমতো জটলা চলছে।

ধনপতির চেহারা হয়েছে যেন সাক্ষাৎ কালাপাহাড়। চোখ দুটো জ্বলছে আগুনের মতো, মাথায় ঝাঁকড়া চুল এলোমেলো হয়ে গেছে, সর্বাঙ্গে ঝরছে ঘাম, তারপর কাপড়ে, হাতে লেগেছে ক্ষতস্থানের রক্ত।

ধনপতিকে ছুটে আসতে দেখেই যে যেদিকে পারে ছুটে পালায়। ধনপতিও যেন ক্ষেপে গেছে, হারিয়ে গেছে বিচার-বুদ্ধি। সেও ছুটে বেড়াচ্ছে গরানের খুঁটি হাতে নিয়ে। কিন্তু আশ্চর্য, হাতের কাছে পেয়েও সে কাউকে আঘাত করছে না।

দেখতে দেখতে সারা হাটখোলা, ধানকলের মাঠ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আসল

ব্যাপার জানবার কৌতূহল নেই কারও, সবাই শুনছে দারুণ গণ্ডগোল শুরু হয়েছে, দাঙ্গা, মারামারি চলছে—এই শুনেই বন্ধ হয়ে গেল মেলার ঝাঁপ, আসর গুটিয়ে পালালো জুয়াড়ীর দল, বাচ্চা ছেলে-মেয়ে আর মেয়েরা শুরু করে দিলে কান্নাকাটি। সব মিলিয়ে এক লণ্ডভণ্ড ব্যাপার। বন্ধ হয়ে গেল সার্কাসের খেলা, ভেঙে গেল যাত্রার আসর—সেই ভাঙা মেলার মধ্যে তখনো গরানের খুঁটি হাতে নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে ধনপতি। ওকে শান্ত করে, ওকে কাছে ডাকে—এমন কেউ নেই মেলার মধ্যে।

যেদিকে বারবিলাসিনীরা এসে হোগলা আর দর্মার চালায় রূপের হাট বসিয়েছে, ধনপতি সেদিকে ছুটলো। সেদিকেও ততক্ষণে মেলা ভাঙার খবর পৌছেছে। সেখানে তখনো মাতাল, লম্পটের লীলা চলছিল, কিন্তু ধনপতির হাসি আর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাওয়া—দেখতে দেখতে ছোট ছোট চালাগুলোর আলো নিবে গেল। যারা রাতের অতিথির জন্যে বাইরে দাঁড়িয়েছিল, তারাও ভয় পেয়ে ভিতরে গেল। ধনপতি ছুটতে ছুটতে আবার ফিরে এলো হাটখোলার ঘাটের দিকে। যেখানে সেঁজুতি, মদন দাস, নটবর, বোকাকে ঘিরে আরো ক'জন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ধনপতি তখনও শান্ত হয়নি। তখনও তার দেহের শিরায় শিরায় ঝড় বইছে। তবু বাইরে থেকে সে যেন শান্ত হয়ে গেছে।

সেঁজুতি এগিয়ে এলো। এসেই ধনপতির ক্ষতস্থানের রক্ত দেখে শিউরে উঠলো। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই ধনপতি বলে ওঠে, আমার ভাবনা কারো ভাবতি হবে না। সব 'ভাবনাদারেরে' আমি চিনি। যাও—

কিন্তু সেঁজুতি কিছু বলতে যায়। অথচ বলতে পারে না। ধনপতি ততক্ষণে ভেড়ির ওপর দিয়ে খানিক দূর এগিয়ে গেছে।

—ধনপতিরে, যাস কোথায় ?

—ডিঙিতে, যাবা তো এসো।

—একবার যতীন ডাক্তারের কাছে গেলে ভালো হতো না ?

—নিকুচি করেছে ডাক্তারের, তুমি এসো দিকিনি। বলে সোজা ডিঙিতে গিয়ে ওঠে ধনপতি। ডিঙির গলুইতে বসে একবার পারের দিকে চায়। নটবরও না পেরে ডিঙিতে এসে উঠলো। বোকার পাত্তা নেই। একটু আগেও ছিল, তারপর ভাবগতিক দেখে কোথায় যেন সরে পড়েছে।

মেলা তছনছ হয়ে গেছে। কিছু লোকজন চলে গেলেও এখনো কয়েক হাজার মানুষ রয়েছে ধানকলের মাঠ আর হাটখোলা জুড়ে। দোকানীরা আছে, রয়েছে আরও মানুষেরা।

ঘটনার একটা পরিচ্ছেদ শেষ হয়েছে। এখনো অনেক বাকি। এত সময় আসল ব্যাপারটা কারও কাছে পরিষ্কার হয়নি, কিন্তু যখন বুঝলো একটা মানুষের জন্যে এই কাণ্ড, তখন অধিকাংশের রাগ পড়লো সেই মানুষটার ওপর।

ধনপতি ডিঙির গলুইতে চুপচাপ বসে আছে। মাঝে মাঝে ফিরে দেখছে পারের দিকে।

পারে লোকের ভিড় বাড়ছে। কানে আসছে নানা কথা। সব কথাই তাকে নিয়ে। ও বুঝতে পারে একদল লোক ওর ওপরে মারমুখো হয়ে উঠেছে।

নটবর যেন একটু ভয়ই পেয়েছে। বলে, এখানে থাকা কি ঠিক হবে রে ধনপতি। তার চেয়ে চল ডিঙি বেয়ে ওপারে যাই।

আচমকা চিৎকার করে ওঠে ধনপতি, খুড়ো ভুলে যাও কেন আমি মাল-কাঠ-ঝাঁকা ধনপতি।

—ঠিক বলেছিস ভাই। পাশের একটা ডিঙি থেকে কে যেন বলে ওঠে। কণ্ঠস্বর চেনা লাগে ধনপতির। হঠাৎ মনে পড়ে যায় পাঞ্চাতনের কথা। জিজ্ঞাসা করে, কে, পাঞ্চাতন নাকি?

—হ্যাঁ।

ধনপতির গুরুভাই পাঞ্চাতন। একই সঙ্গে কর্ম বাউলির আখড়ায় মালকাঠ ঝেঁকেছে, একই সঙ্গে কুস্তি লড়েছে।

পাঞ্চাতন বলে, এই আমি এ্যালাম, শোনলাম সব কথা। ভালোই করিছিস ভাই।

শুধু পাঞ্চাতন নয়; আশপাশের ডিঙিতে যে সব মাঝি-মাল্লারা ছিল, ধনপতিকে তারাও সাহস যোগায়।

নটবর কিছু সময় চুপ করে থাকার পর বলে, ধনপতি, সবই তো হলো—কিন্তু তোর কাঁধটা, ওটার একটা ব্যবস্থা করবি তো।

—তুমি চুপ করো দিকিন খুড়ো। ওটুকু ছুরির ঘায়ে আমার কিছু হয় না। বরং একটুখানি নুন ছাও, তাই টিপে দেই।

মুঠোয় ভরে নুন আর একফালি ন্যাকড়া নিয়ে আসে নটবর। হ্যারিকেনের

আলোয় দেখে, ধনপতির কাঁধের ওপরের খানিকটা মাংস আলগা হয়ে গেছে। রক্ত আর ঝরছে না। খানিকটা রক্ত জমে রয়েছে কাটা জায়গার ওপরে।

মুন টিপে ন্যাকড়ার ফালি দিয়ে ধনপতির ক্ষতস্থান বেঁধে দেয় নটবর। কথায় বলে, 'কাটা ঘায়ে মুনের ছিটে' কিন্তু অতটা মুন দেওয়ার পরেও ধনপতি একবার টুঁ শব্দ করলো না।

—কই, কোথায় সে ধনপতি? ডাক তারে, ভেড়ির ওপর থেকে কে যেন চিৎকার করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া পড়ে যায় ভেড়ির ওপরকার লোকজনের মধ্যে। কয়েকজন ধনপতির নামে যা খুশী তাই বলতে বলতে নেমে আসে ভেড়ির ওপর থেকে। দু'একটা ঢিলও এসে পড়ে ধনপতির ডিঙির কাছাকাছি। আশ্চর্য, এই সবের পরেও ধনপতি শান্ত হয়ে বসে রয়েছে।

শেষটা কে একজন ধনপতির বাবার নাম ধরে জঘন্য উক্তি করে ওঠে। ধনপতি আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ডিঙির হাল খুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর চিৎকার করে বলে, এই আমি দাঁড়িয়ে আছি, আয় দেখি—যত সব ভেড়ার পাল। এতক্ষণ ছিলি কোথায়?

ধনপতির আকাশ-ফাটা চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ঘাটের যত মাঝি-মাল্লা তারাও যে যার মতো রুখে ওঠে। ইতিমধ্যে পাঞ্চাতন এ-ডিঙি সে-ডিঙিতে পা ফেলে ধনপতির ডিঙিতে উঠে এসেছে।

ধনপতি লাফ দিয়ে ডাঙায় নামতে যায় আর কি। কিন্তু পাঞ্চাতনই তাকে ধরে ফেলে। বলে, ওদের সব চেল্লাতে দে। তারপর দ্যাখনা কি হয়।

কিন্তু কত সময় ধনপতিকে সামলে রাখবে পাঞ্চাতন। শেষটা পাঞ্চাতনকে ঠেলে হাল হাতে নিয়ে লাফিয়ে পড়ে ডাঙায়। হাল উঁচিয়ে ছুটে যায় ভেড়ির দিকে।

ধনপতিকে ছুটে আসতে দেখেই কিছু লোক ছুটে পালায় এদিক-ওদিক। কিছু লোক ভেড়ির ওধারে নেমে যায়। হাল ঘোরাতে ঘোরাতে ধনপতি চিৎকার করতে থাকে বিকট শব্দে।

এদিকে শুধু পাঞ্চাতন নয়, সাহসী মাঝি-মাল্লাদের অনেকেই লাঠি-সোঁটা নিয়ে ডাঙায় নেমে এসেছে। কুমিরমারীর অনন্ত লাট, নাম করা ঠ্যাঙাড়ে, সেও কি কাজে এসেছিল মোল্লাখালিতে—ধনপতির হয়ে সেও রুখে দাঁড়ায়।

ধনপতি, পাঞ্চাতন আর অনন্ত লাট—এসে দাঁড়ায় ভেড়ির ওপরে। অনন্ত লাট চিৎকার করে বলে, কই, কাজিয়া করবা তো এসো।

একটি মানুষও সাহস পেয়ে এগিয়ে আসে না। শুধু দূরে দাঁড়িয়ে কিছু লোক জটলা করছে মাত্র।

কিছু সময় দাঁড়িয়ে থেকে এরাও ফিরে আসে ডিঙিতে। পাল্লাতন আর অনন্ত লাটের কাঁধে হাত রেখে ডিঙির পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে ধনপতি একবার উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে।

রাত কেটে গেল। ভোরে, ঘুম-ভাঙা চোখে ধনপতি পূবের আকাশের দিকে চেয়ে থাকে খানিক সময়ের জন্যে। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় কি খেয়ালে। যে সূর্যোদয় দেখাটা তার কাছে নেশার মতো, আজ সূর্যোদয়ের প্রাক্-মুহূর্তে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে সে।

একটা ডিঙি জল কেটে কেটে এদিকে আসছে। সেই বজরা ধাঁচের ডিঙি। যেটায় সেঁজুতিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল গতকাল।

কাছে এলো ডিঙিটা। সেঁজুতিকে দেখতে পেল ডিঙির বাইরে। ওকে দেখেই সেঁজুতি বলে, চলে যাচ্ছি ভাই, আবার দেখা হবে কিনা জানি না।

—রামচন্দ্রের মরণ কালে একবার দেখা দিয়ে এলে পারতে। ধনপতি কথাটা না শুনিয়ে পারে না। বলে, লক্ষ্মণ আমার ডিঙি নে গিছিল তোমারে আনতি। শোনলাম তোমার বাপের কাছে সব কথা। যা করেছো তার আর হাত নেই, তবে পারো তো একবার চোখের দেখা দে এসো।

খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেঁজুতির মুখখানা যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ধনপতি সেদিকে লক্ষ্য না রেখেই বলে, সে হয়তো এখন তোমার কেউ না, কিন্তু একদিন তোমার স্বামী ছিল তো।

সেঁজুতি নীরবে শুনলো ধনপতির কথা। শোনার পরে তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো ফোঁটা ফোঁটা জল। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখে জড়ানো পুরনো দিনের ছবি ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে।

—ডিঙি ছাড়ো। সেঁজুতি তার মাঝিকে ডিঙি ছাড়ার নির্দেশ দেয়।

আবার দাঁড় টেনে ফিরে চলে সেঁজুতির ডিঙি। ধনপতি ফিরে তাকায়। দেখে, ডিঙির প্রান্তে বসে আঁচলে চোখ মুছছে সেঁজুতি।

চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ধনপতি। ভাবে, জীবনের রঙ কত তাড়াতাড়ি বদলে যায়। কিন্তু পরের ভাবনা ভাবতে আর মন চায় না ধনপতির।

এক চিন্তা থেকে আর এক চিন্তা—ধনপতির মনে হয় ডিঙি বেঁধে সে-ও আর

চুপ করে বসে থাকবে না। আর সে ঘাটে ঘাটে সওয়ারী নিয়ে ফিরবে না। আবার সে ডিঙি ভাসাবে বাদাবনের দিকে। তারপর বাদাবন থেকে যাবে সাগরে। সাগর দেখার স্বপ্ন ওর অনেক দিনের।

সাগরে যাবার চিন্তায় বিভোর হয়ে ওঠে ধনপতি। কিন্তু সাগর যে অনেক দূরের পথ। অনেক গাঙ পেরিয়ে লক্ষ লক্ষ ঢেউ ভেঙে, ঝড়-তুফানের সঙ্গে লড়াই করে, তবে পৌঁছনো যাবে সাগরের বুকে।

—কী রে, ভাবিস কি? পাঞ্চাতনের ঘুম ভেঙেছে। দেখেছে সে চিন্তা-কাতর ধনপতিকে। দেখেই তবে জিজ্ঞাসা করেছে।

—কিছু না।

—কিছু না মানে? বল না কি ভাবছিলি?

—কিছু না রে ভাই। আমার আবার ভাবনা কি।

পাঞ্চাতন মৃদু হাসে। বলে, তোরে রোগে ধরেছে ধনপতি, আমি তো জানি তোরে। ঘূর্ণি-ঝড় কখনো সোজা বয় না।

—ঠিক বলিছিস। বলে ডান হাতখানা তুলতে গেল ধনপতি। পারলো না। ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে আছে হাতটা।

—এবার আমি যাবো, এই গনেই না বেরোলে মঠবাড়ির হাট ধরতি পারবো না। পাঞ্চাতন জিজ্ঞাসা করে, তুই যাবি আমার সঙ্গে?

—না।

—যাতি আপত্তি কেন?

—যাতি হয় পরে যাবো, আজ না।

যাবার আগে পাঞ্চাতন বারবার বলে যায় ধনপতিকে, সে যেন একবার তার বাড়িতে যায়। ধনপতি কথা দিয়েছে, যাবে—কিন্তু কবে তার ঠিক নেই। একবার সে যাবে এই পর্যন্ত।

পাঞ্চাতন চলে যাবার পরও ধনপতি একভাবে বসে রইলো ডিঙির পাটাতনের ওপর। ইতিমধ্যে সূর্য উঠেছে, পরিষ্কার হয়ে ফুটেছে দিনের আলো। কিন্তু সূর্যোদয়ের মুহূর্তে ধনপতি আজ আর পূব আকাশের দিকে ফিরে তাকায়নি।

ভাঁটার টান লেগেছে মোল্লাখালির গাঙে।

দক্ষিণে যাবে যারা, তারা এই টানেই ডিঙি ছেড়ে দিয়েছে। এক এক করে ঘাট থেকে অনেক ডিঙিই চলে গেল।

হঠাৎ ধনপতির মনে এলো, এই ভাঁটাতেই সে ডিঙি ভাসিয়ে যাবে সাত-জেলিয়ার হাটখোলায়। প্রতি বছরেই ও আড়ঙের পরদিন যায় বারুণীবালার বাড়ি। নিয়ে যায় মেঠাই মণ্ডা। প্রতি বারেই দেখেছে বারুণী ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছে খিড়কির দরজার পাশে।

হয়তো বারুণী আজও খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ধনপতির পথ চেয়ে। তার ছেলেমেয়েগুলোও হয়তো ভাবছে কখন আসবে মোল্লাখালির মামা।

ধনপতি গলা চড়িয়ে বলে, গেরাবি তোলো খুড়ো—সাতজেলেয় যাবো।

সাতজেলিয়ার ঘাটে ডিঙি বেঁধে ধনপতি প্রথমে গেল হাটখোলায়। মেঠাই কিনলো। তারপর নটবরকে নিয়ে বারুণীর বাড়ির পথ ধরলো। খিড়কির দরজায় বারুণীকে দেখতে পেল না আজ, কিন্তু সদরে এসে 'বোনাই আছো—বোনাই' হাঁক পাড়তে বারুণী ছুটতে ছুটতে এলো। আলুথালু হয়ে গেছে বারুণীর কাপড়-চোপড়, মাথার চুল এলোমেলো, ধনপতিকে দেখেই প্রথমে বলে ওঠে, তুমি তা হলি আছো!

ধনপতি বিস্মিত হলো বারুণীর কথায়। বারুণী হঠাৎ এমন কথা বললে কেন!

বারুণী আজ দুপুরেই শুনেছে মোল্লাখালির মেলায় গণ্ডগোলের কথা। এখান থেকে যারা মেলায় গিয়েছিল তারাই বলেছে ফলাও করে। বলেছে, হয়তো ধনপতিকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, কিংবা হাটখোলার লোকে তাকে মেরেছে। কথাটা শোনার পর থেকে বারুণীর মাথার ঠিক ছিল না। স্বামী বাড়ি নেই, নয়তো তাকে পাঠাতো খবর নিতে। পাড়ার দু'একজনকে বলেও ছিল, কিন্তু তারা কেউই যেতে চায়নি। শেষটা বারুণী শুধু পাগলের মতো ঘর বার করেছে। যাকে দেখেছে তাকেই ডেকে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছে ধনপতির খবর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পথের মানুষকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি।

খানিক সময় ধনপতির মুখের দিকে চেয়ে থাকে বারুণী। তারপর সহজ হয়ে যায়। প্রণাম করে নটবর আর ধনপতিকে।

এদিকে বারুণীর ছেলেমেয়েরা ছুটতে ছুটতে আসে। মোল্লাখালির মামার হাত থেকে মেঠাই-এর ঠোঙা নিয়ে তারা হৈ-চৈ আরম্ভ করে দেয়।

ধনপতি জিজ্ঞাসা করে, বোনাই কোথায়?

বারুণী বলে, সে গেছে কাউখালি। আজই ফেরবে।

এতক্ষণে বারুণীর চোখে পড়েছে ধনপতির কাঁধের ক্ষত। ক্ষতস্থান দিয়ে এখনো 'কষানি' গড়িয়ে পড়ছে। কাঁধের খানিকটা জায়গা যেন ফুলেছেও। ধনপতি যতই বলুক, ও কিছু না, সেরে যাবে, কিন্তু সে-কথায় কান দিলে না বারুণী। নিমপাতা সেদ্ধ জলে ধনপতির ক্ষতস্থান ধুয়ে মুছে রেড়ির তেল গরম করে ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে দিলে। তারপর গেল রান্নাঘরে।

শুধু শোল মাছের ঝোল আর ভাত—এই রান্না করলো বারুণী। ধনপতি আর নটবরকে গরম গরম ঝোল-ভাত পরিবেশন করে খাওয়ালো।

সারাদিনের পর গরম ঝোল-ভাত পেয়ে নটবরের খুশির অন্ত নেই। আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলে, দিদি—তোমার হাতের রান্না খেয়ে আমার আজ কি মনে হচ্ছে জানো—মনে হচ্ছে, 'অমিরত' খ্যালাম। এবার থেকে মাঝে মাঝে আসবো দিদি—তোমার রান্না খেয়ে যাবো পেট পুরে।

—বেশ তো। ধনপতির দিকে চোখের ইশারা করে বলে, এ মানুষটারেও নে এসো।

—ও মানষের কথা বলতি পারবো না, ও যদি অন্যের ইচ্ছেয় চলতো, তাহলি এমন দুর্গতি হয় ওর।

—ভ্যাখো খুড়ো, কথা বলতি আরম্ভ করলে তুমি আর থামতি জানো না। কথা না বলে আর খানিকটে ঝোল-ভাত খাও।

বারুণী সত্যি আরও খানিকটা ভাত দিতে যায় নটবরের পাতে। নটবর 'না-না' করে ওঠে। বলে, আর খাতি পারবো না দিদি, দমভোর খেইচি।

—তা বললে হবে না। ধনপতি বলে, এখনো তোমায় খাতি হবে।

নটবর শেষ পর্যন্ত উঠে পড়ে বলে, আমি আঁচিয়ে নে বসি গে, তুই আয় ততক্ষণে।

দিন পনেরোর মধ্যে ধনপতির কাঁধের ক্ষতস্থান শুকিয়ে গেল। এই কদিন সে একনাগাড়ে কেষ্ট নস্করের বাড়িতেই কাটিয়েছে।

এ-কদিনে শুধু নটবরের নয়, ধনপতির চেহারায়ও অনেকখানি জৌলুস ফিরে এসেছে। কেষ্ট নস্কর তাই ঠাট্টা করে বলেছে, এবারে তোমারে বে করতি হবে শালা আশ। বে করো, সাতজেলেয় একটা ঘর বেঁধে দেই—থাকো! আর কতকাল বাউণ্ডুলে পানা ঘুরে বেড়াবা।

ধনপতি বলেছে, বোনাই—বনের পাখিরে খাঁচায় ভরা যায়, বাঘ-ভাল্লুকরে

'সাৱকাসের' দলে খেলানো যায়, কিন্তু মানুষ যদি বাউণ্ডুলে হয়, তারে জোর করে ধরে রাখা যায় না—বুঝেছো ?

স্পষ্ট করে না বললেও, বারুণীও ধনপতিকে বলতে চেয়েছে সংসার করার কথা। কথার সুরেই তা অনুমান করে নিয়েছে ধনপতি। উত্তর না দিয়ে সে শুধু বারুণীর মুখের দিকে চেয়ে হেসেছে মাত্র।

ধনপতির হাসির সুরে বারুণীর মনটা একটা ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েছে। পাছে ধনপতির কাছে তার দুর্বলতা ধরা পড়ে, তাই সে সংসারের কাজের অছিলায় উঠে গেছে। ধনপতি বুঝতে পেরেছে বারুণীর মনের ব্যথা। সে-ও তাকে কাছে ডেকে বসিয়ে রাখতে চায়নি।

প্রতিদিনের মতো সেদিনেও সন্ধ্যের পর দাওয়ায় বসে বারুণীর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গল্পের আসর বসিয়েছে ধনপতি। বলছে বাদাবনের গল্প।

গল্পের মধ্যে একসময় বারুণীর মেজ মেয়ে জিজ্ঞাসা করে, তুমি আর যাবা না বাদায় ?

—যাবো।

—কবে যাবা ?

—আর দুদিন পরে।

—আমাদের নে যাবা ?

—হ্যাঁ, তোদের সবারে নে যাবো। দেখে আসবি বাদা।

এই কথা শোনার পরেই মেয়েটা লাফিয়ে উঠে, 'মা-মা' বলে ছুটে গেল ঘরের মধ্যে। ঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল বারুণী, সেও গল্প শুনছিল। মেয়েটা মাকে দরজার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কি বুঝলো সেই জানে—কেমন যেন উচ্ছ্বাস হারিয়ে ফেললো হঠাৎ। তবু কোনমতে বলে, মা—মোল্লাখালির মামা আমাদের বাদা দেখাতি নে যাবে।

—বেশ তো যাবি। বারুণী মেয়ের চিবুক স্পর্শ করে বলে, বাদাবনের কথা শুনতি ভালো, দেখতি গেলে ভালো না।

মেয়েটি আরও কিছু বলবে মনে করেও বলতে পারে না বারুণীও সেখানে আর না দাঁড়িয়ে চলে যায় রান্নাঘরের দিকে। গল্প শুনলে তো আর হবে না। এখনো রান্নাবান্না কিছুই হয়নি। তারপর আজ 'কাঁড়ি' খানেক বাইন মাছ এনেছে স্বামী। সেগুলো কোটা, ভাজা, তারপর রান্না করা। এদিকে আর খানিকবাদেই ছেলে-মেয়েগুলো খাইখাই আরম্ভ করে দেবে।

ধনপতির গল্প সেদিন ঐখানেই শেষ হলো। ছেলে-মেয়েগুলো আরো গল্প শুনবে বলে আবদার ধরলেও, গল্পে আর মন দিতে পারলো না ধনপতি। হঠাৎ মনটা কেমন যেন বেসুরো হয়ে গেছে।

রাতে।

খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে পড়েছে ধনপতি। কিন্তু ঘুম নেই চোখে। থেকে থেকে মনটা ছটফট করে উঠছে। নানা চিন্তা পাক দিয়ে উঠছে মনের মধ্যে। মাথার কাছে জানালাটা খোলা। খোলা জানালা দিয়ে অনেকখানি আকাশ দেখা যায়। উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে চিবুক রেখে রাতের আকাশের দিকে চেয়ে রইলো ধনপতি।

এক সময় তন্দ্রা এলো। তন্দ্রা থেকে ঘুম। গভীর ঘুমের মধ্যে বাকি রাতটা কেটে গেল। ঘুম ভাঙতেই পশ্চিমের জানালার দিকে চোখ পড়ে ধনপতির। ও কি! ওখানে দাঁড়িয়ে কেন বারুণী!

ধনপতি চোখ মেলে চাইতেই বারুণী সরে গেল জানালার পাশ থেকে। গেল গোয়াল ঘরে গোরু-বাছুর বার করতে।

ধনপতিও বিছানা ছেড়ে উঠলো। দরজা খুলে ঘরের বাইরে এলো। এদিক-ওদিক তাকিয়েও দেখতে পেল না বারুণীকে।

পূব আকাশ ফর্সা হয়ে উঠেছে। সূর্য ওঠার সময় হলো। সদরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গাঙের দিকে পা চালালো ধনপতি।

ভরা জোয়ারে টলমল করছে গাঙ। জল উঠেছে ভেড়ির মাথা পর্যন্ত। ভরা গাঙের ধারে ভেড়ির ওপর দাঁড়িয়ে রইলো ধনপতি। সূর্য ওঠার প্রতীক্ষায়।

সূর্য উঠলো।

সূর্যের সঙ্গে আরও একটি মুখ স্পষ্ট হয়ে উঠলো ধনপতির চোখের সামনে। সে মুখ বারুণীবালার।

জোয়ারের জলে টলমল করছে গাঙ। গাঙের জলে পড়েছে সূর্যের আলো। ছোট ছোট ঢেউ-এর বুকে সে আলো ঝলমলিয়ে উঠছে।

ধনপতি চেয়ে থাকে গাঙের জলের দিকে। তারপর সে দৃষ্টি ফেরায় দক্ষিণে। এখান থেকে দেখা যায় বাদাবনের অস্পষ্ট চেহারা। এ গাঙ গিয়ে পড়েছে কলাগাছির গাঙে। সেখান থেকে বেরিয়ে দক্ষিণে চলে গেছে গোজাবা নদী।

কলাগাছি আর গোসাবার পারে জঙ্গল। সাতজেলিয়া থেকে জঙ্গল পুরো এক ভাঁটার পথও নয়।

এরপর দক্ষিণে কোথাও জনপদের চিহ্ন নেই। ছোট বড় ভূখণ্ড জুড়ে শুধুই বাদাবন। বাদাবনের শেষ যেখানে, সেখানে গেলেই সাগর।

ঐ সূর্য আর নোনা গাঙ সাক্ষী রেখে ধনপতি মনে মনে শপথ নিলে— সাগরে যাবে সে।

ডিঙি নিয়ে সাগরে যাবো—এ ইচ্ছে অনেক কাল মনের মধ্যে পুষে রেখেছে ধনপতি।

॥ ষোল ॥

শেষ রাতে ভাঁটার টান শুরু হতেই ডিঙি ছেড়ে দিল ধনপতি। কেষ্ট নস্কর, বারুণী আর তার ছেলে-মেয়েদের বাদাবন দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে সে। একটানা দাঁড় টেনে ভাঁটার টান শেষ না হতেই বড় গাঙ পার হয়ে সজনেখালির মুখে এসে পৌঁছলো।

বাড়ি থেকে পান্তা ভাত আর ডাল-তরকারি এনেছে বারুণী। সজনেখালির জেটিতে বাঁধা ডিঙিতে বসে ভাত তরকারি খেলো সবাই। তারপর আবার ডিঙি ছাড়লো দক্ষিণমুখো।

প্রথমেই পাখিরালা এসে পৌঁছলো ওরা। গাঙ-পারে বাদার কাছ বরাবর ডিঙি বেয়ে এসেছে সে। ধনপতি এই বাদাবনের দেশে বার বার এসেছে, নতুন করে দেখার কিছু নেই! আজ সে এসেছে বাদা-বন দেখাতে।

বারুণী এই প্রথম দেখছে সুন্দরবনের চেহারা। বাদার এত কাছে তার বাড়ি, অথচ বাদাবন দেখার ভাগ্য তার হয়নি। অবাক হয়ে দেখছে বারুণী— অবাক হয়ে দেখছে তার ছেলে-মেয়েরা।

পাখিরালায় খাড়ির মুখে খানিক ডিঙি বেঁধে রাখলো ধনপতি। শোনালো পাখিরালার কথা। দেশ-বিদেশের পাখিরা শীতের দিনে এখানে আসে, আবার শীতান্তে অন্য দেশে চলে যায়। শুধু শীতের দিনে নয়, বারোমাসই এখানে নানা জাতের পাখির মেলা। সুন্দরবনের এই অঞ্চল যেন পাখিদের জন্যে নির্দিষ্ট একটা জগৎ।

পাখিরালার খাড়ি দিয়ে কিছু দূর গেলে হরিণচরার চক। কিন্তু খাড়ি দিয়ে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ডিঙি বাইতে তার ভরসা হয় না। এ-সব বাদাবনে বিপদ ঘটতে বেশি সময় লাগে না। তারপর এই সরু খাড়ির মধ্যে যেতে ডিঙির ওপর যখন-তখন ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে রাজা-বাঘ। দূর থেকেই 'পাখিরালা' দেখলো ওরা। পাখিরালা দেখতেই অনেকটা সময় গেল। ইতিমধ্যে ভাঁটা শেষ হয়েছে। জোয়ারের টান লেগেছে গাঙের জলে।

পাখিরালা হয়ে বড় গাঙে খানিক বেড়িয়ে রাঙাবেলিয়া হয়ে সন্ধ্যের জোয়ার ঘরে ফেরার মতলব ছিল। কিন্তু পাখিরালায় এসে কেষ্ট নস্কর বললে, এই জোয়ারেই দাঁড় টেনে মরিচঝাঁপি বাঘনা দেখে সাঁঝ বেলায় কুমিরমারি হয়ে মোল্লাখালি যাবার কথা। পথটা ঘুর হলেও, খানিকটা দেখাশোনা যাবে। তবে নটবর আপত্তি জানালো, বিকেলের দিকে আকাশ সব সময় ভালো থাকে না, তারপর কার্তিকের ঝড় বড় খারাপ, বাঘনার গাঙও সুবিধের নয়, তাছাড়া রায়মঙ্গলের মুখে পড়লে তো দেখবার মানুষও মেলে না।

নটবরের আপত্তি কানে নিলে না ধনপতি। ঝড়-তুফানে ডরায় না সে। বরং ঝড় তুফানের নামে সে আরও ক্ষেপে ওঠে। বলে, 'ঝড়-তুফানে ডিঙি বাইতে মজা আছে—শরীরের রক্তে নাচন লাগে।' আজ কিন্তু সে রকম কথা জোরের সঙ্গে বললে না, তবুও জোয়ারের টানে ডিঙি ভাসিয়ে বললে, বদরের নাম নে চলো খুড়ো, বাঘনার মুখটা এদের দেখিয়ে আনি।

নটবর বলে, এক জোয়ারে যাতি পারবি বাঘনা অব্দি ?

ধনপতি বলে, খুব পারবো, তুমি হালে গে বসো দিকি। যাও—আর শোনো, একটু নজর রেখো, মাছমারাদের ডিঙি যদি ভাখো তাহলি খেয়াল রেখো—দুটো মাছ পেলে ভালো হয়।

বারুণীকে উদ্দেশ্য করে নটবর বলে, দিদি—ডোরায় আজ মা লক্ষ্মীর হাত পড়বে—জুত্ করে রাঁধো দিদি—চাল ডাল আছে ওই একসঙ্গে ফোটাও, আর দেখি যদি মাছটাছ মেলে। নেও, উনুন জেলে দেও দিদি—ওধারের ট্যাকা চরে ডিঙি বেঁধে চান-খাওয়া করবো।

—তোমার ওই এক পেটের চিন্তে। ধনপতি দাঁড় টানতে টানতে বলে, দাঁত নেই, এখনো অতো খাই খাই বাতিক কেন ?

—এই পোড়া পেট নিয়েই তো আছিরে ধনপতি। আর আমার আছে কিরে!

—কেন, তোমার একতারা! ধনপতি বলে, ওটা তো এখনো আছে।

—তা আছে। নটবর বলে, একতারাটা হলো আমার রিদয়, আমার পেরাণ।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। তারপর নিজের খেয়ালে নটবর একসময় সুর ধরে,

ওরে,
আমার নাইরে কিছুই নাই,
আমার জীবন জোড়া
দুখের বেড়া ভাই!
আমি অকূল গাঙে ভেসে বেড়াই,
আপন মনে খেয়াল মাফিক
দুখের ডিঙি বাই,
ওরে, আমার নাইরে কিছুই নাই।

হাল ধরে নটবর গেয়ে চলে আপন মনে। দুঃখের ভাটিয়ালি গাইতে তার দুচোখে জল ঝরে। তারপর একসময় তার গান শেষ হয়, চোখের জলও শুকিয়ে যায়।

বাদার পার দিয়ে ধনপতি ডিঙি নিয়ে চলেছে। জোয়ারের টান আর ধনপতির সবল হাতে দাঁড টানা তারপর পিঠেন বাতাস—তারের বেগে ডিঙি চলেছে ভেসে।

কেষ্ট নস্কর ঘুমিয়ে পড়েছে ছই-এর ভিতর। ছোট ছেলে-মেয়ে দুটোও ঘুমিয়েছে। বড় ছেলে দুটি ধনপতির সামনে পাটাতেনর উপর বসে। তারা অবাক চোখে দেখছে গভীর জঙ্গলের দিকে। আর মাঝে মাঝে ধনপতিকে এ-কথা সে-কথা জিজ্ঞাসা করছে। ডোরার উনুন জেলে খিচুড়ি চাপিয়ে শিল-নোড়ায় বাটনা বাটছে বারুণী। আর মাঝে মাঝে উনুনে জ্বাল ঠেলে দিচ্ছে।

ধনপতি একমনে দাঁড় টেনে চলেছে। এই জোয়ারেই সে ডিঙি নিয়ে পৌছে যাবে বাঘনার বাদার ধারে। তারপর বাঘনার বাদা দেখে সন্ধ্যের ভাঁটায় রায়মঙ্গলের মুখে দিয়ে পুঁইজালির গাঙ বরাবর মোল্লাখালি যাওয়া। জোয়ার লাগার আগে সে পৌছে যাবে মোল্লাখালি। কিন্তু তারপর? মোল্লাখালি থেকে সাতজেলিয়ার হাটখোলা তো পুরো এক জোয়ারের পথ।

অত কথা ভেবে কি করবে ধনপতি? এখনকার ভাবনা এখন। আগে তো বাঘনার গাঙ পৌছক, তারপর অন্য চিন্তা।

বাঘনার গাঙ এখনও অনেক দূর।

ধনপতি ঘাড় গুঁজে একভাবে দাঁড় টেনে চলেছে। সারা দেহ দিয়ে ঝরে পড়ছে ঘাম। সকাল থেকে এই দুপুর পর্যন্ত রোদে বসে ওর মুখ চোখ লাল হয়ে

উঠেছে। কাঁধের ক্ষতস্থানে নতুন চামড়া—দাঁড় টানার দরুণ কাঁধটাও যেন টনটন করছে। যেন একটু যন্ত্রণাও অনুভব করছে সে। তবু সেদিকে মন নেই ধনপতির। মুহূর্তের জন্যেও বিরাম নেই দাঁড় টানার।

জোয়ার থাকতে থাকতে বাঘনার গাঙে পৌঁছলো ধনপতির ডিঙি। বেলা গড়িয়ে গেল নাওয়া-খাওয়ার পাট চুকোতে।

বাঘনার গাঙের পারে বাদাবন দেখার মতো। সুন্দরবনের মধ্যে বাঘনার জঙ্গলের মতো জঙ্গল খুব কম 'চকে'ই আছে।

বারুণী অবাক চোখে বাদাবন দেখলো, দেখলো তার ছেলেমেয়েরা। বড় ছেলেটা বার বার বলে, একবার সে বাদার কিনারের মাটিতে পা দেবে। কিন্তু বাদাবনে পা দেওয়া বললেই কি পা দেওয়া যায়!

এদিকে বেলা পড়ে আসছে। ডিঙি বেঁধে বসে থাকার মতো সময় নেই। বাঘনার জঙ্গলের অফিসের ঘাটে গেরাবি করা ডিঙি খুলে দেয় ধনপতি। একবার পাক খেয়ে ডিঙিটা দক্ষিণমুখো চলতে শুরু করে ভাঁটার টানে।

ওরা এসেছে জোয়ারের টানে, কুমিরমারি হয়ে পুঁইজালির গাঙ-পথ দিয়ে। যাবে মোল্লাখালির ঘাট ছুঁয়ে সাতজেলিয়ায়। একটু ঘুরে যেতে হলেও 'রাত-বিরেতে' এ পথটাই নিরাপদ।

কিন্তু বাঘনা থেকে কুমিরমারি-পুঁইজালি যেতে হলে রায়মঙ্গল আর বাঘনার গাঙের মোহনার মুখ পেরিয়ে যেতে হবে। বেলা থাকতে থাকতে গাঙ-পথটুকু পার হওয়া দরকার। এই ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সন্ধ্যের পর এই দুরন্ত গাঙ দিয়ে যাওয়া ঠিক নয়, যতই দুঃসাহসী হোক তবু ধনপতি এটুকু স্বীকার করে।

এবারেও দাঁড়ে বসেছে ধনপতি। গাঙের কিনারা বারবার চলছিল ডিঙি, কিন্তু কেষ্ট নস্করের কথাতেই মাঝদরিয়ার ওদিকে ডিঙি নিয়ে যায় ধনপতি। যেখান থেকেও বাঘনার জঙ্গল স্পষ্ট দেখা যায়।

গাঙের এ-মুখে এলে রায়মঙ্গলের মুখ স্পষ্ট দেখা যায়। এপার থেকে ওপার ভালো করে দেখা যায় না। এই গাঙ বড় দুরন্ত। বিশেষ করে বাঘনার আর রায়মঙ্গলের মুখের দুরন্তপনার কথা এ-সব দেশের মাঝি-মাল্লাদের কাছে অজানা নয়। এক শীতের সময় ছাড়া এ-গাঙকে বিশ্বাস করা যায় না। বাতাস থাক না থাক—নদীর জল সব সময় উথালিপাথালি করছে।

এত সময় কেউ-ই ফিরে চায়নি আকাশের দিকে। দেখবার দরকারও

ছিল না। সূর্যের আলো হঠাৎ নিবে যেতে ধনপতিই ফিরে তাকায় পশ্চিম আকাশের দিকে।

পশ্চিমের সূর্যকে আড়াল করে কালো মেঘের একটা বড় টুকরো দেখা দিয়েছে। মেঘ দেখেই ধনপতির বুকটা যেন আচমকা কেঁপে ওঠে। হঠাৎ দাঁড়ের মুঠিও শিথিল হয়ে যায়। এ-সব মেঘের 'চরিত্তির' ধনপতির জানা। বড় 'সব্যনাশা' ওই মেঘ। বিশ্বাস নেই।

গাঙ-পারের দিকে তাকায় ধনপতি। বাঘনার জঙ্গলের ঘাট থেকে ডিঙি অনেক দূরে সরে এসেছে। উজান বেয়ে এখন আর ওদিকে যাওয়া সম্ভব নয়। বাদার পার নিকটেই। কিন্তু বাদার পারে ডিঙি নিয়ে যাওয়া মানে যমের দরজায় পা দেওয়া।

---ধনপতি, অ ধনপতি।

নটবরের ডাকে ধনপতি যেন চমকে ওঠে, কী হয়েছে খুড়ো?

নটবর কিছু বলতে যায় কিন্তু ধনপতির চোখ ইশারায় চুপ করে যায়। ধনপতি সহজ স্বরেই বলে, কোণাকুনি পাড়ি দেও খুড়ো—বড় গাঙের ওই মুখে যাবো।

—কোন মুখে?

---কুমিরমারির হেলঞ্চ খালের মুখে গে পড়বো।

—কিন্তু···

—হ্যাঁ। ওদিকটা বাঁকের আড়াল, 'সোঁতে'টা কম লাগবে। নেও---ডিঙি ঘোরাও।

বলে ধনপতি আরও একবার আকাশের দিকে ফিরে তাকায়।

মেঘ ছড়িয়ে পড়ছে পশ্চিম আকাশ জুড়ে। ধূসর রঙের ঘন মেঘ।

ধনপতির দৃষ্টি বারবার মেঘের দিকে যাচ্ছে।

পশ্চিমের মেঘ এগিয়ে আসছে হাজার বাহু বাড়িয়ে। একদল গাঙ-চিল আকাশের অনেক ওপরে উঠেছিল, চক্রাকারে ঘুরছিল এত সময়, হঠাৎ ডানা ভাসিয়ে নামতে শুরু করলো নদী পারে জঙ্গলের দিকে। একদল বালিহাঁস বসেছিল গাঙের বুকে, তারাও ডানা ঝটপট করে উড়ে গেল নীড়ের সন্ধানে।

দূরে, কাছে, কোথাও একটা চলন্ত ডিঙি নেই বড় গাঙের বুকে। শুধু পিছন ফিরে তাকালে বাঘনার জঙ্গলের অফিসের কাছে কটা গেরাবি করা কিস্তি দেখা যায়।

ধনপতি একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলে। তারপর পশ্চিম-আকাশের দিকে ফিরে তাকিয়ে পরক্ষণে সবল হাতে দাঁড় টানতে আরম্ভ করলো।

শান্ত নদী, থমথমে আকাশ, বিন্দুমাত্র বাতাসও নেই। কোথাও নেই কোনো সাড়াশব্দ। নীরব নিস্পদ চারদিক। শুধু দাঁড় টানার শব্দ ছাড়া আর কিছু কানে আসে না।

এদিকে সন্ধ্যে না হতেই সন্ধ্যের মতো আলো-আঁধারি নেমেছে গাঙ-দেশে। গাঙ-পারে গেঁয়ো কেওড়ার গাছের শাখায় অসংখ্য সাদা বক বসে রয়েছে। মনে হয় যেন ওরা আসন্ন দুর্যোগের অপেক্ষা করছে।

ধনপতি ঘাড় গুঁজে দাঁড় টেনে চলেছে। সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে। নিকষ কালো দেহ চিকচিক করছে ঘামে ভিজে। জল কেটে কেটে ডিঙি চলেছে এগিয়ে। কোণাকুনি হেলঞ্চ খালের মুখে পৌঁছতে কমপক্ষে আধ ঘণ্টা সময় লাগবে। কিন্তু এই আধ ঘণ্টা সময় কি আবহাওয়া শান্ত থাকবে!

কেষ্ট নস্কর ঘুমোচ্ছে ছই-এর নিচে। নৌকোর দুলুনিতে ঘুমটা তার পেকে উঠেছে। বারুণীবালা ছোট ছেলেটিকে কোলে নিয়ে ছই-এপিঠ দিয়ে বসে আছে। বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়েছে কোলের ওপরে। বড় ছেলে দুটি বাইরে বসে গাঙের দিকে তাকিয়ে। মেয়েটিও নটবর খুড়োর সামনে বসে।

বারুণীও মেঘ দেখেছে। সে-ও শুনেছে ধনপতি আর নটবরের কথা। তারপর ধনপতির মুখের রেখাও তার নজর এড়ায় নি।

কিন্তু ভয় পায়নি বারুণী। কিসের ভয়? বিশ্বাস তার নিজের ওপর না থাক—ধনপতির ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। ওর ধারণা—ধনপতি থাকতে কোনো ভয় নেই। ঝড় আসুক, তুফান উঠুক—সে ঠিকই ডিঙি নিয়ে পারে পৌঁছবে।

বারুণী ফিরে চায় ধনপতির দিকে। চেয়ে থাকে। কিন্তু যার দিকে চেয়ে থাকা, কোনো দিকে তার নজর দেবার ফুরসুৎ নেই। সে মাঝি—সওয়ারীদের নিরাপদে পারে নিয়ে যাবার দায়িত্ব তার।

—ধনপতি, অ ধনপতি চাপা আর্তনাদের সুর নটবরের কণ্ঠে, ধনপতি—সামনে যে ঘোল!

—ঘোল! ধনপতি একবার আকাশের দিকে, একবার অদূরে ঘোলের দিকে তাকিয়ে কতকটা চিৎকার করে বলে ওঠে, ডাইনে ডিঙি ঘোরাও খুড়ো।

ডাইনে ঘোরাতেই স্রোতের মুখে পড়ে ডিঙি টাল-মাটাল করে ওঠে। বারুণী

হুমড়ি খেয়ে পড়ে, কেষ্ট নস্করেরও ঘুম ভেঙে যায়, আর পাটাতনে বসা ছেলে-মেয়েরা পড়তে পড়তে সামলে নেয়।

স্রোতের টানও এদিকটা খুব বেশি। নটবর ডিঙি রুখতে পারে না। 'ঘোলে' পড়ার হাত থেকে বেঁচে গেলেও ডিঙি তো স্রোতের মুখে ছেড়ে দিলে চলবে না। ধনপতি বলে ওঠে, তুমি দাঁড়ে এসো খুড়ো—আমি না হয় হাল ধরি।

নটবর ভয় পেয়ে বলে, তা তো হলো—আকাশ গ্যাখ ধনপতি।

এতসময় বাদে কেষ্ট নস্করের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। আকাশে মেঘের দিকে তাকিয়ে বলে, শালা আশ—এখন করবা কি ?

—ভয় কি বোনাই। ধনপতি মাঝির হাতে হাল থাকতি তার ডিঙি কেউ ডোবাতি পারবে না। তোমরা যে-যার স্থির হয়ে বোসো।

কেষ্ট নস্কর তবু ভয়ে ভয়ে আকাশের দিকে তাকায়।

কিন্তু ধনপতির কথায় বারুণীর বুক গর্বে ভরে ওঠে। সে নতুন করে ফিরে চায় ধনপতির মুখের দিকে।

এবারে হাল ধরেছে ধনপতি।

শক্ত হাতে হাল ধরে ধনপতি মুহূর্তের মধ্যে ডিঙির মুখ ফিরিয়ে নেয়। নটবর দাঁড়ে বসে মরিয়া হয়ে দাঁড় টেনে চলেছে। কিন্তু হেলঞ্চের খাল এখনও অনেক দূর।

হঠাৎ চাপা সোঁ-সোঁ শব্দে ধনপতি সচকিত হয়ে ওঠে। এ শব্দ ধনপতির জানা। এখনি ঝড় উঠবে।

পশ্চিমের মেঘ ধেয়ে আসছে। সেই সঙ্গে অস্পষ্ট গোঙানির মতো শব্দ।

ক্রমশ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো সেই শব্দ।

অন্ধকার নেমে এলো গাঙের এপারে-ওপারে। কিন্তু গাঙের বুকে কোনসময়ই অন্ধকারকে তেমন ঘন দেখায় না।

ধনপতির সারাদেহটা ক্রমে যেন শক্ত হয়ে উঠলো। পেশীবহুল মজবুত দেহটার মধ্যে যে মন, সেই মনটাকেও চাঙ্গা করে তুললো। তারপর আচমকা সে একবার হো হো করে হেসে উঠলো। অনেকদিন পর আজ তার রক্তে আবার নাচন শুরু হয়েছে। কতদিন পর আজ আবার সে ঝড়ের মুখোমুখি দাঁড়াবে।

—বোনাই, দেখো কেউ যেন নড়াচড়া না করে—সামলে রেখো বাচ্চাদের।

ধনপতির কথা শেষ হতে না হতে ঝড় এলো। তুলে উঠলো ডিঙি, দুরন্ত গাঙ পলকের মধ্যে উন্মাদ হয়ে পড়লো।

ঝড়ের প্রথম ধাক্কায় যে ঢেউ উঠলো, বিচিত্র কুশলতার সঙ্গে সেই ঢেউ কাটিয়ে ধনপতি আরও একদফা আকাশ ফাটা হাসি হাসলো। তারপর চিৎকার করে বলে উঠলো, খুড়ো—হুঁশিয়ার, বোনাই আশ ছেলেমেয়েদের সামলে রেখো -আর শোনো—

কথা শেষ করতে পারে না ধনপতি, ঢেউ-এর ধাক্কায় ডিঙি একদিকে কাত হয়ে যায়।

ভয় পাবার মানুষ নয় ধনপতি, অনায়াসে ডিঙি সামলে নেয়। কিন্তু ভাঙা ঢেউ-এর জল ঝলকে ঝলকে উঠে এলো ডিঙির ভিতরে।

—বোনাই, পারো তো সানকি দে জলটা খানিক ছেঁচে দেও, দেখো সাবধানে নড়া-চড়া করবা।

গোঁ-গোঁ-সোঁ-সোঁ আওয়াজ তুলে তীব্র ঝড বয়ে যাচ্ছে। উথালিপাথালি করছে বাঘনার গাঙ।

ঢেউ নয়---যেন হাজার দৈত্য একসঙ্গে দাপাদাপি করছে। কোনদিকে ফিরে চাইবার অবকাশ নেই ধনপতির, শুধু শক্ত মুঠোয় হাল ধরে ডিঙি ভাসিয়ে রাখা। ঢেউ-এর ধাক্কা সরাসরি এসে না লাগে ডিঙির গায়ে, তাই ঢেউ-এর সঙ্গে বোঝাপড়া করে ঢেউ কাটিয়ে যাওয়া। কোন্ দিকে যাচ্ছে ডিঙি, তার ঠিক নেই।

এ ঝড় বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। হোক ক্ষণস্থায়ী, তবু সেইটুকু সময় যে কী ভয়ানক, তা ধনপতির অজানা নয়।

ধনপতির সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে ভাঙা ঢেউ-এর জলের ছিটেয়। ঝড়ের সঙ্গে যুঝতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, তবু হার মানার মানুষ নয় সে, জীবন থাকতে সে ডিঙি ডুবতে দেবে না।

বারুণীর কোলের ছেলেটা উঠে পড়েছে, বড় ও মেজ ছেলে ডিঙির ছই-এর বাতা ধরে বসে। মেয়েটি ডুকরে কাঁদতে আরম্ভ করছে। নটবরও ভয় পেয়েছে, ডিঙির মাথায় সে জড়োসড়ো হয়ে বসে মনে মনে বদরের নাম জপ করছে।

ঝড়ের দাপট কমে এলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। বৃষ্টি এলো মুষলধারে। নদীর কূল-কিনারা হারিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। খানিক বাদেই বিদ্যুৎ-এর চমকানি আর মেঘের গর্জন শুরু হলো। বিদ্যুতের আলোয় ধনপতি দেখতে পায় পারের মাটি এখনও অনেক দূরে।

ঝড় কিছুটা কমে এলো, কিন্তু এখনো ঢেউ-এর দাপট কমেনি। এখনো থেকে থেকে ফুঁসিয়ে উঠছে নোনাগাঙের জল।

একে সন্ধ্যার আঁধার, তারপর মুষলধারায় বৃষ্টি, আর ঝড তো আছেই—কিন্তু ধনপতির মনে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা নেই। রক্তে তার যতই নাচন শুরু হোক, কিন্তু মনের ভিতরটা তার আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে যায় বিপদের মুখে পড়লে। বিন্দুমাত্র ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। ও জানে, বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে ধৈর্য হারানো মানে বিপদের আসার পথ সহজ করে দেওয়া।

শক্ত মুঠোয় হাল ধরে ধনপতি হাজার ঢেউ-এর বাধা পেরিয়ে চলে পারের মাটির দিকে।

কিন্তু মাটি এখনো অনেক দূরে।

অবশেষে ডিঙি তীরে এসে ভিড়লো।

অন্ধকারে ঠিকমতো নজর করতে পারেনি ধনপতি। পাড়ে ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ ডিঙিটা একদিকে কাত হয়ে গেল। কোনমতে সামলে নিলে ধনপতি। হাল ছেড়ে লাগ মেরে ডিঙি ধরে রাখলো।

তখনো সমানে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পারের মাটিতে। ঢেউ-এর আঘাতে পারের মাটি ভেঙে পড়ছে ঝপঝপ করে।

নোনা গাঙের পাড়ের মাটির তেমন জোর থাকে না। সহ্য করতে পারে না ঢেউ-এর আঘাত।

একদিকে ঝড়ের বেগ কমে এলেও বৃষ্টি হচ্ছে মুষলধারায়।

—খুড়ো। ধনপতি চিৎকার করে বলে, পারে নেমে ডিঙির মাথাটা ধরে।—আর বোনাই আশ এদের সব এক এক করে হাত ধরে নামিয়ে দেও।

ধনপতি ডাকলো, কিন্তু খুড়োর কোন সাড়া-শব্দ নেই।

—তোমার খুড়োরে যে দেখি নে শালা আশ, কেষ্ট নস্কর বলে ওঠে, জলজ্যান্ত মানুষটা গেল কোথায়!

—বলো কী!

হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলক খেলে যায়, আওয়াজ ওঠে মেঘ ডাকার। বিদ্যুতের আলোয় ধনপতি লক্ষ্য করে ডিঙির দাঁড়-মাথায় নটবর খুড়ো নেই।

কোথায় গেল মানুষটা!

ধনপতির বুকের ভিতর হঠাৎ বিপদের গন্ধ পেয়ে তোলপাড় করে ওঠে।

ডিঙি পারে লাগতে পাড়ের মাটি ভেঙে পড়ার আওয়াজ পেয়েছিল সে, আসল আওয়াজটা মাটির চাপড়া ভেঙে পড়ার নয়, ডিঙি পাড়ে ধাক্কা খেতেই বেসামাল হয়ে নটবর পড়ে গেছে জলে। ঢেউ-এর মুখে পড়ে তলিয়ে গেছে নিমেষের মধ্যে।

—খুড়ো—খুড়ো—চিৎকার করে ডাকে ধনপতি।

জল-ঝড়ের মধ্যে ধনপতির আর্ত-চিৎকার হারিয়ে যায়। যার নাম ধরে ডাকছে ডাক শোনার সে মানুষ নেই। সে-মানুষ হারিয়ে গেছে ঝড়ের নেশায় মাতাল নোনা গাঙের অতলে। হয়তো—সে-মানুষের দেহটা নিয়ে এত সময় কামট, হাঙর, কুমির উৎসব শুরু করে দিয়েছে।

ধনপতি পাগলের মতো চিৎকার করে ডাকে, খুড়ো—খুড়ো—

পরক্ষণে আকাশ-ফাটা হাসি হেসে ওঠে ধনপতি।

এত সময় বারুণী অনড় পাথরের মতো ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বসেছিল, সে-ও হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, তোমার ধনপতি ঝড়-তুফানে গাঙ পেরিয়ে এলো, তা তুমি দেখলে না ঘরামি কাকা!

—কেঁদো না বারুণী, মাঝির জীবন এই, ধনপতি হঠাৎ যেন শান্ত হয়ে গেছে। বলে, আজ খুড়ো গেছে, কাল হয়তো আমিও যাবো।

বারুণীর কান্নার স্বরটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একবার মনে হলো ধনপতির, সে ঝাঁপ দেয় গাঙের জলে। কিন্তু পরক্ষণে ভাবলো, ঝাঁপ যদি দিতে হয় সাগরে—এখানে নয়।

এই ভয়ংকর মুহূর্তেও ধনপতির চোখে অদেখা সাগরের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

॥ সতের ॥

সাগরে যাবে ধনপতি।

সাতজেলিয়ার হাটখোলার ঘাট থেকে শেষ রাতের অন্ধকারে ডিঙি ভাসালো সে। কাক-পক্ষীও জানে না, সে কখন উঠেছে ঘুম থেকে, কখন দরজা খুলে বাইরে এসেছে।

বারুণীর বাড়ি থেকে হাটখোলার ঘাট। এ-পথটুকু ঝড়ের মতো ছুটে এসেছে ধনপতি। ঘাটে এসে কোনদিকে ফিরে চায়নি, এসেই ডিঙির কাছি খুলে

দিয়েছে। ভাঁটার টানে পাক খেয়ে ডিঙিটা আপনা থেকেই কিছু দূর ভেসে গেছে। তারপর হাল ধরেছে ধনপতি।

এই মুহূর্তে ধনপতির মনে কোনো চিন্তা নেই। তেমন কোনো মানুষের কথাও মনে পড়ছে না। এমন কি নিজের কথা ভাববার মতো মনের অবস্থা তার নয়। অবসাদে পঙ্গু হয়ে গেছে মন।

সাগরে যাবে ধনপতি।

সাগরে যাবো—এই কথাটা ভাবতে যে মানুষের মনে আনন্দে বান ডাকতো, সে মানুষ সাগরের পথে ডিঙি ভাসিয়ে সাগরের চিন্তা ভুলেছে। বিন্দুমাত্র উন্মাদনা, বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য ওর মনের মধ্যে নেই। আপন মনে সে ভাঁটার টানে ডিঙি ভাসিয়ে চলেছে।

হঠাৎ ডিঙিটা ধাক্কা খায় আর এক ডিঙির সঙ্গে। 'বেনজাল' পেতে কটা ডিঙি রয়েছে গাঙের বুকে। ধাক্কা লাগতেই জেলে ডিঙির মাঝি খিঁচিয়ে ওঠে, আহা করো কি, কাণা মাঝি নাকি—ঠাওর পাও না ?

ধনপতি সচকিত হয়ে শক্ত মুঠোয় হাল ধরে। বলে, খেয়াল ছিল না ভাই।

—খেয়াল ছিল না ! জেলে ডিঙির মাঝি বলে, নেশা ভাঙ করেছো নাকি ?

ধনপতি আর কথা বাড়ায় না। তাড়াতাড়ি ডিঙির মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। তারপর মেরুদণ্ড সোজা করে হাল ধরে বসে ডিঙির মাথায়।

ছোট ছোট ঢেউ ভেঙে ভাঁটার টানে ধনপতির ডিঙি ভেসে চলেছে দক্ষিণে। দূরে দেখা যায় পাখিরালার বাদাবনের রেখা। ওই বাদাবন ফেলে রেখে ধনপতি যাবে গোসাবার গাঙ পার হয়ে রায়মঙ্গল, তারপর হরিণভাঙা, সপ্তমুখী পেরিয়ে—সাগরে।

পূব আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। সূর্য উঠবে এবার।

সূর্য উঠছে গোসাবার গাঙের ওপার থেকে। চঞ্চল হয়ে ওঠে ধনপতি। হাল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। সূর্যের প্রথম আলো গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে থাকে। সূর্যের প্রথম আলোয় স্নান করলো সে।

আর অবসাদ নেই, জড়তা নেই—ধনপতি ফিরে পেয়েছে তার প্রাণ-চাঞ্চল্য। সাগরে যাবে সে—এ কথাটা ভাবতেই তার মনটা আবার আনন্দে নেচে উঠেছে।

ভাঁটার টানে ডিঙি ভেসে চলেছে। হাল ধরে চুপ-চাপ বসে আছে ধনপতি।

একটু আগে সূর্য ওঠার মুহূর্তে ওর মনটা ময়ূরের মতো পেখম তুলে নেচে উঠেছিল, মনটা কানায়-কানায় ভরে গিয়েছিল আনন্দের জোয়ারে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আনন্দ কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

কতদিন পর আবার পুরনো দিনের কতকগুলো হারিয়ে যাওয়া কথা মনে পড়লো ধনপতির। যে-সব কথা কোনদিন কোনো কারণে ভাবতে চায় না, সে-সব কথাগুলো এক এক করে কানের কাছে বাজতে লাগলো। শুধু কথা নয়, অনেক ছবিও চোখের পর্দায় ভেসে উঠলো।

সব কিছুর মতো জীবনেরও একটা হিসেব-নিকেশ আছে। কিন্তু সে হিসেবটা কেমন? টাকা-আনা-পাই-এর মতো যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগে কি জীবনের হিসেবটা অঙ্ক কষে পাওয়া যায়! ধনপতি অতশত বোঝে না, যোগ-বিয়োগ গুণ ভাগ দূরে থাক, কোনদিন সে জীবন নিয়ে মাথা ঘামায়নি। আজ সাগরের পথে ডিঙি ভাসিয়ে নিজের মধ্যে জীবনটারে খুঁজে বার করতে ধনপতি মনে মনে দিশেহারা হয়ে পড়লো।

একটা জিজ্ঞাসা তার মনে। জীবনটা কী? সেই সঙ্গে কৌতূহল, জীবনের রূপটা কেমন? বর্ষার ভরা গাঙের মতো, না তার চেয়েও বিশাল!

—ধনপতি, অ ধনপতি!

ডাক শুনে ফিরে তাকায় ধনপতি। কুমিরমারির গগন মণ্ডল গেরাবি-করা হাটুরে নৌকোর গলুই-এর কাছে বসে আছে।

—যাও কোথায়? গগন শুধোয়।

—সাগরে। উত্তরটা এক কথাতেই দিলে ধনপতি।

—সাগরে! গগন যেন চমকে উঠলো। বললে, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে!

—যা বলো। ধনপতি মৃদু হাসলো।

—ঘরামি গেল কোথায়?

—নেই। বাঘনার গাঙে তলিয়ে গেছে। কথাটা বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলো ধনপতি।

—সে কি! গগন মণ্ডল বিস্ময় প্রকাশ করলো।

এবারে আর কোনো কথা বললে না ধনপতি। ডিঙি ততক্ষণে বেশ খানিকদূর এগিয়ে গেছে।

নটবরের কথা নতুন করে মনে এলো ধনপতির। হু হু করে উঠলো

ধনপতির বুকের ভিতরটা। কতকটা আত্মগতভাবে বলে ওঠে একসময়, 'খুড়ো—তুমি গেলে বাঘনার গাঙে, আমি যাবো সাগরে।' কথাটা বলেই চমকে উঠলো সে। সেই সঙ্গে আরো মনে পড়লো, নটবর খুড়ো বলেছিল, সে-ও সাগরে যাবে।

আবার শক্ত মুঠোয় হাল ধরলো ধনপতি। ডিঙির মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে গেল মাঝদরিয়ায়। দূরে বড় গাঙের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে সাগরের কল্পিত ছবি আঁকার চেষ্টা করলো।

বড় গাঙে পৌঁছে ধনপতি সামনের দিকে নজর করলো। সোজা চলে গেছে বড় গাঙ। এই গাঙ গিয়ে মিশেছে রায়মঙ্গলে। রায়মঙ্গল দিয়ে খানিকদূর এগিয়ে, তারপর হরিণডাঙা বরাবর সপ্তমুখীয় দামাল গাঙ হয়ে সাগরে।

সাগর এখনও অনেক দূর। অন্তত তিন দিন, তিন রাত কাবার হয়ে যাবে সাগরে পৌঁছতে।

কয়েকবছর আগে একবার মাছ-মারাদের সঙ্গে সপ্তমুখী গাঙে এসেছিল ধনপতি। সেই দুরন্ত-দামাল গাঙের মোহনার কাছ থেকে অথৈ জলের সাগরের মুখ দেখেছিল সে। কিন্তু সে-দেখা না-দেখার নামান্তর। অস্পষ্ট ধোঁয়ার মতো সাগরের ভাসা-ভাসা রূপ দেখেছিল। সেই তার সাগর দেখা, নয়তো সাগরের সত্যি রূপটা তার কাছে এখনও অদেখা রয়ে গেছে।

মনে মনে সাগরের ছবি আঁকলো ধনপতি। কূল নেই, কিনারা নেই—অথৈ জলের সাগর। তাল গাছের সমান উঁচু ঢেউ ময়ালের মতো ফুঁসিয়ে ওঠে, গর্জে ওঠে।

আচমকা টাল খেয়ে ঘুরে গেল ডিঙি। চকিতে ধনপতি সামলে নেয় নিজেকে। ঘোলের মুখে পড়েছে সে। তবে এ ঘোল তেমন কিছু নয়। শক্ত মুঠোয় হাল ধরে জলের ঘূর্ণি পার হয়ে এলো। মনে মনে আঁকা সাগরের কল্পিত ছবিটা হারিয়ে গেল মন থেকে।

বড় গাঙের মাঝ বরাবর ভাঁটার টানে ভেসে চলেছে ধনপতির ডিঙি। এই ভাঁটাতেই সে পৌঁছবে দক্ষিণবাদায় দপ্তর অফিসের ঘাটে। সেখান থেকে জলের কোলা ভরে নেবে। সেই সঙ্গে কিছুটা ডাল চাল আর টুকিটাকি জিনিস।

দপ্তর আফিসের ঘাটে পৌঁছে একটা সুন্দর বজরা দেখতে পেল ধনপতি।

গোসাবার 'কিরিস্তান' পাদ্রীদের বজরা নিশ্চয়ই। নয়তো এমন বাহারে বজরা আর কাদের হবে।

বজরার পাশেই ডিঙি বাঁধলো ধনপতি।

মিহি সুরের কথা কানে এলো। ফিরে তাকাতেই দেখতে পেল ধনপতি বজরার জানালার আধ-খোলা পর্দার আড়ালে বসে সেঁজুতি। কার সঙ্গে যেন কথা বলছে।

ডাকতে গিয়েও সেঁজুতির নাম ধরে ডাকতে পারলো না ধনপতি। মনটা যেন অকস্মাৎ সেঁজুতির উপর বিরূপ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু পরক্ষণে মনে হলো পরকে ছোট করে দেখার মানে নিজেকে ছোট করা। তাছাড়া সেঁজুতির জীবনের কতটুকু জানে সে, কতটুকু দেখেছে তাকে।

না—সাগরে যাবার মুখে কারও ওপর বিরূপ ধারণা নিয়ে যাবে না সে। সাগরে যাবার আগে খোলা মনে এই জগৎ-সংসারটাকে দেখে যাবে।

বজরার পাশেই গেরাবি-করা ধনপতির ডিঙি। ধনপতি আরো একবার মনে করলো সেঁজুতিকে ডাকে। কিন্তু ডাকতে পারলো না।

বজরার জানালার দিকে মুখ ফেরাতে সেঁজুতিও দেখতে পায় ধনপতিকে। সে-ই ডাকে, ধনপতিদা—

ফিরে তাকায় ধনপতি। হঠাৎ দেখায় সেঁজুতির মুখখানাকে বড় করুণ মনে হলো তার।

—যাবা কোথায়? ধনপতি জিজ্ঞাসা করে।

—ক্যানিং-এ। তোমাদের জামাইকে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে। এসো—দেখে যাও। তুমি খবর না দিলে আমি তো জানতেই পারতাম না ওর অসুখের কথা। কথা বলতে সেঁজুতির গলার সুর কাঁপে, চোখও ছলছল করে ওঠে।

ডিঙি থেকে বজরায় এলো ধনপতি। ভিতরে ঢুকেই সে থতমত খেয়ে গেল। পাটাতনের ওপর নরম বিছানায় সেঁজুতির রুগ্ন স্বামী রামচন্দ্র ঘুমিয়ে আছে। একান্তে আলখাল্লা পরা জোসেফ মদন দাস। বিছানার পাশে সেঁজুতির দেওর লক্ষ্মণ।

রামচন্দ্র ঘুমিয়ে আছে। কঙ্কালসার চেহারা, তারপর সর্বাঙ্গে দগদগ করছে ঘা।

—এসো। সেঁজুতি ডাকে।

বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায় ধনপতি। সব কিছু লক্ষ্য করে। কিন্তু একটি কথাও উচ্চারণ করে না। শুধু সেঁজুতির সুন্দর-করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শেষটা।

—তোমাদের জামাইকে নিয়ে যাচ্ছি ক্যানিং-এ। সেঁজুতি বলে, দেখি, ঈশ্বরের কি ইচ্ছে। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হলো। বাবার সঙ্গে দেখা হলে খবরটা জানিয়ে দিও।

—আর কারো সঙ্গে দেখা হয়তো হবে না।—বলে ধনপতি গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

—কেন ?

—আমি সাগরে যাচ্ছি। জানিনে ফিরতে পারবো কিনা।

—সাগরে যাবে! কেন ?

কথার উত্তর না দিয়ে ধনপতি মৃদু শব্দ করে হাসে।

সেঁজুতি একটু চুপ করে থেকে অনুচ্চকণ্ঠে বলে, ধনপতিদা—তুমি কেন সাগরে যেতে চাও, আমি বুঝতে পারি। কিন্তু আমি কেন ঘর ছেড়েছি, ক্রীশ্চান হয়েছি তা তুমি এখনও বোঝোনি। যাক সে-সব কথা—তুমি তোমার বোনের জন্যে তোমার ঠাকুরের কাছে জানিও, তিনি যেন আমার স্বামীকে ভালো করে দেন।

ধনপতি কিছু সময় নীরবে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। সেঁজুতির কথাগুলো মনে মনে রোমন্থন করে। তারপর এক সময় ডাকতে যায় সেঁজুতিকে। কিন্তু ডাকে না। সে যে ঠাকুর দেবতা মানে না, সে কথাও বলতে পারে না।

সেঁজুতির দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে। ধনপতিকে সে প্রথম দিনেই চিনেছিল। সে বুঝতে পেরেছে, কেন সাগরে যাবে ধনপতি। তারপর একথাও জানে, হয়তো এ মানুষ আর সাগর থেকে ফিরে আসবে না। এই মুহূর্তে সেঁজুতির যেটুকু দুঃখ তা ধনপতির জন্যে। বলে, যদি সাগর থেকে ফিরে এসো কোনদিন, তাহলে আমার ওখানে যেও।

এবারেও কথা না বলে ধনপতি ফিরে চায় সেঁজুতির মুখের দিকে।

রামচন্দ্রের ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুম-ভাঙা চোখে এর-ওর মুখের দিকে ফিরে চায়। ধনপতিকে দেখেও চিনতে পারে না। ধনপতিও নিজেকে ধরা দিতে চায় না।

রামচন্দ্র ক্ষীণকণ্ঠে বলে, তোমরা আমারে ধরে বসিয়ে দ্যাও। আর শুয়ে থাকতে পারিনে।

—তোমাকে এখনও অনেকদিন শুয়ে থাকতে হবে। সেঁজুতি বলে, চুপ-চাপ শুয়ে থাকো।

রামচন্দ্র তার শীর্ণ একখানি হাত তুলে দেয় সেঁজুতির কোলে। সেঁজুতির মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলে, কিরিস্তান হলে বুঝি সিঁতুর পরতে নেই ?

সেঁজুতির মুখে কথা নেই। তার তু'চোখে জল টলমল করছে।

ধনপতির মনের মধ্যে উথালিপাথালি ঢেউ। সেঁজুতির মুখের দিকে ফিরে চাইতে পারছে না সে! দাঁড়িয়ে আছে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে।

ডাঙা থেকে পানীয় জলের কলসি নিয়ে এলো বজরার মাঝি। এই জোয়ারেই ভেসে যাবে বজরা। আর ভাঁটার অপেক্ষায় সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ধনপতিকে।

বজরা ছাড়ার সময় হলো। ধনপতি চলে এলো ডিঙিতে। সেঁজুতি বজরার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ধনপতিকে আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিলে, সাগর থেকে ফেরার পথে সে যেন একবার বাসন্তীর ঘাটে ডিঙি বাঁধে।

কথাগুলো শুধু কানেই শুনলো ধনপতি, নয়তো কথা বলা দূরে থাক, একবার মুখ তুলেও তাকালো না। তু'হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইলো চুপচাপ। তারপর যখন ফিরে তাকালো, তখন বজরার চিহ্ন খুঁজে পেলো না গাঙের বুকে কোথাও।

সন্ধ্যায়।

জোয়ারের কাল শেষ হলে অথৈ জলের গাঙে ভাঁটার টান শুরু হতে ডিঙির গেরাবি তুললো ধনপতি।

বড় গাঙের মাঝদরিয়া বরাবর ভেসে চলেছে ধনপতির ডিঙি। গাঙের এপারে বাদা, ওপারে আবাদ।

নামে মাত্র হাল ধরে বসে আছে ধনপতি। মাঝে মাঝে ফিরে দেখছে বাদা-বনের দিকে। অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট দেখা না গেলেও বাদাবন যেন আর এক রূপে দেখা দেয়। দিনের আলোয় দেখা, আর রাতের অন্ধকারে দেখা—তুয়ের মধ্যে অনেক তফাত। দিনের আলোয় প্রতিটি গাছপালাকে আলাদা করে পাওয়া যায়। কোন্‌টা হিজল, কোন্‌টা গরান, কোন্‌টা গর্জন, কোন্‌টা কাকড়া—চোখের দেখায় আলাদা চেহারা খুঁজে নেয়া যায়। কিন্তু সূর্য

ডুবে গেলে, নানা রূপ থেকে এক রূপে বাঁধা পড়ে এই বাদাবনের যত গাছপালা।

বাদাবনের আসল রূপ যদি দেখতে হয়, তবে তা রাতে। অন্ধকার রাত আর জ্যোৎস্না রাত—দুয়ের মধ্যে আবার অনেক তফাত।

চলন্ত ডিঙিতে হাল ধরে বসে ধনপতি। দৃষ্টি তার বাদাবনের দিকে। অন্ধকারে থমথম করছে বাদাবন। কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই। শুধু হালে জল কাটার শব্দ।

থেকে থেকে ধনপতির মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে পড়ে। কোনো কিছু চিন্তা করতে পারে না ঠিকমতো। শক্ত মুঠিও শিথিল হয়ে পড়ে। ভুলে যায়, অন্ধকারে সে দুরন্ত গাঙে ডিঙি নিয়ে চলেছে। ভুলে যায়, এই নোনা গাঙের এখানে ওখানে রয়েছে ভয়ংকর 'ঘোল'। সে ঘোলে মরণের ফাঁদ পাতা।

এক সময় ঘরামি খুড়োর কথা মনে এলো ধনপতির। ঘরামি খুড়ো বেঁচে থাকলে সাগরে যাওয়া হয়ে উঠতো না তার। আগেও তো কতবার ভেবেছে সাগরে যাবে, কিন্তু পারেনি সেই মানুষটার জন্যে। যদিও খুড়ি মারা যাবার পর, একবার সাগরে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল নটবর খুড়ো।

ঘরামি খুড়োর কথা মনে পড়তেই ধনপতির বুকের ভিতরটা হু হু করে ওঠে। মানুষটা যদি রোগে ভুগে চোখের সামনে মরতো, তা হলে দুঃখটা বোধ হয় এমন করে প্রাণে বাজতো না। মানুষটা বেঘোরে চোখের আড়ালে হারিয়ে গেল। কখন গেল, কেমন করে গেল—কিছুই টের পেল না। রায়মঙ্গলের জলে পড়ে হাঙর কামটের মুখে চলে গেল মানুষটা। কিন্তু যদি তার কোনো নিশানা পেত ধনপতি কিছুতেই তাকে অমন করে মরতে দিত না।

ঘরামি খুড়োর চিন্তা ধনপতির মনটাকে বিবশ করে দেয়। সে মানুষটা আজ নেই, কিন্তু ধনপতি এটুকু জানে, এই পৃথিবীতে সে কেবল সেই গান-পাগলা মানুষটাকেই ভালোবেসেছিল। আর সে-ও পেয়েছিল তার ভালোবাসা।

এ-গাঙ মিশেছে আর এক গাঙে। দুই গাঙের মুখে এসে ধনপতি এদিক-ওদিক তাকালো। অথৈ জলের গাঙ। এপার-ওপার দেখা যায় না। রাত-বিরেতে এই গাঙ-দেশে বড্ড দিক ভুল হয়।

একে অন্ধকার রাত, তার ওপর ধোঁয়াটে কুয়াশা নেমেছে। তিথি হিসেব করে দেখলো ধনপতি, আজ চাঁদ উঠবে 'দেড় পহর' বাদে। চাঁদ যত সময় না

উঠছে, হিসেব করে দেখলো সে, প্রায় তত সময় ভাঁটা থাকবে। এই ভাঁটায় যদি কালিচকের ঘাট পর্যন্ত যেতে পারে, তাহলে অনেকটা পথ এগিয়ে থাকা হয়। তারপর শেষ রাতের ভাঁটায় ডিঙি ছেড়ে আরও দক্ষিণে এগিয়ে যাওয়া।

এক নাগাড়ে গাঙের মাঝদরিয়া দিয়ে ডিঙি বেয়ে বেশ কিছু দক্ষিণে চলে এসে, ধনপতি দূরে কয়েকটা আলো দেখতে পেল। নিশ্চয়ই কোনো মাছ-মারার দল খাড়ির মুখে 'বেনজাল' পেতে মাছ মারছে।

দূরে আলোর নিশানা লক্ষ্য করে ধনপতি ডিঙি বেয়ে চলে।

যা ভেবেছিল, তাই। খাড়ির মুখে মাছমারাদের কতকগুলি ডিঙি বাঁধা রয়েছে।

বসিরহাট অঞ্চলের ধলচিতের রাজবংশীরা এসেছে মাছ মারতে। দলের সাঁইদার বিপিন পাড়ুই ধনপতির পরিচিত মানুষ। গাঙ-দেশেই আলাপ-পরিচয় তাদের।

এই রাতে ধনপতি একা ডিঙি বেয়ে এসেছে শুনে বিপিন বিস্মিত হয়। বলে, তোমার বুকের পাটারে বলিহারি দেই। এই রেতে ভাঁটায় এলে কি করে! ভয় করেনি?

—ভয়, কিসের ভয়! ধনপতি বলে, ভয়ের কথা তো বলো পাড়ুই আশ, কিন্তু ভয়টা কী বলতি পারো। ওটা মনের ব্যাপার। ভয় আছে বললে আছে, নেই বললে নেই। ভয় আর ভগবান এ দুটো কথার আমি মানে বুঝিনে। যাকগে ওসব কথা। তারপর বলো এবারে মাছ হচ্ছে কেমন?

—কোথায় মাছ! মহাজনের দাদনের টাকা উসুল দিতেই পারা যাবে না। তেমন মাছ পেলাম কোথায় এ মরশুমে? আর এখন তো 'মড়ানে'। বলে বিপিন জিজ্ঞাসা করে, তুমি যাবা কোথায়?

—সাগরে।

সাগরে যাবার কথায় বিপিন যেন চমকে ওঠে। বলে, একা ডিঙি নে সাগরে যাবা! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

বিপিনের গেরাবি-করা ডিঙির গায়ে ডিঙি রেখে কথা বলছে ধনপতি। কথা বলতে বলতে বেশ খানিক সময় গেল। এদিকে ভাঁটাও শেষ হয়েছে। জোয়ার লেগেছে গাঙের জলে। অগত্যা তখনকার মতো ধনপতিও ডিঙি গেরাবি করে রাখলো।

শেষ রাতে ভাঁটা না-লাগা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করতে হবে।

শেষ রাতের ভাঁটায় ডিঙি ছেড়ে ধনপতি দুপুরে জোয়ার লাগতে একটা খাড়ির মুখে ডিঙি রাখলো। এখানে গাঙের এপারে বাদা, ওপারে বাদা।

খাড়ির মুখে ডিঙি বেঁধে দুপুরে রান্না-খাওয়া সেরে রোদে পিঠ দিয়ে শুয়ে ছিল ধনপতি। ঘুমোবে না মনে করেও ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘুম ভাঙলো যখন, তখন গাঙে আবার ভাঁটার টান শুরু হয়েছে। যেমন ওঠা, তেমন ডিঙি ছাড়া। খাড়ির মুখ থেকে একেবারে গাঙের মাঝদরিয়ায়। তারপর মনের আনন্দে ডিঙি ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া।

চলতি ডিঙি থেকেই সূর্যাস্ত দেখলো ধনপতি। তারপর কখন যেন আপন মনে নটবরের গাওয়া একটা গানের কলি বেসুরো গলায় গাইতে আরম্ভ করে দিলে।

মনের জ্বালা বিষম জ্বালা, এ জ্বালায় জ্বলিস নেরে ভাই,
তবু জ্বালায় জ্বলতে হবে, জীবনের অন্য গতি নাই।

সন্ধ্যা নেমেছে গাঙদেশে।

এপার ওপারে বাদার চেহারাটাই বদলে গেছে সন্ধ্যার অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে। মনে হয় এ বাদায় সবুজ গাছ নেই, শুধু ঘন কালো ছায়া জমাট বেঁধে রয়েছে।

অথৈ জলের গাঙের ওপর দিয়ে ধনপতির ডিঙি চলেছে। এ গাঙ থেকে আরও কত গাঙ, কত খাল, খাড়ি বেরিয়ে মাকড়সার জালের মত ছড়িয়ে পড়েছে জঙ্গলের রাজ্যে।

এ গাঙের বুকে একটাও চলতি ডিঙি দেখতে পাচ্ছে না ধনপতি। শুধু এক একটা খাড়ির মুখে মাছ-মারা জেলে-মালোদের গেরাবি-করা ডিঙির আলো দেখতে পাচ্ছে। নয়তো কোথাও কোন ডিঙি নেই, কিস্তি নেই। শূন্য গাঙ অজানা দেশের ঠিকানায় হারিয়ে গেছে।

অন্ধকার যত, তা যেন শুধু গাঙের এপারে ওপারে—বাদাবনে। গাঙের বুকে কোন সময় অন্ধকার তত গাঢ় হয়ে নামে না। কিন্তু ধনপতি জানে, অন্ধকার না থাক, শীতের সময়, রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘন কুয়াশা নামবে নদীর বুকে।

ভাঁটার টানে ডিঙি চলেছে ভেসে। হাল ধরে বসে ধনপতি। এই গাঙে, এই গভীর জঙ্গলের রাজ্যে অনেক দিন পর সে আসছে। চেনা-জানা বলতে

কিছু নেই এ তল্লাটে। তারপর যত দক্ষিণে যাবে, এই নোনা গাঙ তত দুরন্ত হয়ে উঠবে। এপার থেকে ওপার স্পষ্ট দেখা যাবে না।

কিন্তু সে-সবের জন্যে ভাবে না ধনপতি। সে জানে, তার হাত দুটো যত সময় না পঙ্গু হয়ে যাবে, তত সময় এই নোনা গাঙের, এই বাদাবনের কোনো কিছুকে পরোয়া করে না সে।

মনের আনন্দে ডিঙি নিয়ে চলেছে ধনপতি। কী জানি কেন, আজ সন্ধ্যে থেকে তার মনের মধ্যে খুশীর ঝড় বইছে। নটবরের কথা শুধু নয়, তার গানের কলিগুলোও এলোপাথাড়ি মনে আসছে। মাঝে মাঝে সে-সব কলি গেয়ে উঠছে গলা ছেড়ে। কখনও হাল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখছে সামনের দিকে। কখনও দেখছে গাঙ-পারের ঘন জঙ্গলের দিকে। কখনও দেখছে, নোনা গাঙের ভাঙা ঢেউগুলো কেমন চিকচিক করে উঠছে।

হুঁশিয়ার মাঝি ধনপতি। সে জানে, এই সব গাঙে যত চোরা ঘোল, তা সবই পারের দিকে। তাছাড়া পারের দিকে ঢেউ-এর দাপটও বেশি। ভেবে চিন্তেই সে গাঙের মাঝ বরাবর ডিঙি নিয়ে চলেছে। মাঝ গাঙে তেমন ঢেউ না থাক, জলের নাচুনি আছে, ওঠা-নামা আছে। জলের ওঠা-নামার তালে তাল রেখে ডিঙি এগিয়ে নিয়ে চলেছে দক্ষিণে।

চলতি ডিঙির হাল ধরে বসে ধনপতি। কখন যেন আপনা থেকেই সে উন্মনা হয়ে পড়ে। পুরনো কথা, পুরনো ছবি এলোমেলো ভাবে ওর মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে।

'বিচিত্তির' এই মন। না পাওয়া যায় কূল-কিনারা, না পাওয়া যায় হিসেব-নিকেশ। মনটাকে নিজের কাছ থেকে আলাদা করে ফেলতে চায় ধনপতি। ভাবে, মন যা করে করুক, তাকে আমল না দিলেই হলো। মনের সঙ্গে তার এই মুহূর্তে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাক।

মনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি! কথাটার কোনো মানে হয় না। পাগলের মতো এ-সব কী ভাবছে সে।

হঠাৎ হো-হো করে আকাশ-ফাটা হাসি হেসে ওঠে ধনপতি। তার এই হঠাৎ-হাসিটা থেমে যায় আচমকা।

ডিঙির মাথাটা পারের কাদামাটিতে আটকে গেছে। রাতের কুয়াশায় দিক ভুল হয়েছে। তারপর অন্যমনস্ক হয়ে পড়ার দরুন, খেয়ালও ছিল না তার। নয়তো ঘন কুয়াশা হলেও পারের মাটি দেখা যায় না এমন নয়।

তাড়াতাড়ি ‘লগি’ তুলে নিলে ধনপতি। সজোরে ’লগি’ মারতে ডিঙিটা পারের দিক থেকে সরে এলো। লগি তুলে রেখে হাল ধরে ধনপতি আবার ডিঙি নিয়ে চললো মাঝদরিয়ায়।

পারে ঘন জঙ্গল। ওই জঙ্গলে ‘বে-টক্কর’ গিয়ে পড়লে বিপদ ঘটতে পারে যখন তখন। তারপর এ তল্লাটের জঙ্গলে রাজা বাঘের দাপটও খুব। মরতে ভয় পায় না ধনপতি, তাই বলে মরণটা অজান্তে আসবে তাও চায় না।

মাঝ গাঙে ডিঙি এনে পাঁচ ব্যাটারির টর্চটা বার করে এদিক-ওদিক আলো ফেললো ধনপতি। কিন্তু কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আলো বেশি দূর গেল না। আলো আর কুয়াশা মিশে এক হয়ে গেল।

এই কুয়াশা-জড়ানো রাতে আর ডিঙি বাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করলো না ধনপতি। মাঝদরিয়া থেকে পারের দিকে এগিয়ে গেরাবি ফেললো সে। রাতের মতো এখানেই অপেক্ষা করতে হবে।

শীতের কুয়াশা-জড়ানো রাতে গাঙের বুকে ডিঙি বেঁধে ছই-এর নিচে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো ধনপতি। গাঢ় ঘুমে চোখ বুজে এলেও, আচমকা সে ঘুম-ঘোর ভেঙে গেল।

জঙ্গলের পারেই ডাকছে রাজা বাঘ। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। পারের জঙ্গলে কিচির মিচির জুড়ে দিয়েছে বানরের পাল।

উঠে বসলো ধনপতি। ইচ্ছে হলো টর্চের আলো ফেলে জঙ্গলের পারে। না, থাক—টর্চটা বার করেও জ্বাললো না। অনেক সময় সাঁতরে এসে ডিঙির মানুষকেও ধরে নিয়ে যায় এই সুন্দরবনের রাজাবাঘেরা। এমন ঘটনা শুধু কানে শোনা নয়, চোখেও দেখেছে সে।

উঠে বসেছে ধনপতি। বসেছে ছই-এ ঠেস দিয়ে। ঢেউ ওঠা-পড়ার তালে তালে ডিঙিটা দুলছে। থেকে থেকে বাঘের গর্জন কানে আসছে। তন্দ্রা আসছে ডিঙির দুলুনিতে। বারবার আলগা তন্দ্রা টুটে যাচ্ছে। শীতের বাতাস’ ঢুকছে- ছই-এর মুখ দিয়ে। কাঁথাটা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে, তবু যেন শীত যায় না। এমনিতে শীত-কাতুরে নয় ধনপতি, পৌষের শীতেও কত সময় কোঁচার-মুড়ো গায়ে দিয়ে রাত কাটায়, আর আজ কাঁথা জড়িয়েও শীত ভাঙছে না।

বসে থাকতে থাকতে সেঁজুতির কথা মনে এলো ধনপতির। সেঁজুতির চিন্তা থেকে আরও কত চিন্তা। এই নানা চিন্তার মধ্যেই তো জড়িয়ে রয়েছে

ওর জীবন। কত না ঘটনা ওর জীবনে। কিন্তু কোনদিন আজকের মতো একসঙ্গে সব ঘটনাগুলো ওর মনের দরজায় 'কানাকানি' করেনি। জ্ঞান হবার পর থেকে আজকের ধনপতি—এর মধ্যে যে জীবন, সে যেন দুরন্ত গাঙের মতো। যে গাঙ কেবল দু-কূল প্লাবিত করেছে, পাড়ের মাটি ধ্বসিয়ে নিয়েছে। যে দুরন্ত গাঙের জল কোনদিন স্থির হলো না।

ভোর হয়ে এলো।

গাঙ-পারের জঙ্গলে পাখিরা কলরব শুরু করে দিয়েছে। কুয়াশা ঘন হলেও পূবের আকাশে দিনের আভাস ফুটে উঠেছে।

ধনপতি ছই-এর বাইরে এলো। জলের ঝাপটা দিলে চোখে মুখে। রাত জেগে চোখ জ্বালা করছে।

রাতশেষে ভাঁটা শুরু হয়েছে। দেরি না করে গেরাবি তুলে ডিঙি ভাসালো ধনপতি।

ঘন কুয়াশা গাঙের বুকে। দূরের কিছুই দেখা যায় না। পারের জঙ্গলও কুয়াশার আড়ালে অদৃশ্য। এরই মধ্যে পূবের আকাশ যেন কিছুটা পরিষ্কার।

ধনপতির কণ্ঠে গান আসে না। তবুও মাঝে মাঝে ও বেসুরো গলায় গায় নটবর ঘরামির বাঁধা গান। যে গানটি ধনপতির সাগরের যাবার ইচ্ছের কথা শুনে বেঁধে ছিল। গেয়ে শুনিয়েও ছিল একদিন—সেই গানটি ধরলো ধনপতি।

গুরুর নাম স্মরণ করে গাঙে দেলাম পাড়ি।
গাঙে আমি ভয় করি নে, সাগরে আমার বাড়ি।

ভাঁটার টানে দক্ষিণে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে ধনপতির ডিঙি।

॥ আঠারো ॥

আরও দু'দিন, দু'রাত।

শেষ রাতের ভাঁটায় সপ্তমুখীর গাঙ পার হয়ে সাগরের মুখে এসে পৌঁছেই একবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো সে। তারপর হঠাৎ চুপ করে গেল।

তখন সবে দিন শুরু হচ্ছে, সূর্য উঠছে সমুদ্রের পার থেকে। এ যেন এক নতুন সূর্য। যদিও কুয়াশার আড়ালে সূর্য কিছুটা ম্লান।

অবাক বিস্ময়ে ধনপতি দেখে সূর্যোদয়। তারপর ফিরে তাকায় সাগরের দিকে। শুধু জল আর জল।

যতদূর দৃষ্টি যায়—দেখতে পায় নীল জল হারিয়ে গেছে কোন সুদূরে। যেখানে আকাশ মিশেছে সাগরের জলে।

ধনপতির এ-বিস্ময় সহজে শেষ হবার নয়। এই সাগরের স্বপ্ন সে দেখে এসেছে কতদিন থেকে। তার দিন-রাতের স্বপ্ন, তার সারা জীবনের স্বপ্ন এই সাগর।

পিছন দিকে ফিরে চাইবার অবকাশ নেই, সামনে অথৈ জলের দিকে দৃষ্টি রেখে ঢেউ ভেঙে ভেঙে ডিঙি নিয়ে এগিয়ে চলে ধনপতি। শক্ত মুঠোয় হাল ধরেছে সে, সে জানে এখানে তার শেষ পরীক্ষা। জীবনে কখনও হার মানে নি। মানবে না। যত সময় সে আপন ইচ্ছেয় সাগর থেকে না ফিরবে, তত সময় কেউ তাকে ফেরাতে পারবে না।

পিছন ফিরে তাকালো ধনপতি। সপ্তমুখীর মোহনা আর চোখে পড়ে না। পারের সীমানা দেখা যায়, তাও অস্পষ্ট রেখার মতো।

সে অস্পষ্ট রেখাও এক সময় হারিয়ে গেল দৃষ্টি সীমানার বাইরে। 'নজর' করেও ধনপতি দেখতে পেল না কোথায় তীরভূমি। আর দেখার ইচ্ছেও নেই, একমাত্র ইচ্ছে ডিঙি নিয়ে এগিয়ে চলা।

এগিয়ে চলার নেশা ওকে পেয়ে বসেছে। সাগরের উথালিপাথালি ঢেউ ওর মনের মধ্যে। যেন ক্ষেপে গেছে ও। নোনাগাঙের দামাল মাঝি সাগরকেও জয় করতে চায়।

সূর্য উঠে এসেছে মাথার ওপরে। সমুদ্রের নীল জল চকচক করছে সূর্যের আলোয়।

ধনপতির মনের মধ্যে নানা জিজ্ঞাসা, সাগরের জল এত নীল হলো কেমন করে, এত জল কোথা থেকে এলো, সাগরের জল কত গভীর, কী আছে জলের গভীরে? আরও কত জিজ্ঞাসা।

জিজ্ঞাসার উত্তর নেই। ধনপতি তাই এক-একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয়। যে দিকে চায়, শুধু নীল জলের খেলা, আর কোথাও কিছু নেই।

সাগরে এসেছে বলে তো পোড়া পেট শুনবে না। ক্ষিধে-তেষ্টা সবই সঙ্গে এসেছে।

ডোরায় যাবে বলে হাল তুলে রাখতেই ডিঙি টাল-মাটাল করে ওঠে। হাল ছেড়ে ডিঙি রাখার উপায় নেই। গেরাবি করার চিন্তাও বৃথা।

একবার নয়, হাল তুলে ডোরায় যেতে বারবার চেষ্টা করে ধনপতি। কিন্তু পারে না। তবু এতটুকু বিচলিত হয় না সে। হাল ধরে বসে থেকে ভাবে, যা হয় হবে, তবু সে তার জীবন ভরিয়ে নেবে সাগরের কাছ থেকে। সেই জন্যেই তো সাগরে আসা।

এদিকে পেটের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। পিপাসায় বুক পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। হাত বাড়িয়ে 'কোশ' করে সাগরের জল মুখে দিতে গেছে কিন্তু সাগরের নোনা জল মুখে দেওয়া যায় না।

আরো কিছুদূর এগিয়ে এলো ধনপতির ডিঙি। সাগর যেন কিছুটা শান্ত এখানে। হাল ছেড়ে দিয়ে ধনপতি দেখলো ডিঙি স্থির থাকে কিনা। যদিও ডিঙি ঢেউ-এর দোলায় দুলছে তবু সন্তর্পণে ডোরায় গেল সে। প্রথমেই কোলা থেকে এক ঘটি জল তুলে পান করলে। তারপর হাঁড়িতে চাল ডাল চাপিয়ে উনুন জ্বালতে বসলো।

কোনমতে চাল ডাল একসঙ্গে ফুটিয়ে নিলে। তাও ঠিকমতো সিদ্ধ হলো না। যাই হোক—আধ-সিদ্ধ চালডাল এক থালা নিয়ে বসলো হালের মুখে। গোগ্রাসে গিললো খানিক, তারপর একঘটি জল পান করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো।

যাহোক এ বেলার মতো খিদে তেষ্টা তো মিটলো। যেটুকু খাবার আছে, তাতে রাতটা চলে যাবে। তারপর কাল যা হোক হবে।

কিন্তু সে যে কাল নয়, মহাকালের দরজায়—সে হুঁশ নেই তার।

সূর্য আছে বলেই সাগরের বুকে দিক ঠিক করা যায়। সূর্য পশ্চিমে চলেছে, দিক হিসেব করে দেখলো ধনপতি, দক্ষিণে চলেছে ডিঙি।

কিন্তু, সত্যিই কি ডিঙি চলেছে, না—এক জায়গায় স্থির রয়েছে। কিংবা সাগরের জলের সঙ্গে তারও গতি-পথ বাঁধা। সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধি দিয়ে কোন কিছুর হিসেব পাচ্ছে না ধনপতি। কোথায় যাচ্ছে, কোন্ দিকে, তার কিছুরই ঠিক-ঠিকানা নেই। ডিঙিটা ভাসছে, এইটাই যা সে বুঝতে

পারছে। আর দেখতে পাচ্ছে, তার চারদিকে দৃষ্টির সীমানা জুড়ে সাগরের নীল জল। আর রয়েছে নীল আকাশ।

দিন শেষ হয়ে আসছে। সূর্য ডুবছে পশ্চিম আকাশে। যেখানে সমুদ্র আর আকাশ একাকার হয়ে আছে।

এত আড়ম্বরপূর্ণ সূর্যাস্ত কখনও দেখেনি ধনপতি। কত রঙের খেলা শুরু হলো আকাশে, সমুদ্রে। এত রঙ কোথায় ছিল! তারপর ক্ষণে ক্ষণে চলছে রঙ-বদলের পালা।

নানা রঙের সাজে আকাশ আর সাগরকে সাজিয়ে, সূর্য ডুবে গেল আকাশ পেরিয়ে সাগরের জলে। দু'চোখে অফুরন্ত বিস্ময় নিয়ে ধনপতি তাকিয়ে রইলো পশ্চিম আকাশের দিকে।

যাদুকরের কাঠি যেমন চোখে ধাঁধা লাগায়, এ-ও যেন তেমনি। ধনপতির দু'চোখে নয়, তার মনেও লেগেছে যাদুর ধাঁধা।

আচমকা ডিঙি টাল খেয়ে যায়। চমক ভাঙে ধনপতির। শক্ত মুঠোয় হাল ধরে। শান্ত সমুদ্র হঠাৎ ঢেউ-এর দোলায় দুলে উঠেছে।

দেখতে দেখতে আকাশের পর্দা থেকে সূর্যাস্তের রঙ মুছে গেল। সন্ধ্যা নামলো আকাশ-সাগর জুড়ে। লক্ষ তারা ফুটলো আকাশে। সাগরের নীল জলে লক্ষ তারার অস্থির প্রতিবিম্ব।

সন্ধ্যা থেকেই কুয়াশা জমতে শুরু হয়েছিল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা আরও জমাট বাঁধলো। আকাশ হারিয়ে গেল কুয়াশার আড়ালে। সাগরকেও আড়াল করে দিল কুয়াশা। ডিঙির এ-মুখ থেকে ও-মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেল না ধনপতি।

কত রাত হয়েছে তা বোঝার উপায় নেই। এখানে কিছু অনুমান করা যায় না। কী দেখে অনুমান করবে। দেখার তো কিছুই নেই।

অনেক হিসেব করে রাতের খাবার বানিয়ে রেখেছিল ধনপতি। নয়তো আজ রাতে ওকে উপোস করেই কাটাতে হতো। খানিকটা ঠাণ্ডা আধ-সিদ্ধ চালডাল আর জল—কোনমতে ক্ষিধে তেষ্টা মিটিয়ে হালের মুঠি ধরে বসলো ধনপতি। কিন্তু মুশকিলে পড়লো, যখন ঘুম জড়িয়ে এলো ওর চোখে। ছই-এর নিচে নিশ্চিন্তে ঘুমোবার কোনো উপায় নেই। আবার সারারাত হাল ধরে বসে থাকাও সহজ কথা নয়। অথচ হাল ধরে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

দিনের চেয়ে রাতের সমুদ্রকে শান্ত মনে হয়। ধনপতি এক-একবার হাল তুলে দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে দেহকে একটু আরাম দিতে চেয়েছে, কিন্তু পরক্ষণে ডিঙি দুলে উঠতে, আবার শক্ত মুঠোয় হাল ধরে বসেছে।

সমুদ্রের বুকে এ-রাতের তুলনা নেই। যেমন ভয়ংকর তেমন সুন্দর। কিন্তু ধনপতির কাছে আজ আর ভয়ংকর বলে কিছু নেই। সবই সুন্দর।

শীতের মধ্যে একা ধনপতি ডিঙির হাল ধরে বসে রইলো সারারাত। সারারাত বসে থেকে কি দেখেছে, তার কিছুই ঠিক করতে পারলো না। সব কিছু ভুলে গেছে, সব কিছুরই খেই হারিয়ে ফেলেছে। সাগরের বুকে ডিঙি ভাসিয়ে সে আজ একটা কথাই ভাবতে চাইছে, সাগরের চেয়ে বড় আর কিছু নেই।

তবুও সারারাত ধনপতি মনের মধ্যে এক অদ্ভুত যন্ত্রণা অনুভব করেছে। সাগরে আসার আনন্দের চেয়ে সে-যন্ত্রণার স্বাদ আরও তীব্র। কিন্তু কী সে যন্ত্রণা তা ও বুঝতে পারে না। ওর সমস্ত অনুভূতি যেন ভোঁতা হয়ে গেছে।

রাত শেষ হয়ে আসছে জেনেও বিন্দুমাত্র চঞ্চল হলো না সে। সূর্যোদয় দেখা যার আজীবনের নেশা, কিন্তু আজ আর সাগরে সূর্যোদয় দেখার আগ্রহও তার নেই। যা কিছু চিন্তা ভাবনা—সাগরের বুকে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে তা শেষ হয়ে গেছে। যেটুকু আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাও ফুরিয়ে গেছে।

সূর্য উঠলো। কুয়াশা সরে গেল। এখন রইলো কেবল নীল আকাশ, নীল সাগর আর এক সূর্য।

অকস্মাৎ ধনপতি হাল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। দু'হাত আকাশের দিকে তুলে হো-হো করে হেসে ওঠে। হাসি যেন আর থামে না। সমুদ্রের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে মিশে যায় তার হাসির তরঙ্গ।

ডিঙিটা টাল খেয়ে দুলে ওঠে। একদিকে কাত হয়ে যায়। ছই-এর ভিতর জলের কোলা ছিল, উলটে যায় সেটা। কোনো মতে ডিঙি সামলে নিলেও কোলা সামলাতে পারে না ধনপতি।

জলের কোলা ভেঙে যেতে ধনপতি আরও একবার হাসলো। তারপর সাগরের নীল জলের দিকে তাকালো। এত জল—তবু এ-জল একজন মানুষেরও পিপাসা মেটাতে পারে না। পিপাসায় বুক শুকিয়ে গেলেও, এই অথৈ জলের সাগর এক ফোঁটা জল দিতে পারবে না পিপাসা মেটাতে। আবার জলের ভাঙা কোলাটার দিকে দেখলো সে। কোলার ভাঙা টুকরোয় এখনও

সামান্য জল রয়েছে। সে জলটুকুর জন্যে হাল ছেড়ে ছই-এর ভিতরে ঢুকলো। কোলার টুকরোয় হাত দেবার মুখেই ডিঙিটা কাত হয়ে গেল। যেটুকু জল ছিল, তাও গড়িয়ে পড়ে গেল।

বেলা বাড়ছে।

সূর্য ধীরে ধীরে অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। চড়চড়ে রোদ এসে বিঁধছে ধনপতির সর্বাঙ্গে।

এতদিন নোনা গাঙে ঘুরে যা হয়নি, একদিন সাগরে বেড়িয়ে তা হয়েছে। ঝলসে গেছে গায়ের চামড়া। সামান্য নখের আঁচড় কাটলে খড়ি-খড়ি দাগ উঠছে হাতে পায়ে। তারপর মাথার চুল কেমন যেন খাড়া হয়ে গেছে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনপতির দেহের মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব জাগলো। পিপাসায় বুক পর্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে, অথচ ঠোঁট ভেজাবার মতো মিঠে জলও ডিঙিতে নেই। বারকয়েক আঁজলা ভরে সাগরের জল মুখে দিয়েছে, কিন্তু সে জল পেটে যেতেই গা-গুলিয়ে উঠেছে। রোদে পুড়ে সারা দেহ জ্বালা করছে। একবার গামছা ভিজিয়ে গায়ে-মাথায় জল দিয়েছে, তাতেও জলুনি কমেনি, বরং বেড়েছে।

ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে। অথচ শুকনো চাল-ডাল আর আখের গুড় ছাড়া আর কিছু নেই। ক্ষিধের জ্বালায় শেষটা ডোরায় এলো ধনপতি। খানিকটা শুকনো চাল আর এক খামচা গুড়, একসঙ্গে মাখলো। তারপর দেখতে পেল ডিঙির 'খোলে' ভাঙা কোলার জল জমে রয়েছে। হোক ময়লা, তবু তো ও-জলে তেষ্টা মিটবে। পাটাতনের শলা ফাঁক করে সানকি ভরে খানিকটা ময়লা কাদা-গোলা জল তুলে চুমুক দিলে। প্রাণটা যেন ঠাণ্ডা হলো।

একবার মনে হলো ধনপতির, সাগর থেকে ফেরার কথা। এই চিন্তার মধ্যে পরাজয়ের ভাব লুকিয়েছিল, যখন সে-কথাটা মনে হলো, তখনই আবার সে চিন্তাটাকে মন থেকে মুছে ফেললো।

ওর মনের মধ্যেকার সেই কালাপাহাড়ী মানুষটা জেগে উঠলো। সে মানুষ স্থির করলো, নোনাগাঙের ডাকসাইটে মাঝি, মালকাঠ-ঝাঁকা ধনপতি এবার ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করবে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

এই মুহূর্তে নিজের জীবনকে ভালো লাগছে ধনপতির। ভাবছে, জীবনের চেয়ে বড় কিছু নেই।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল এলো। দুপুরের সমুদ্র আর বিকেলের সমুদ্রের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। দুপুরে শান্ত ছিল সমুদ্র, বিকেল হতেই অশান্ত হয়ে উঠলো। শক্ত হাতে হাল ধরেও ডিঙি সামলে রাখা দায়। ডিঙি সামলাতে ধনপতি বেসামাল হয়ে পড়ে, তবু সে হাল ছাড়ে না। তবু সে এই মুহূর্তে সাগর থেকে ফেরার চিন্তা মনের মধ্যে স্থান দেয় না।

বিকেল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত অশান্ত সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ধনপতি। তবু ওর কালাপাহাড়ী মন ওকে কিছুতেই ভেঙে পড়তে দেবে না।

সন্ধ্যের পর সমুদ্র যেন অনেকটা শান্ত হলো। হাল তুলে রেখে ডিঙির খোলের মধ্যে থেকে আরও খানিকটা নোংরা ঘোলা জল তুলে নিলে। তারপর শুকনো চাল আর গুড় একসঙ্গে চিবোতে লাগলো। শুকনো চাল চিবোনোর শক্তিও চোয়ালে নেই। চোয়ালে খিল ধরে যায়। তবু চাল গুড় খানিকটা খেয়ে সেই ময়লা জল পান করলো ধনপতি। একটু স্বস্তি পেল। সারাদিনের পর আবার চারদিকে ফিরে তাকালো।

সন্ধ্যের পর থেকে কুয়াশা জমতে শুরু হয়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা আরও ঘন হয়ে ওঠে। সাগর, আকাশ হারিয়ে যায় কুয়াশার আড়ালে। রাতটা যত দুঃসহ হোক, তবু সে হাল ছাড়ে না। ধনপতির কাছে দুঃসহ বলে কিছুই নেই।

গত রাতে ঘুমোতে পারেনি। সারাদিনেও চোখের পাতা বন্ধ হয়নি। সারাদেহ দারুণ অবসাদে, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লেও দু' চোখ খোলা রেখে হাল ধরে বসে রইলো ধনপতি। গায়ে জড়ানো ছিল কাঁথা, সেটাও কখন খুলে গেছে, সেদিকে হুঁশ নেই তার।

সারা রাত জড় অনুভূতি নিয়ে ডিঙির হাল ধরে বসে রইলো ধনপতি। শেষ রাতে পূব-আকাশে আলোর আভাস ফুটে উঠতে, জড় মনটাকে একটু নাড়াচাড়া দিতে চাইলো। কিন্তু নিজের কাছ থেকে কোনো সাড়া পেল না।

কিন্তু কেন এমন হলো! সূর্যোদয়ের মুহূর্তে উঠে দাঁড়ালো ধনপতি। একবার উচ্চকণ্ঠে আকাশ-ফাটা হাসি হেসে ঘোষণা করতে চাইলো, সে আছে।

আবার দিন আরম্ভ হলো। কুয়াশা মুছে গেল আকাশ থেকে। চোখের সামনে নীল আকাশ, নীল সাগর স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

ধনপতির ডিঙি সাগরের জলের টানে ঢেউ-এর সঙ্গে ওঠা-নামা করতে

করতে আপনি ভেসে চলেছে। ধনপতি শুধু শিথিল হাতে হাল ধরে আছে মাত্র।

ডিঙির দুলুনিতে হোক, আর যে কারণে হোক, বমির বেগে উদ্বেল হয়ে উঠছে ধনপতি। একবার বমি করলোও। বমি করার পর কষ্ট যদিও কমলো, কিন্তু দারুণ পিপাসা জাগলো। সেই দারুণ পিপাসা নিয়ে একবার অথৈ জলের সাগরের দিকে তাকালো।

বেলা যত বাড়ছে, রোদের তেজও তত বাড়ছে। স্ুঁচের মতো বিঁধছে গায়ে। এদিকে আরও নতুন উপসর্গ দেখা দিল। মাথায় আর তলপেটে অসহ্য যন্ত্রণা। গামছা ভিজিয়ে সাগরের জল মাথায় দিলে ধনপতি, কিন্তু যন্ত্রণা কমলো না। পিপাসা মেটাতে গামছা নিঙড়ে খানিকটা জল মুখে দিলে। সে জল পেটে যেতেই, পেট মোচড় দিয়ে উঠলো। তীব্র হলো তলপেটের যন্ত্রণা। বমির বেগ এলেও, বমি হলো না। শুধু 'ওয়াক, ওয়াক' করে গলা টানতে লাগলো।

দুপুর কাটলো। বিকেলের দিকে আরও অবসন্ন হয়ে পড়ে ধনপতি। এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা সর্বশরীরে তবু ওর মন থেকে সাগরের নেশা কাটেনি। এখনও থেকে থেকে সে দেখছে দূর আকাশ-সীমার দিকে—আকাশ যেখানে সাগর স্পর্শ করেছে। কিন্তু বেশি সময় দূরে নজর রাখতে পারে না। ঝাপসা হয়ে আসে সব।

ডিঙি কোথায় যাচ্ছে, কোন্ দিকে যাচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না ধনপতি। তারপর দেহ-মন কেমন যেন জড় হয়ে গেছে। এখন কোনো কিছু চিন্তাও করতে পারছে না। যদিও থেকে থেকে মনের মধ্যে চিন্তা আসছে, কিন্তু সে চিন্তা ধরে রাখতে পারছে না।

হঠাৎ এক সময় দূরের দিকে ফিরে চাইতে ধনপতির মাথাটা যেন ঘুরে যায়। কী দেখলো সে! একবার নয়, বারবার ফিরে চায়—স্পষ্ট দেখতে পায় তীরভূমি। যেখানে সাগর শেষ হয়েছে, যেখানে রয়েছে পুরনো মাটির জগৎ।

ধনপতির মনের মধ্যে বিস্ময়—কে তাকে সাগর থেকে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছে! ধনপতির দু'চোখ আপনা থেকেই জলে ভরে যায়। তার সমস্ত যন্ত্রণা, সমস্ত অবসাদ দূরে সরে যায়। চোখের জল মুছে আবার ফিরে তাকায় দূরে—তীরভূমির দিকে। একই সময়ে তার মনের মধ্যে অনেক ছবি জেগে ওঠে। কত দূরের সে-সব ছবি, অথচ কত স্পষ্ট। সে ছবির মধ্যে ধনপতির জীবনের প্রতিচ্ছবি।

সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। কিছুক্ষণের মধ্যে ডুবে যাবে ওই সূর্য।

ধনপতির চোখের সামনে তীরভূমির ছবিটা আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে।

স্পষ্ট দেখতে পায় সাগরপারের মাটি—বালিয়াড়ি।

কিন্তু যত তীরের দিকে চলেছে, সাগরের ঢেউ তত যেন ক্ষ্যাপাটে হয়ে উঠছে। এমন দামাল ঢেউ-এর মুখোমুখি ধনপতি আর কখনও পড়েনি। দামাল ঢেউ-এর কী প্রচণ্ড আস্ফালন—গর্জন!

দূরে তীরভূমির বালিয়াড়ির ওপর প্রচণ্ড শব্দ করে ফেটে পড়ছে ঢেউ। ধনপতি দেখতে পায় অজস্র ঢেউ-এর মাতামাতি, শুনতে পায় ঢেউ-ভাঙার শব্দ।

কিন্তু একি হলো! ধনপতির ডিঙি এসে পড়েছে সেই দুরন্ত দামাল ঢেউ-এর মধ্যে। শক্ত মুঠোয় হাল ধরেও রুখতে পারছে না ডিঙি। টাল-মাটাল করছে কাগজের নৌকোর মতো। হালের মুঠি আরও শক্ত করে ধরে ধনপতি উঠে দাঁড়ায়। নোনা গাঙের দুঃসাহসী মাঝি মালকাঠ-ঝাঁকা ধনপতির মধ্যে সেই কালাপাহাড়ী মানুষটা এখনো জেগে আছে। যে ইচ্ছে-শক্তির জোরে সে দুরন্ত নোনা গাঙ পাড়ি দিয়েছে, বাদায় রাজাবাঘের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, সেই ইচ্ছে-শক্তি থাকতে কখনও সে হার মানবে না।

এই মুহূর্তে শরীরে যেন অসুরের বল পেয়েছে ধনপতি। শক্ত মুঠোয় হাল ধরে বড় বড় ঢেউ কাটিয়ে উঠছে।

এক একটা ঢেউ কাটিয়ে সে হেসে উঠছে আকাশফাটা হাসি। তারপর চিৎকার করছে উন্মাদের মতো—'সাবাস—সাবাস'!

দারুণ উত্তেজনার মুহূর্তে একবার তীরভূমির দিকে তাকায় সে। আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে তীরভূমি।

এদিকে সূর্য ডুবতে বসেছে। রঙের বন্যায় ভরে গেছে তীরের মাটি, আকাশ, সাগর।

একবার অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে পারের মাটির দিকে তাকায় ধনপতি। কিন্তু লক্ষ্য করেনি দুদিক থেকে দুটি সর্বনাশা ঢেউ ছুটে আসছে। যখন দেখলো, তখন আর সতর্ক হবার সময় নেই। তবু নিমেষের মধ্যে ধনপতি তার সমস্ত শক্তির সঙ্গে ইচ্ছে-শক্তি যোগ করে শক্ত মুঠোয় হাল ধরে, ছুটে-আসা দুরন্ত ঢেউ-এর মুখোমুখি দাঁড়ায়।

বেগে ছুটে-আসা দুটি দুরন্ত ঢেউ মুখোমুখি হয়ে ফেটে পড়লো দারুণ গর্জনে। সেই গর্জনের সঙ্গে মিশে গেল ধনপতির উচ্চকণ্ঠের হাসি।

খড়কুটোর মতো ভেসে গেল ডিঙি। সাগরের জলে ছিটকে পড়লো ধনপতি। দু'চোখে তার কালো অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।

ধনপতি জলে ডুবেও মনে করে, না—এখনি সে মরবে না। এখনও তার জন্যে অপেক্ষা করছে সূর্য।

জলের ওপর ভাসলো ধনপতি। অশক্ত দুটি হাতে জল কেটে কেটে সাঁতরে ঢেউ-এর মাথায় উঠে পশ্চিম দিকে মুখ ফেরালো সে। দেখলো, অস্তগামী সূর্যের অপরূপ রূপ। প্রণাম জানাতে সে দুটি হাত একসঙ্গে করতে চাইলো। কিন্তু পারলো না। শুধু সূর্যের শেষ দৃষ্টির সঙ্গে ধনপতির অন্তিম-দৃষ্টি মিলিত হলো।

সূর্য অস্ত গেল।

———